প্রচলিত রাজনীতি বনাম
ইসলামী আন্দোলন
প্রেক্ষিত: বাংলাদেশ

কাজী ওমর ফারুক এফসিএ

প্রচলিত রাজনীতি বনাম ইসলামী আন্দোলন প্রেক্ষিত: বাংলাদেশ

কাজী ওমর ফারুক এফসিএ

এমটিআইএস (দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক ষ্টাডিজ)

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

সম্পাদনা

অধ্যাপক মো. নজরুল ইসলাম

প্রেসিডেন্ট, মুসলিম উম্মাহ্ অফ নর্থ আমেরিকা

সাউথ জোন

রিসালাহ পাবলিকেশন্স

প্রচলিত রাজনীতি বনাম ইসলামী আন্দোলন প্রেক্ষিত: বাংলাদেশ

কাজী ওমর ফারুক এফসিএ
(ধর্মীয়)
ksofaruk@yahoo.com

প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে বইমেলা ২০২৫

স্বত্ব
লেখক কর্তৃক উন্মুক্ত

প্রচ্ছদ : রবিউল ইসলাম

প্রকাশক
রিসালাহ পাবলিকেশন্স
৭৪, ভূইয়া ম্যানশন (তৃতীয় তলা), কাকরাইল, রমনা, ঢাকা-১০০০
শো-রুম : ইসলামী টাওয়ার (২য় তলা), ১১/১, বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
মোবাইল : ০১৭১২-৬৭১৩৪৬/০১৬৭৫-৪১৭৫৬৪
ই-মেইল : muktodesh71@gmail.com

পরিবেশক :
মুক্তদেশ প্রকাশন, ইসলামী টাওয়ার, ১১/১, বাংলাবাজার ঢাকা।
প্রফেসর'স বুক কর্ণার : ১৯১, ওয়ারলেছ রেলগেট, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

অক্ষরবিন্যাস : মুক্তদেশ প্রকাশন কম্পিইটার, কাকরাইল, রমনা, ঢাকা।
মুদ্রণ : মৌমতা প্রিন্টার্স, প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা।

মূল্য : ৪০০ (চারশত টাকা মাত্র)

ঘরে বসে রিসালাহ পাবলিকেশন্সের সকল বই কিনতে ভিজিট করুন–
www.rokomari.com

ISBN: 998-984-9449-87-5

Procholito Rajniti bonam Islami Andolon by Kazi Omar Faruk FCA, Edited by Prof. Md. Nazrul Islam. Published by Jabed Imon, Risalah Publication, Islami Tower (1st floor), 11/1, Banglabazar Dhaka 1100, Bangladesh. 1st publication: February 2025, Price: Tk. 400.00, USA $ 15.00.

সম্পাদকের কথা

ইন্নাল হামদা লিল্লাহ্, ওয়াস-সালাতু ওয়াস-সালামু আলা রাসূলিল্লাহ। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা মানুষ সৃষ্টি করেছেন, জান্নাতে থাকতে দিয়েছেন, সেখান থেকে দুনিয়াতে নামিয়ে দিয়েছেন এবং সে সময়ে একটি হেদায়াত দেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহ্ আরো জানিয়েছেন, যারা তাঁর হিদায়াতের অনুসরণ করবে, তার উপর না কোন ভয় আসবে, না (কোনো কারণে) তাঁরা চিন্তাগ্রস্ত ও সন্তপ্ত হবে। মানবজাতির জন্য সেই হেদায়াত হলো কুরআন, আর কুরআনের বাস্তব ইন্টারপ্রিটেশন হলো রাসূল সা. এর জীবনাদর্শ। মানুষের পুঁজি হলো তার সময়, আর মুক্তির পথ হলো তার উক্ত সময়ের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে সেই হেদায়াতের অনুসরণ, তথা জীবনের সমগ্র সময়ব্যাপি কুরআন প্রদর্শিত পথে চলা।

কুরআনের তথা হিদায়াতের পরিবর্তে, মানুষ তার পছন্দমতো অনেক মত ও পথ (গোমরাহী) তৈরি করে নিয়েছে এবং সে পথ নিজে অনুসরণ করে এবং অন্যদেরকেও সে সকল পথের অনুসারী হতে আহবান জানায়। এ সকল পথের মধ্যে রয়েছে, বিভিন্ন ধর্মাদর্শ এবং মতবাদ, যেমন–সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, সাম্যবাদ, রাজতন্ত্র ইত্যাদি।

একই ব্যক্তির পক্ষে একসাথে দুটি পথে চলা যেমন সম্ভব নয়, ঠিক তেমনি দুটি জীবনাদর্শ একসাথে অনুসরণ সম্ভব নয়। স্পষ্টত যারা অন্য কোনো মতাদর্শের অনুসারী তারা আল্লাহ্র হিদায়াতের অনুসারী নয়, আর যারা আল্লাহ্র হিদায়াতের অনুসারী তারাও অন্য কোনো জীবনাদর্শের অনুসারী নয়।

ইসলামী আন্দোলন হলো: ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রকে এক আল্লাহ্র হিদায়াতের উপর অবিচল রাখার আন্দোলন বা তীব্র সংগ্রাম। প্রচলিত রাজনীতিতে যে আদর্শের অনুসরণ করা হয়, সেই আদর্শের জায়গাতেই আল্লাহ্র হিদায়াতের প্রতিষ্ঠা করা ইসলামী আন্দোলনের মূল কাজ। অতএব, প্রচলিত রাজনীতির ধারক বাহকগণ আল্লাহ্র হিদায়াতের অনুসারী নয়। এটা স্পষ্ট, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র হিদায়াতের অনুসারী নয়, সে নিজেকে মুসলিম দাবী করার কোনো সুযোগ নেই।

'প্রচলিত রাজনীতি বনাম ইসলামী আন্দোলন' বইটিতে লেখক প্রচলিত রাজনীতিতে অংশগ্রহণকারীদের দ্বীনি অবস্থান ব্যাখ্যা করেছেন। বিশেষ করে সলাত, সিয়াম, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ইবাদতগুলোর অনুশীলনের কারণে তাঁরা দ্বীনদার হওয়ার যে আত্মতৃপ্তি অনুভব করেন, সেই ইবাদত গুলোতেই যে তাঁদের হিদায়াতের বিপরীত অবস্থানের প্রমাণ রয়েছে, তা ইবাদতগুলোর প্রক্রিয়া বিশ্লেষণের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। যারা প্রচলিত রাজীতিতে জড়িত আছেন, এ

বইটি অধ্যয়নে নিজেদের ধর্মীয় অবস্থান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারাণা লাভ করতে পারবেন। অধিকন্তু ইসলামী আন্দোলনের বিভিন্ন দিক নিয়েও এ বইটিতে আলোচনা করা হয়েছে, যা ইসলামী আন্দোলনের প্রয়োজন পূরণ করবে বলেও মনে করি।

২০০৩-২০০৪ সালের দিকে যখন বইটি লিখা হয়, আমি তখন বাংলাদেশে ছিলাম এবং পাণ্ডুলিপিটি নিবিড়ভাবে দেখার সুযোগ হয়েছিল। বিভিন্ন বিষয়ে লেখককে পরামর্শ দিয়েছি এবং লেখক সেভাবে সংশোধন করেছেন। আমার বর্তমান দায়িত্বের কর্মব্যস্ততার কারণে সম্প্রতি বইটি পুনরায় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখার সুযোগ না হলেও গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো দেখেছি এবং প্রয়োজনীয় পরিমার্জন করা হয়েছে। প্রথম প্রকাশে ধারণাগত কোনো ত্রুটি থেকে গেলে, পরবর্তী সংস্করণে পরিমার্জিত হবে বলে প্রত্যাশা করি।

আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের সকলকে তার হিদায়াত এবং গোমরাহির মধ্যে পার্থক্য করতে পারার মতো জ্ঞান দান করুন এবং তাঁর হিদায়াতের উপর অবিচল রেখে সফল করুন।
আমীন।

-মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম
ইউএসএ।

প্রসঙ্গ কথা

বাংলাদেশের প্রায় ৯০ ভাগ মানুষ মুসলমান। তাঁদের অল্পসংখ্যক কনভার্টেড মুসলমান আর প্রায় সকলে জন্মগতভাবে মুসলমান। এ সকল মুসলমানদেরকে বিশ্বাস ও আচরণগত দিক থেকে মোটামুটি তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। একটি শ্রেণি রয়েছে, যারা জন্মগতভাবে মুসলমান হলেও ভ্রান্ত মতবাদ ও সেক্যুলার চিন্তা-চেতনার অনুশীলনের কারণে কট্টর ইসলাম বিদ্বেষী। তারা একটি নির্দিষ্ট বলয়ে কথিত 'বুদ্ধিজীবী' তালিকায় নিজের নাম অবলোকন করে তৈরি হওয়া অহংবোধের কারণে নিজের জ্ঞানের বিষয়ে মাত্রাতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী, যার ফলে ইসলামের বিষয়ে অধ্যয়নের দরকার মনে করেন না। প্রকৃতপক্ষে তাদের অহংবোধ এবং ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে ইসলামের আলোয় জীবনকে আলোকিত করার সম্ভাবনা ক্ষীণ, তবে অসম্ভব নয়। অপরদিকে, ঠিক তার বিপরীত প্রান্তে রয়েছে মুসলমানদের আরেকটি অংশ, যারা ইসলামী জ্ঞান সাধনায় বিশেষ বুৎপত্তি অর্জন করেছেন এবং ইসলামী জীবন বিধান অনুসরণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। অবশ্য এ ধরনের মুসলমানদের ক্ষুদ্র একটি অংশ রয়েছে, যারা ইসলামী জ্ঞান সাধনায় বিশেষ বুৎপত্তি অর্জন করা সত্ত্বেও পার্থিব স্বার্থের মোহে অথবা দুনিয়ার তাগুত শক্তির নির্যাতনের ভয়ে ভীত হয়ে মানুষের সামনে আল্লাহ্‌র দ্বীনের প্রকৃত স্বরূপ প্রচার ও তার বাস্তবায়নের কাজ হতে নিজেকে বিমুখ রেখেছেন। এমনকি কেউ কেউ স্বয়ং তাগুতি শক্তির সাথে প্রত্যক্ষভাবে নিজেকে একাকার করে দিয়েছেন। ফলে মুসলমানদের যে অংশটি নিজেদেরকে ইসলামী জ্ঞান সাধনায় নিয়োজিত রেখে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন, তাঁদের কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

উপরোক্ত দুটি শ্রেণির মুসলমানের সংখ্যা দেশের সর্বমোট জনসংখ্যার তুলনায় খুব একটা বেশি নয়। মুসলমানদের বৃহৎ অংশের অবস্থা হলো, তাঁরা মনে করেন আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের উপর সাধারণ অর্থে বিশ্বাস এবং রাসূল সা. কে রাসূল হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া এবং পাশাপাশি কিছু কিছু সালাত,সিয়াম, তাসবিহ-তাহলীল ও আনুষ্ঠানিকতা পালন করা মুসলমান হওয়ার জন্য যথেষ্ট। এ সকল মুসলমান ইসলাম সম্পর্কে ব্যাপক অধ্যয়ন এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তার বাস্তবায়নের প্রয়োজন মনে করেন না। তাদের বিশ্বাস অনুসারে ইসলামী রাজনীতি ব্যতীত অন্য কোনো রাজনীতিতে নিজেকে নিয়োজিত রাখা বড় ধরনের কোনো ব্যত্যয় নয়।

এ সকল মুসলমানের প্রায় সকলে আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস রাখেন এবং রাসূল সা. কে নবী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে থাকেন এবং অংশবিশেষ সালাত, সিয়ামসহ ইসলামের সাধারণ আনুষ্ঠানিকতা পরিপালন করে থাকেন। আবার কেউ কেউ আছেন, যারা দু'একটি আনুষ্ঠানিকতা পরিপালন ব্যতীত ব্যক্তিগত জীবনে সালাত, সিয়াম ও ইসলামী নিয়মনীতির ব্যাপারে উদাসীন। তাঁরা ইসলামকে ভালোবাসলেও ব্যক্তিগত জীবনে তার বাস্তবায়নের বিষয়ে খুব একটা মনোযোগী নন।

যারা নিয়মিত সালাত, সিয়াম, হজ্জ পালন ও যাকাত প্রদান করে থাকেন এবং ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনীতিসহ বহু ক্ষেত্রে মানব রচিত মতবাদের বা নিজের নাফসের অনুসারী, তাদেরকে যদি বলা হয় 'আপনারা মুসলিম নন', তাঁরা এ কথায় বিচলিত হবেন এবং বক্তার প্রতি মারমুখী হয়ে উঠাও অস্বাভাবিক কিছু নয়। অথচ ইসলাম অনুসারে তাঁরা এ সকল ইবাদত ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পরিপালন করা সত্ত্বেও রাজনীতির ক্ষেত্রে তাগুতের পথ অনুসরণ করার কারণে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত রয়েছেন।

এ সকল মুসলমানের সামনে যদি এ সত্যটি উপস্থাপন করা যায় যে, সেক্যুলার রাজনীতিতে নিজেকে জড়িত রাখা মূলত: প্রত্যক্ষ খোদাদ্রোহিতা, যার অনিবার্য পরিণতি হলো মুসলমানিত্ব না থাকা এবং সুনিশ্চিত পরকালীন ধ্বংস; তবে আশা করা যায় এ সকল মুসলমানের অনেকে সেক্যুলার রাজনীতি পরিত্যাগ করে আল্লাহ্‌র মনোনীত পথে চলে আসবেন (তাঁদের ঈমানের দাবি সত্য হলে)।

আজকে যারা সেক্যুলার রাজনীতিতে জড়িত,তাঁদের অনেকেএর পরিণতি সম্পর্কে অজ্ঞ। তাঁদের অনেকে আল্লাহ্‌কে ভয় করেন এবং রাসূল সা. কে বিশ্বাস করেন। যথার্থ প্রচারণার অভাব এবং পার্থিব স্বার্থে কতিপয় ধর্মীয় আলেমদেরকে সেক্যুলার রাজনীতিতে জড়িত দেখে ধারণা পোষণ করছেন যে, ভিন্ন ধারার রাজনীতিতে জড়িত থেকে এম. পি./মন্ত্রী ও নেতা হওয়া নিছক একটি জীবন ধারনের ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির উপায়। আর সালাত, সিয়াম ও হজ্জ পালন এবং যাকাত দানের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন সম্ভব। সুতরাং, এ সকল ইসলামী নিয়মাচার পরিপালন করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে জান্নাত লাভের প্রস্তুতি গ্রহণ এবং প্রচলিত রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সামাজিক প্রতিপত্তি লাভ করতে পারাটা বুদ্ধিমত্তা। সুতরাং, তাঁরা দু'দিকে লাভবান হওয়ার জন্যএ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। এ সত্যটি যদি তুলে ধরা হয় যে, সেক্যুলার রাজনীতিতে জড়িত থেকে সালাত, সিয়াম, হজ্জ এর বাহ্যিক পরিপালন

এবং যাকাত প্রদানের মাধ্যমে পরকালীন মুক্তি সম্ভব নয়, তবে একজন মানুষ প্রকৃতপক্ষে ঈমানদার হলে ধর্মহীন রাজনীতিতে অংশ নিতে পারেন না।

উপরোক্ত কারণে মুসলমানদের সামনে মুসলমান বলতে কী বুঝায় বা ইসলাম কী এবং ইসলামী দৃষ্টিকোণ হতে বাংলাদেশে প্রচলিত রাজনীতির বিষয়ে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা অত্যাবশ্যক। এ বিষয়টি বুঝে আসার জন্য কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে ইসলামেরসংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং ইসলামের দাবিসমূহ তুলে ধরতে হবে এবং পাশাপাশি বাংলাদেশের রাজনীতির স্বরূপ, তথা বাংলাদেশের রাজনীতিতে নেতৃত্বদানকারী প্রধান দলসমূহের আদর্শ, নীতি এবং লক্ষ্য ও কার্যক্রম সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা অর্জন করতে হবে। অতঃপর ইসলামের আলোকে তার অবস্থান কি, তার দিকে আলোকপাত করা হলে মানুষ এ সকল রাজনীতিতে জড়িত থাকার ভয়াবহতা আঁচ করতে সক্ষম হবেন এবং পরকালীন মুক্তি আশা করলে সেক্যুলার রাজনীতির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখবেন।

এটা অনস্বীকার্য যে, ইসলামী বিধান অনুসারে সেক্যুলার বা ধর্মহীন রাজনৈতিক দলসমূহের অবস্থান প্রত্যক্ষভাবে ব্যাখ্যা করা হলে এ সকল দলের নের্তৃবৃন্দের পক্ষ হতে প্রতিবন্ধকতা আসতে পারে, এমনকি জীবনের ঝুঁকিও তৈরি হতে পারে। এতদসত্ত্বেও, ভয়াবহ গহীন খাদের কিনারায় দাঁড়ানো আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে কঠিন বিপদ হতে রক্ষা করার অভিপ্রায়ে তাদের কাছে সেক্যুলার রাজনীতি বা ধর্মহীন রাজনীতির বিষয়ে ইসলামী অবস্থান তুলে ধরতে হবে। কেননা, আমাদের একমাত্র আদর্শ রাসূল সা. ছিলেন জগতের সকল মানুষের কল্যানকামী। আর এ কারণে ইসলামের চরম শত্রু ব্যক্তিটিরও তিনি কল্যান চেয়েছেন বলে তাদেরকে ইসলামে প্রবেশ করিয়ে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করতেচেয়েছেন। যার কারণে ইসলামের ভয়ংকর শত্রু খালিদ বিন ওয়ালিদ শেষ পর্যন্ত ইসলামের ছায়াতলে স্থান পেয়ে সাইফুল্লাহ্ উপাদি পেয়েছিলেন; রাসূল সা. এর প্রিয় চাচা ইসলামের শ্রেষ্ঠ বীর হামজা রা. এর হত্যার নির্দেশ দাতা ও হত্যাকারী হিন্দা এবং ওয়াহশী ইবনে হারব উভয়েইসলামের সুশীতল ছায়া তলে আসতে পেরেছিলেন; ইসলামের বিভৎস শত্রু আবু জাহেল পুত্র ইকরামা, যে মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত ইসলামের তীব্র শত্রুতা করেছিল রাসূল সা. এর ক্ষমা লাভ করে সাহাবার মর্যদা লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ বিষয়টা সামনে রাখলে রাসূল সা. এর অনুসারী হিসেবে আমাদেরকেও জগতের সকল মত ও আদর্শেরপ্রত্যেকের কল্যাণকামী হতে হবে। আর এ যুগে যারা ধর্মহীন বা

সেক্যুলার রাজনীতির সাথে নেতা বা কর্মী হিসেবে যুক্ত তাঁরা ঐ মাত্রায় ইসলামের শত্রু নয়। অনেক ক্ষেত্রে অজ্ঞতা বা বৈষয়িক বিত্ত বৈভব, সম্মান প্রতিপত্তির আকর্ষনে সেক্যুলার রাজনীতি করছে। তাদের কাছে বিষয়টি স্পষ্ট করা হলে তাঁদের মধ্যে অনেককে পাবেন, যারা সেক্যুলার রাজনীতির বর্তমান কেন্দ্রীয় চরিত্র, ইসলামের নেতৃত্ব দিয়ে দ্বীন প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা রাখবে। এই প্রত্যাশায় বিষয়টি অত্যান্ত স্পর্শকাতর হওয়া সত্ত্বেও লিখা এবং প্রকাশের মনস্থির করেছি।

সেক্যুলার রাজনীতি ছাড়াও একবিংশ শতাব্দির প্রথমদিকে জঙ্গিবাদও একটি ফেতনা ও ষরযন্ত্রের উপজিব্য হিসেবে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠে। এই পুস্তকে উক্ত বিষয়টিও সীমিত আকারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই পুস্তকে আলোচ্য বিষয়সমূহ নিয়ে দেশের মূলধারার আলেমদের মতামত নেয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। এ কাজে যারা আমাকে সহযোগীতা করেছেন তাদরে তালিকাটা একটু দীর্ঘ। আমি তাঁদের সকলের নিকট কৃতজ্ঞ। আল্লাহ্ তাঁদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। সতর্কতা অবলম্বনের পরও কোনো ভুল থেকে যাওয়ার সম্ভাবনাকে স্বীকার করে বিজ্ঞজনের নিকট আবেদন থকলো এর পরিশুদ্ধি ও উন্নয়নের লক্ষ্যে আপনার পর্যবেক্ষণ দয়া করে অবহিত করার জন্য।

-কাজী ওমর ফারুক এফসিএ

সূচীপত্র

ইসলাম এবং মুসলিম ১১
মুসলমান কাকে বলে ১২
দাসত্ব ও আনুগত্য ১৩
আনুগত্যের ব্যাপ্তি ১৪
আল্লাহ্‌র বিধানের বিষয়ে আপোস ১৭
ইসলামের ভিত্তিসমূহ এবং রাজনৈতিক বিশ্বাসের সাথে সম্পর্ক ২২
ঈমান ২৩
আল্লাহ্‌র উপর ঈমান ২৪
পরকালের উপর ঈমান ৩৭
নবী-রাসূল বা রিসালাতের উপর ঈমান ৪১
আসমানী কিতাবসমূহের উপর ঈমান ৪৯
ফেরেশতাদের উপর ঈমান ৫১
সালাত কায়েম করা ৫২
সালাতে প্রদত্ত ঘোষণা, গৃহীত দায়িত্ব-কর্তব্য ও প্রদত্ত প্রতিজ্ঞা ৫৫
ফাতিহা পাঠ ৬২
সিদ্দীক এর সংজ্ঞা ৭১
রুকু ও সিজদার তাসবিহ্‌ ৮২
তাশাহুদ ৮৩
দরূদ শরীফ ৮৫
সিয়াম ৮৭
হজ্জ ৮৮
তালবিয়া ৮৯
বিদায় হজ্জের ভাষণে রাজনৈতিক নির্দেশনা ৯১
ইসলামের আলোকে বাংলাদেশের রাজনীতি ৯৫]

ইসলাম প্রতিষ্ঠার রাজনীতি ১১৭
ইসলামী আন্দোলন ১২২
ইসলামী আন্দোলনের অপরিহার্যতা ১২৫
দ্বীন প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি ১২৯
দাওয়াতে দ্বীন ১৩০
দাওয়াতের বিষয়বস্তু ১৩২
দাওয়াতের পদ্ধতি ১৩৬
দায়ীর অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য ১৪২
জ্ঞানার্জন এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ১৪৪
ঐক্য ও জামাতবদ্ধ মুসলিম উম্মাহ্ ১৪৬
ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও তার সংরক্ষণ ১৪৮
প্রতিরোধমূখর পরিবেশে আহবায়কের কৌশল ১৫২
বাংলাদেশে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ্ ১৫৬
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ১৬০
ইসলামী ঐক্যজোটভুক্ত ও অন্যান্য ইসলামী দলসমূহ ১৬৪
বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের সংকট ও সম্ভাবনা ১৭১
সেক্যুলার দলের সাথে কোয়ালিশন করে সরকার গঠন ১৮১
গণতন্ত্র, গণনির্বাচন, গণবিক্ষোভের মাধ্যমে ইসলামী বিপ্লব ২০৪
জঙ্গিবাদ ও ইসলাম ২০৮
বিকল্প ভাবনা ২১৩
বিকল্পের বিকল্প ২২২
শেষ কথা ২২৪

ইসলাম এবং মুসলিম

পৃথিবীর প্রথম মানুষ ও নবী আদি পিতা আদম আ. হতে শেষ নবী মুহাম্মদ সা. পর্যন্ত আল্লাহ্‌র নিকট হতে মানব জাতির জন্য নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে প্রবর্তিত, আরোপিত ও নির্ধারিত দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা হলো ইসলাম। আরবি শব্দ ইসলামের অর্থ হলো 'আত্মসমর্পণ', বিশেষ করে, এক আল্লাহ্‌র ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করা। ইসলাম শব্দের অপর অর্থ হলো শান্তি, পরিশুদ্ধি। ইসলাম একটি নিরঙ্কুশভাবে তাওহীদ ভিত্তিক তথা এক আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসী জীবন ব্যবস্থা, যার অনুগামীরা মুহাম্মদ সা. এর পরিপূর্ণ অনুসারী, যাদেরকে মুসলমান নামে অবিহিত করা হয়। সকল মুসলমানদেরকে সম্মিলিতভাবে মুসলিম উম্মাহ বলা হয়।

মুসলিম উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত হতে ইচ্ছুক প্রত্যেক মুসলমানের প্রথম ও মৌলিক দায়িত্ব হলো নিজের মুসলমানিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া। আর কেউ যদি নিশ্চিত হতে চান, তিনি মুসলমান কি না, তাকে প্রথমে জেনে নিতে হবে মুসলমান কাকে বলে। অত:পর মুসলমানের সংজ্ঞার সাথে নিজের বিশ্বাস, কর্ম ও বৈশিষ্ট্য মিলিয়ে নিলে যে কেউ নিজের মুসলিম হওয়া সম্পর্কে সহজে আঁচ করতে পারবেন। মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা অবলোকনে মনে হয়, প্রত্যেক মুসলমান যদি মুসলমানের প্রকৃত সংজ্ঞা বুঝতে পারেন এবং যে কোনো প্রকার ঝোঁক প্রবণতার ঊর্ধ্বে থেকে নিজেকে ঐ সংজ্ঞার সাথে মিলিয়ে নেন, তবে অনেকে হতচকিত হয়ে যাবেন। কেননা অনেকে জন্মাবধি কাল হতে হৃদয় পটে মুসলমানের চিত্র যেভাবে কল্পনা করে আসছেন এবং যে ধারণার ভিত্তিতে নিজেকে মুসলমান মনে করে আসছেন, তার সাথে মুসলমানের প্রকৃত সংজ্ঞার হয়তো দূরতম সম্পর্কও খুঁজে পাবেন না।

মুসলমান এমন কোনো পরিচিতি বা উপাধী নয় যে, তা বংশগতভাবে বা জন্মসূত্রে পাওয়া যায়; এমন কোনো উপাধীও নয়, যা কোনো গোষ্ঠি বা জাতি বা কোনো প্রতিষ্ঠান কাউকে দিতে পারে। বরং প্রতিটি মানুষকে নিজস্ব বিশ্বাসের ও কাজের মাধ্যমে মুসলমানিত্ব অর্জন করতে হয়। অথচ অনেকের পক্ষে হয়তো অদ্যাবধি সেই রকম কোনো অর্জন সম্ভব হয়নি। অর্থাৎ, একজন মানুষ কোনো মুসলমানের ঔরসে জন্মগ্রহণ করা মুসলমান হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। তাকে কজের মাধ্যমে মুসলমানিত্ব অর্জন করতে হবে।

যারা নিজেদেরকে মুসলমান দাবি করছেন বা মুসলমান থাকতে আগ্রহী, তাঁদের উচিত অনতিবিলম্বে মুসলমানের প্রকৃত সংজ্ঞা জেনে নিয়ে সে অনুসারে নিজেদের জীবনকে ঢেলে সাজিয়ে নেয়া। কেননা মৃত্যুর সময় অজ্ঞাত থাকার

কারণে কার জীবন হতে সংশোধনের সুযোগ কোন মুহূর্তে চিরতরে নিঃশ্বেষ হয়ে যাবে, তা কারো জানা নেই। সেহেতু, খুব দ্রুত নিজেদের সংশোধন নিশ্চিত করা সম্ভব না হলে হয়তো আর কখনো নিজেকে সংশোধন করার সুযোগ পাওয়া যাবে না। আল্লাহ্ বলেন;

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَ لَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ١٠٢

'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকেযেমন ভয় করা উচিত ঠিক তেমনিভাবে ভয় করতে থাকো এবং অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।

-আলে ইমরান-১০২

মুসলমান হওয়ার শর্তসমূহ চিহ্নিত করা এবং পরিপালন করে অনতিবিলম্বে মুসলিম হওয়া সম্ভব না হলে জীবনের এক বিশাল সময় ভুল পথে ব্যয় করে বিভ্রান্ত অবস্থায় পাড়ি জমাতে হবে পরপারে।

মুসলমান কাকে বলে

আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস স্থাপনপূর্বক তাঁর দসত্ব স্বীকারকারী এবং রাসূল সা. এর অনুসারী ব্যক্তিদেরকে বলা হয় মুসলমান। সুতরাং, মুসলমানের সংজ্ঞা বলতে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল সা. কর্তৃক প্রদত্ত অর্থাৎ কুরআন ও হাদীসে প্রদত্ত সংজ্ঞাকে বুঝতে হবে।

মুসলমান শব্দের অর্থ হলো অনুগত, আত্মসমর্পণকারী। সুতরাং, মুসলমান বলতে একজন অনুগত বা আত্মসমর্পণকারী ব্যক্তিকে বুঝাবে। বিবেচ্য বিষয় হলো–অনুগত ব্যক্তিটিকে কার অনুগত হতে হবে বা কার নিকট আত্মসমর্পণ করতে হবে, কী কী বিষয়ে এবং কতোটুকু আনুগত্য করতে হবে এবং কোনো প্রতিকূল অবস্থায় আনুগত্য শিথিল করা যাবে কি না? কুরআন এবং সুন্নাহ্ হতে এ সকল প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। কার আনুগত্য করতে হবে, এ বিষয়ে আল্লাহ্ পবিত্র কালামে হাকীমে বলেছেন;

قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ؕ وَ اُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ ٧١

'বলো, আল্লাহ্‌র পথই পথ এবং আমরা বিশ্বজগতের প্রতিপালকের কাছে আত্মসমর্পণ করতে আদিষ্ট হয়েছি।' -সূরা আন'আম, আয়াত ৭১

اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ ۙ اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْۢ بَعْدِيْ ؕ قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَ اِلٰهَ اٰبَآىِٕكَ اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ وَ اِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ ۖ وَّ نَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ١٣٣

‘সে (ইয়াকুব) যখন পুত্রগণকে জিজ্ঞেস করেছিল, আমার মৃত্যুর পর তোমরা কার আনুগত্য করবে? তাঁরা তখন বলেছিল, আমরা আপনার এক আল্লাহ্ ও আপনার পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম, ইসমাইল ও ইসহাকের আল্লাহ্‌র আনুগত্য করবো এবং আমরা তাঁর কাছে আত্মসমর্পণকারী।’ -সূরা বাক্বারাঃ আয়াতঃ ১৩৩

اِنَّنِيْٓ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدْنِيْ١ۙ وَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ١۴ ۰۰

‘আমিই আল্লাহ্, আমি ভিন্ন কোনো ইলাহ (উপাস্য) নেই। অতএব আমার ইবাদত করো এবং আমার স্মরণার্থে সালাত আদায় করো।’

-সূরা ত্বহাঃ আয়াত ১৪

وَ اِنَّ اللّٰهَ رَبِّيْ وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ١ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ۳۶ ۰۰

‘আল্লাহ্ই আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক; সুতরাং, তাঁর ইবাদত (উপাসনা) কর; এটিই সরল পথ’– সূরা মরিয়মঃ আয়াত ৩৬

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ لَا تُبْطِلُوْۤا اَعْمَالَكُمْ۳۳

‘হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রসূলের আনুগত্য করো এবং নিজেদের কর্ম বিনষ্ট করো না। -সূরা মুহাম্মদঃ ৩৩

কুরআনুল কারীমের উপরোক্ত আয়াতসমূহে বলা হয়েছে, কোনো মানুষকে মুসলমান হতে হলে একমাত্র আল্লাহ্‌র দাসত্ব/আনুগত্য করতে হবে এবং আল্লাহ্‌র আনুগত্যের বিপরীতে পৃথিবীর অন্য কোনো সত্তার আনুগত্য করা মুসলমানিত্বের দাবির পরিপন্থি।

দাসত্ব ও আনুগত্য

আনুগত্য বা আত্মসমর্পণ বলতে এমন একটি অবস্থাকে বুঝায়, যখন কেউ নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, কামনা-বাসনা নির্দ্বিধায় বিসর্জন দিয়ে শর্তহীনভাবে কারো ইচ্ছায় চালিত হওয়ার জন্য সংকল্পবদ্ধ হয় এবং নিজেকে সে মতে পরিচালিত করে। যখন কোনো ব্যক্তি আল্লাহ্‌র আনুগত্য স্বীকার করে মুসলমান হয়ে যাবে, তখন নিজেকে এমনভাবে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার উপর সমর্পন করে দিতে হবে যে, আল্লাহ্ যা কিছু হালাল করেছেন তা হালাল হিসেবে গ্রহণ করতে হবে এবং যা কিছু হারাম করেছেন, তা হারাম হিসেবে ত্যাগ করতে হবে। আল্লাহ্ যাকে শর্তহীনভাবে অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন, তাকে শর্তহীনভাবে অনুসরণ করতে হবে, আর যাকে নির্ধারিত সীমার মধ্যে থেকে অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন, তাকে সেই সীমার মধ্যে থেকে অনুসরণ করতে হবে। আল্লাহ্ মানুষের

জন্য যা কিছু কল্যাণকর বলে জানিয়েছেন, তা কল্যাণকর বিশ্বাস করতে হবে। আর যা কিছু অকল্যাণকর বলে জানিয়েছেন, তা অকল্যাণজনক বিশ্বাস করে ত্যাগ করতে হবে। এমনকি যে সকল বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহতে সুস্পষ্ট কোনো বিধান নেই, সে ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র অপরাপর বিধানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে যা কিছু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য অধিক ফলপ্রসূ হবে, ঠিক সেই কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে। মহান আল্লাহ্‌র কোনো আদেশ-নিষেধের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ, দ্বিধা, নেতিবাচক বিবেচনা মনে স্থান দেয়া যাবে না এবং নিজের মতকে আল্লাহ্‌র হুকুমের উপর প্রাধান্য দেয়াতো দূরের কথা, তার চিন্তা করারও আবকাশ নেই। যখন কোনো ব্যক্তি ঠিক এভাবে আল্লাহ্‌র ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিতে সক্ষম হবেন, তখন সে আল্লাহ্‌র অনুগত এবং আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণকারী হিসেবে গণ্য হবেন। সুতরাং, মুসলমান হওয়ার জন্য সর্বপ্রথম শর্ত হলো শর্তহীনভাবে আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পন করা বা আল্লাহ্‌র আনুগত্য গ্রহণ করা।

আনুগত্যের ব্যাপ্তি

আমরা অবগত আছি, আমাদেরকে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করতে হবে। কিন্তু বর্তমান মুসলমানদের অবস্থা পর্যালোচনা করলে একথা প্রতীয়মান হয়, আমরা যেন ধরে নিয়েছি, আমাদের জীবনের কোনো কোনো অংশে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করলে চলবে আর অপরাপর ক্ষেত্রে নিজেদের ইচ্ছায় চালিত হতে তেমন কোনো ক্ষতি নেই। আল্লাহ্‌র আনুগত্য করতে গিয়ে মসজিদে জামায়াতের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করছেন, রমজান মাসে বিশাল সমারোহে সিয়াম পালন করছেন, হজ্জের মাসে ব্যাপক প্রস্তুতিসহ হজ্জ পালনে সদলবলে আল্লাহ্‌র ঘরের সামনে উপস্থিত হচ্ছেন এবং বছর শেষে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণাসহ দরিদ্রদের মাঝে যাকাতের মালও স্বহস্তে বিতরণ করছেন। অন্যদিকে যখন ব্যবসায়িক প্রয়োজনে মূলধনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছেন, চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ প্রদানের শর্তে ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণে সামান্যতম দ্বিধা করছেন না, জীবিকার্জনের প্রয়োজনে এমন কোনো পদে চাকুরি নেয়াকে নিজের জন্য সম্মানজনক মনে করছেন, যেখানে বসে আল্লাহর শত আদেশ লঙ্ঘন করতে হয়, নিজেকে রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সেক্যুলার রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে, মজুদদারীর মাধ্যমে পণ্য-সামগ্রির কৃত্রিম সঙ্কট সৃষ্টির মাধ্যমে বিশাল মুনাফা হাতিয়ে নিচ্ছেন। অর্থাৎ, আজকে অধিকাংশ মুসলমান ব্যক্তিগত জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তার অজুহাতে নিজেদের খুশিমতো কর্মপন্থা স্থির করছে, অপরদিকে সালাত, সিয়াম ও হজ্জ, যাকাতের মতো কিছু ক্ষেত্রে (সে সকল ইবাদতের

অর্ন্তনিহিত শিক্ষা জীবনে বাস্তবায়নের চেষ্টা ব্যতিরেকে) আনুষ্ঠানিকতা পরিপালন করে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করছেন বলে মনে করছে। সালাত, সিয়াম, হজ্জ, যাকাতের আনুষ্ঠানিক পরিপালনের কারণে নিজেদেরকে মু'মিন মনে করছেন এবং অপরাপর বিষয়সমূহে বাস্তব প্রয়োজনে ভিন্ন সিদ্ধান্ত নেয়াকে লঘু অপরাধ মনে করে উক্ত ইবাদতের বদৌলতে নিজেদেরকে জান্নাতের অধিকারী মনে করছে। অথচ মুসলমান হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট কয়টি ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করা যথেষ্ট নয়। জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করতে হবে। আল্লাহ্ কালামে হাকীমে বলেন–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ؕ

'আজ আমি তোমাদের আনুগত্যের বিধান পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জীবন বিধান হিসেবে মনোনীত করলাম।' –সূরা মায়েদা: আয়াত ৩

এতে প্রতীয়মান হয় মানুষের জীবনে যত ধরনের সমস্যার উদ্ভব হতে পারে, তার প্রতিটি বিষয়ে মহান আল্লাহ্‌র মনোনীত নির্দেশনা রয়েছে এবং সে নির্দেশনা বা বিধানের নাম হলো ইসলাম। একজন মানুষের সালাত আদায়ের পদ্ধতি যেমনি ইসলাম বলে দিয়েছে, তেমনি যুদ্ধ করার পদ্ধতিও ইসলাম বলে দিয়েছে। সন্তান পালনের পদ্ধতি সম্পর্কে যেমন ইসলামের নির্দেশনা রয়েছে, তেমনি মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য সম্পর্কেও ইসলামে নির্দেশনা রয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি, যুদ্ধ, দেশ পরিচালনাসহ জীবনের এমন কোনো বিষয় নেই, যেখানে ইসলামের দিক নির্দেশনা নেই। আল্লাহ্ আমাদের জন্য এইসব সমস্যার দিক নির্দেশনা সম্বলিত বিধান (ইসলাম) কেই আমাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং আল্লাহ্ আরও বলেছেন–

وَ مَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰىهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۵۰

'আল্লাহ্‌র দেয়া বিধান পরিত্যাগ করে যে ব্যক্তি নিজের নফসের ইচ্ছামতো চলে তার অপেক্ষা অধিক গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে? এ ধরনের জালেম লোকদেরকে আল্লাহ্ কখনোই সৎ পথের সন্ধান দেন না।'

-সূরা ক্বাছাছ: ৫০

আল্লাহ্ সূরা মায়েদার ৩ নম্বর আয়াতে মানুষকে জানিয়েছেন যে, আল্লাহ্ মানুষের জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে তাঁর বিধান দানের মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ নিয়ম-নীতি বা বিধান স্থির করে দিয়েছেন এবং মানুষের জন্য উক্ত বিধানই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একমাত্র মনোনীত বিধান। মানুষ তার জীবনে এমন কোনো

সমস্যার সম্মুখীন হবে না যে বিষয়ে ইসলাম কোনো সমাধান দেয়নি[১]। অর্থাৎ, প্রতিটি সমস্যার সমাধান আল্লাহ্‌র বিধান হতে খুঁজে পাওয়া যায়। অপরদিকে সূরা ক্বাছাছের এই আয়াতে আল্লাহ্ যারা আল্লাহ্‌র দেয়া বিধানের পরিবর্তে নিজের বা অপর কোনো মানুষের দেয়া বিধানের অনুসরণ করবে, তাদেরকে কড়া হুঁশিয়ার করেছেন। আল্লাহ্‌র আয়াত অনুসারে এ সকল লোক পথভ্রষ্ট ও গোমরাহ। কোনো ব্যক্তি আল্লাহ্‌র বিধানের বাইরে কোনো বিধানের অনুসারী হলে, সে মুসলমান হতে পারবে না। আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন-

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَ تَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ ؕ وَ مَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۸۵

‘তবে তোমরা কি আল্লাহর কিতাবের একাংশ বিশ্বাস করো এবং অপর অংশকে করো অবিশ্বাস? জেনে রাখো তোমাদের মধ্যে যাদের এরূপ আচরণ হবে তাদের আর কী শাস্তি হতে পারে যে, তারা পার্থিব জীবনে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে থাকবে এবং পরকালে তাদেরকে কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষেপ করা হবে। আল্লাহ্ তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে বে-খবর নন।’

সূরা আল-বাক্বারা: ২;৮৫

যে সকল মুসলমান সালাত সিয়ামের আনুষ্ঠানিক পরিপালনের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র অনুগত হয়ে পরকালীন মুক্তির আশা করছেন অপরদিকে আল্লাহ্‌র বিধানের বিপরীতমুখী হওয়া সত্ত্বেও পার্থিব বাহ্যিক সুবিধা লাভের জন্য নিজের খেয়াল-খুশিমতো বা অপর কোনো মানুষকে খুশি করে নিজের কার্যসিদ্ধির জন্য মানুষের খেয়াল-খুশি, ইচ্ছানুসারে কর্মপন্থা স্থির করেছেন বা আল্লাহ্‌র বিধান ও ধর্মহীন বিধান- দু’ধরনের বিধান পরিপালনের মাধ্যমে উভয়কালে কল্যাণ লাভ করতে চান, এ আয়াতটি তাদের বোধোদয়ের জন্য যথেষ্ট। মূলত: উভয় নীতির অনুসরণের মাধ্যমে পরিপূর্ণ মুসলমান হওয়া এবং পরকালীন মুক্তি লাভ করা সম্ভব নয়। মানুষকে মুসলমান হওয়ার জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি বিষয়ে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করতে হবে। মসজিদে আল্লাহ্‌র হুকুম অনুসারে কাজ করা আর সংসদে গিয়ে ব্যতিক্রম বিধান রচনা করা, একদিকে হিসেব করে যাকাত দেয়া, অপরদিকে সুদে ঋণ গ্রহণ করা, রাতের আঁধারে তাহাজ্জুদ সালাতে দাঁড়িয়ে

[1] কোরআনে ও হাদীস গ্রন্থে কতিপয় বিষয়কে ফরজ, কতিপয় বিষয়কে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। অপরাপর বিষয় হল মুবাহ বা অনুমোদিত।

আল্লাহ্‌কে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা দেয়া আর জনসমক্ষে মানব রচিত বিধান প্রতিষ্ঠার রাজনীতিতে জড়িত থেকে মানুষের রচিত বিধানের শ্রেষ্ঠত্বের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে প্রকারান্তরে আল্লাহ্ অপেক্ষা কোনো মানুষকে শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা দেয়া যাবে না। মসজিদে যেমনি আল্লাহ্‌র আইন, শাসনব্যবস্থায়ও আল্লাহ্‌র বিধান, বিচারালয়েও আল্লাহ্‌র আইনের অনুসরণ করতে হবে।

আল্লাহ্‌র বিধানের বিষয়ে আপোস

আল্লাহ্‌র বিধান পালনের প্রতিবন্ধক কোনো পরিস্থিতিতে আল্লাহ্‌র বিধান পরিহার করে নিজের খেয়াল-খুশির বা অপর কোনো পন্থার অনুসরণ করা যাবে কি না, তার মিমাংসাও হওয়া প্রয়োজন।

আফগানিস্তানের মতো দু'একটি রাষ্ট্র ব্যতিত বর্তমান বিশ্বের কোথাও পরিপূর্ণ ইসলাম প্রতিষ্ঠিত আছে, তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। কেননা বিশ্বের স্বল্পসংখ্যক দেশে ইসলাম চর্চা বা ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও রয়েছে অনেক সীমাবদ্ধতা, আর বাদবাকি প্রতিটি দেশে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে ইসলামহীন জীবন ব্যবস্থা। যেমন- বাংলাদেশে বিবাহ ও মিরাস বন্টন আইন ব্যতীত প্রায় সকল আইন ইসলামের গণ্ডি বহি:র্ভূত ও মানব রচিত। আবার বিবাহ বিচ্ছেদ ও তালাক আইনের (পারিবারিক আইন) ক্ষেত্রেও রয়েছে অনেক সীমাবদ্ধতা। এসকল মানব রচিত আইনসমূহের অধিকাংশ আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ আনুগত্যের প্রত্যক্ষভাবে প্রতিবন্ধক। এসকল অজুহাতে মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও সিংহভাগ মুসলিম আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ আনুগত্য করে না, বা করতে পারে না। যেমন- একজন মুত্তাকী বলে পরিচিত ব্যক্তিকে যদি প্রশ্ন করা হয় সুদ হারাম, তাই আপনি সুদ গ্রহণ করেন না কিন্তু আপনার ব্যবসায়িক প্রয়োজনে অর্থ সংস্থান করতে গিয়ে সুদ দিচ্ছেন কেন? সালাতে আল্লাহ্‌কে প্রথমে শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন, আল্লাহ্‌র আইনের মাধ্যমে এ দেশে শান্তি আসতে পারে বলে বিশ্বাস করেন, অথচ ভাষাগত জাতীয়তাবাদ বা দেশভিত্তিক জাতীয়তাবাদের রাজনীতিতে অংশ নিয়ে সংসদ সদস্য হয়ে মানব রচিত মতবাদকে লালন-পালন, রক্ষণাবেক্ষণ ও একইরূপ আইন রচনা করছেন কেন? আল্লাহ্‌র আইনকে শ্রেষ্ঠ মনে করা সত্ত্বেও মানব আইনের ভিত্তিতে গড়ে উঠা শাসকদের অধীনে বিচারকের পদে চাকুরি নিয়ে মানব রচিত বিধান অনুসারে বিচার ফয়সালা করছেন কেন? একটি দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হয়ে আপনার প্রতিষ্ঠানে সেক্যুলার শাসক গোষ্ঠীর নেতাদেরকে স্বাগত জানিয়ে তাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে, তাদের থেকে দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের জন্য আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করছেন

কেন? ঘুষ দেয়াকে ঘৃণা করা সত্ত্বেও সরকারি কর্মকর্তাকে ঘুষ দিচ্ছেন কেন? আল্লাহ্‌কে রিজিকদাতা হিসাবে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও নিজের রিজিকের জন্য খোদাদ্রোহীদের চাকুরি গ্রহণ করে তাদেরকে সহযোগিতা করার মাধ্যমে সেক্যুলার সমাজব্যবস্থার সংরক্ষক হিসেবে কাজ করছেন কেন? আল্লাহ্‌কে রিজিকদাতা হিসেবে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও আপনার দ্বীনি প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ইয়াতীম ছাত্রদের আহারের জন্য হারাম উপার্জনকারীদের নিকট আবেদন করছেন কেন? কালেমা পাঠের মাধ্যমে পৃথিবীর সকল ইলাহ্ তথা রিজিকদাতা, বিধানদাতা, অভিভাবক সবকিছুকে অস্বীকার করা সত্ত্বেও বাস্তব জীবনে এসে নির্দ্বিধায় খোদাদ্রোহীদের আনুগত্য করে তাদের বিধানের অনুসরণ করছেন কেন?

তখন হয়তো সেই সালাত সিয়ামের আনুষ্ঠানিকতা পরিপালনকারী ব্যক্তিটি প্রত্যুত্তরে দেশের পরিস্থিতির কথা বলে তার কর্মের বৈধতার পক্ষে যুক্তি-প্রমাণ পরিবেশন করতে চাইবেন। তিনি হয়তো বলবেন, দেশে পর্যাপ্ত ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা না থাকায় সুদ দিয়ে অর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করা না হলে ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে, দেশের অধিকাংশ মানুষ ইসলামী রাজনীতি করছেন না বিধায় ইসলামী আন্দোলন করে এম.পি. হওয়া সম্ভব হবে না, যেহেতু দেশে ইসলামী আইন নেই সেহেতু মানব আইনে বিচার না করলে সরকারি চাকুরি পাওয়া যাবে না, সরকারি সহযোগিতা না থাকলে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা সম্ভব নয় ইত্যাদি, ইত্যাদি।

বিরুপ বা প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে আল্লাহ্‌র আইন বা আল্লাহ্‌র আনুগত্য না করে বিপরীত মতাদর্শের সাথে আপোস করে কোনো মানুষের পক্ষে মুসলমান হওয়া কি সম্ভব? নাকি আজকে মুসলমানগণ যে কোনো পরিস্থিতিতে নিজে সুখে-সমৃদ্ধিতে থাকার জন্য ক্ষেত্রবিশেষে আল্লাহ্‌র আনুগত্য ত্যাগ করার কারণে মুসলমানিত্ব হারিয়ে আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির কাজ করে ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে?

এ প্রশ্নের উত্তরটি বুঝে নেয়া মুসলমানদের জন্য অতিশয় জরুরি। কেননা, আজকে মুসলমানদের সিংহভাগ প্রতিকূল পরিস্থিতির অজুহাতে ক্ষেত্রবিশেষে আল্লাহ্‌র আনুগত্য পরিহারকে নিজের জন্য বৈধ করে নিয়েছেন। এই শ্রেণির মুসলমান সম্পর্কে কুরআনে বহু আয়াত রয়েছে এবং বহুসংখ্যক হাদীস রয়েছে। মুসলমান থাকতে হলে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আল্লাহ্‌র আনুগত্যের বিষয়ে ঠিক কী ধরনের ভূমিকা পালন করতে হবে, তা যদি এ সকল মুসলমান ইসলাম প্রতিষ্ঠার ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন, তবে তারা পরিস্থিতির অজুহাতে আল্লাহ্‌র আনুগত্য পরিহার করার পর নিজেদেরকে প্রকৃত মুসলমান দাবি করতে পারবেন না। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মানুষের জন্য রহমতস্বরূপ মানবতার মুক্তির দূত মুহাম্মদ সা. ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য দুনিয়াতে এসেছিলেন, তিনি এমন এক সমাজে ইসলাম

প্রতিষ্ঠার কাজ করেছিলেন, যে সমাজে বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থার মতো সুগঠিত সেক্যুলার রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত না থাকলেও তখনকার সমাজপতিদের এক শক্তিশালী খোদাদ্রোহী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল। আর ইসলাম এসে সেই সমাজব্যবস্থার মূলমন্ত্রে আঘাত হেনে মানুষকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করে আল্লাহ্‌র মনোনীত জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিল। ফলে আবু জাহেল, উৎবা, শাইবাসহ খোদাদ্রোহী দূর্দান্ত প্রতাপশালী সমাজপতিগণ আল্লাহ্‌র আহ্বানে সাড়া দানকারী মানুষের প্রতি নীতি বিবর্জিত হিংস্র পশুর মতো নির্যাতনের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছে। তারা নির্যাতনের যে নজির সৃষ্টি করেছিল তা বিশ্বের সর্বকালের নির্যাতনকে হার মানিয়েছে। একজন মানুষ আল্লাহ্‌র আনুগত্য গ্রহণ করেছে আর সাথে সাথে শুরু হলো তার উপর অমানবিক নির্যাতন। প্রখর রৌদ্রের প্রচণ্ড তাপে উত্তপ্ত বালিতে বা জলন্ত কয়লার উপর শুইয়ে দিয়ে বুকে পাথর স্থাপন করে, জীবন্ত মানুষটিকে কাঁকরময় ভূমিতে দুরন্ত গতিতে চলা ঘোড়ার সাথে বেঁধে দিয়ে এবং প্রতিনিয়ত হত্যার হুমকি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত খোদাদ্রোহী শক্তি মুসলমানদেরকে আল্লাহ্‌র আনুগত্য হতে বিরত রাখতে সচেষ্ট হয়েছিল। তৎকালীন সমাজের ব্যবসা-বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ ছিল খোদাদ্রোহী শক্তির হাতে। তারা অর্থনৈতিকভাবেও মুসলমানদের করেছিল অবরুদ্ধ। আল্লাহ্‌র আনুগত্যের পথে তারা প্রচণ্ড প্রতিবন্ধক হয়ে উঠেছিল। তথাপিও সেই সমাজের মুসলমানগণ উক্ত পরিস্থিতিতেও আল্লাহ্‌র আনুগত্য হতে সামান্যতম সরে দাঁড়াননি। বরং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি, জাহান্নামের ভয় আর প্রতিশ্রুত জান্নাতের প্রত্যাশায় সমাজপতিদের শারীরিক নির্যাতন-অর্থনৈতিক অবরোধকে উপেক্ষা করে আল্লাহ্‌র আনুগত্যের উপমা স্থাপন করেছিলেন।

এখন কথা হলো, কেউ যদি প্রকৃত মুসলমান হয় তবে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করার ক্ষেত্রে কোনো পরিস্থিতিকে কার্যকর প্রতিবন্ধক হিসেবে গ্রহণ করবে না। কেননা আল্লাহ্‌ ঘোষণা করেছেন-

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ؕ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَ يُقْتَلُوْنَ ؕ

‘আল্লাহ্‌ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তাঁরা যুদ্ধ করে আল্লাহ্‌র রাহে; অত:পর মারে ও মরে।’ -সূরা তওবা: আয়াত **১১১**

এ আয়াত হতে প্রতীয়মান হয়, যখন কোনো মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়, তখন নিজের জীবনকে জান্নাতের বিনিময়ে আল্লাহ্‌র নিকট বিক্রয় করে দেয়। যদিও মানুষের জীবনের নিরঙ্কুশ মালিক হলেন আল্লাহ্‌, তথাপিও

জীবনের প্রতি অধিকার, মায়া আল্লাহ্‌র রাহে ত্যাগ করার জন্য মানুষকে চিরস্থায়ী জান্নাত দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আল্লাহ্‌। সুতরাং, একজন মানুষ মুসলমান হওয়ার পর তাঁর জীবন ও সম্পদের উপর তাঁর এমন কোনো অধিকার থাকে না, যা রক্ষা করার জন্য সে আল্লাহ্‌র আনুগত্য ত্যাগ করতে পারে। কেননা কোনো বিক্রিত মালের উপর বিক্রেতার কোনো অধিকার থাকতে পারে না। কোনো বিক্রেতা বিক্রিত দ্রব্য ক্রেতার ইচ্ছা ব্যতিরেকে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে ব্যবহার করতে থাকলে বিক্রয় চুক্তির শর্ত ভঙ্গ হয়, এ কারণে প্রাপ্য মূল্য আশা করা নেহায়েত অন্যায়। সুতরাং, জীবন ও সম্পদ রক্ষার জন্য পরিস্থিতির অজুহাতে আল্লাহ্‌র আনুগত্য ত্যাগ করে অপর কোনো শক্তির আনুগত্য গ্রহণ করে জান্নাতের আশা করা অযৌক্তিক দাবি বৈ কিছু নয়। আর আখেরাতে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থায়ী কিছু না থাকায় যার স্থান জান্নাতে হবে না, তার স্থান হবে জাহান্নামে। প্রকৃতার্থে যারা পরিস্থিতির অজুহাতে নিজেদেরকে কখনো কখনো আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় এবং কখনো কখনো নিজের ইচ্ছায় বা সুবিধা দানকারী অপর কোনো শক্তির ইচ্ছায় চালিত করে, তারা নিতান্ত সুবিধাবাদী মানুষ। তারা দুনিয়ার সুবিধাকে বড় করে দেখেন। যখন তাদের মনে হয় এ কাজে দুনিয়াতে কিছু সুবিধা পাওয়া যাবে তখন এ বিষয়ে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত পথ না দেখার জন্য নিজের চোখ আঙ্গুল দিয়ে ঢেকে দেয় এবং সুবিধা লাভের জন্য সুবিধাজনক পথে চলতে থাকে। যদি কখনো সামনে আল্লাহ্‌র এমন নির্দেশ এসে উপস্থিত হয়, যা জীবনের জন্য ঝুঁকিবহুল, সম্পদ অর্জনের প্রতিবন্ধক আর ক্ষমতা লাভের অন্তরায়, তখন তারা আল্লাহ্‌র আনুগত্যের বিষয়ে উদাসীন হয়ে এক দিকে ছুটতে থাকে। আর যখন মনে হয় আল্লাহ্‌র আনুগত্য করার কারণে দুনিয়াতে সুবিধা পাওয়া যাবে, তখন আল্লাহ্‌র আনুগত্যের বিষয়ে তারা হয় অগ্রগামী। তারা যখন সালাত আদায় করে তখন তা হতে পরকালীন মুক্তি আশা করে। যখন সালাতের শিক্ষা জীবনে বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে জীবনের ঝুঁকি আসে, তখন তারা পরিস্থিতির ধূঁয়া তুলে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত পথে চলতে থাকে। আল্লাহ্‌ এ ধরনের সুবিধাভোগী মুসলমান সম্পর্কে বলেন;

وَ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ بِالرَّسُوْلِ وَ اَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ؕ وَ مَاۤ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ۴۷ وَ اِذَا دُعُوْۤا اِلَى اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ۴۸ وَ اِنْ يَّكُنْ لَّهُمُ الْحَقُّ يَاْتُوْۤا اِلَيْهِ مُذْعِنِيْنَ ۴۹ اَفِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَمِ ارْتَابُوْۤا اَمْ يَخَافُوْنَ اَنْ يَّحِيْفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَ رَسُوْلُهٗ ؕ بَلْ اُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۵۰

‘তারা বলে, আমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং আনুগত্য করি; কিন্তু অত:পর তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তারা বিশ্বাসী নয়। তাদের মধ্যে ফায়সালা করার জন্য যখন তাদেরকে আল্লাহ্ ও রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয় তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। সত্য তাদের স্বপক্ষে হলে তারা বিনীতভাবে রাসূলের কাছে ছুটে আসে। তাদের অন্তরে কি রোগ আছে, না তারা ধোঁকায় পড়ে আছে; না তারা ভয় করে যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তাদের প্রতি অবিচার করবেন? বরং তারাই তো অবিচারকারী।’

–সূরা আন নূর: আয়াত ৪৭-৫০

সুতরাং, এ ধরনের সুবিধাভোগী মানুষ যারা পরিস্থিতির অজুহাতে ভিন্ন নীতির অনুসরণ করেন, তারা নিজেদেরকে পূর্ণ মুসলমান মনে করার কোনো কারণ থাকতে পারে না। কেননা একজন মুসলমানের একমাত্র লক্ষ্য হবে আল্লাহ্র আনুগত্য করার মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করে জান্নাত লাভ করা। প্রকৃত যদি কেউ এ বিশ্বাস অন্তরে লালন করেন, তবে আল্লাহ্র আনুগত্য করার কারণে যদি জীবন ও সম্পদ ত্যাগ করতে হয়, আর তার পরিবর্তে পাওয়া যায় জান্নাত, তবে এ জীবন ও সম্পদ রক্ষা করার জন্য আল্লাহ্র আনুগত্য ত্যাগ করার কোনো কারণ থাকতে পারে না।

অতএব কোনো ব্যক্তি তখন মুসলমান হবেন, যখন যে কোনো পরিস্থিতিতে তিনি আল্লাহ্র আনুগত্যের ব্যাপারে সুদৃঢ় হবেন[2]।

সুতরাং, কোনো ব্যক্তিকে মুসলমান হতে হলে তাকে–

- নিরঙ্কুশভাবে একমাত্র আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণ করতে হবে।
- জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সা. আনুগত্য করতে হবে।
- যে কোনো পরিস্থিতিতে আল্লাহ্র আনুগত্যে অবিচল থাকতে হবে।

কোনো মানুষ প্রকৃত মুসলমান হলে তাঁর মধ্যে পূর্বোক্ত বৈশিষ্টসমূহ পরিলক্ষিত হবে। সেই মুসলমান ব্যক্তিটি নিজের মালিক, মনিব, অভিভাবক, আইনদাতা, রিজিকদাতা, সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও নিরঙ্কুশ আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ্কে মনে করবে এবং আল্লাহ্র মনোনীত রাসূল হিসাবে একমাত্র মুহাম্মদ সা. কে দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করবে।

---

[২] ঠেকাবসত: এমন খাদ্য সীমিত পরিমান গ্রহণ করা অনুমোদিত যা স্বাভাবিক অবস্থায় সুস্পষ্ট হারাম। ঐ পরিস্থিতিতে উক্ত বস্তু গ্রহণ করা দ্বারা অনুগত্য ত্যাগ করা বুঝায় না, কেননা তখন তা গ্রহণ করার নিষেধাজ্ঞা শর্তসাপেক্ষে রহিত। তবে যা অনুমোদিত নয় তা করা বা অননুমোদিত কর্মপন্থা গ্রহণ করা হলো আনুগত্যহীনতা।

ইসলামের ভিত্তিসমূহ এবং রাজনৈতিক বিশ্বাসের সাথে এদের সম্পর্ক

একজন মু'মিন বান্দাহর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হলো আল্লাহ্‌র দাসত্ব করার মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং এ লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য সর্ব্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়া। কোনো ব্যক্তি মুসলমান হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করার ব্যাপারে দৃঢ়পদ হওয়ার পাশপাশি যে সকল বিষয়ে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করতে হবে, তা কুরআন ও সুন্নাহ্ হতে সুস্পষ্টভাবে জেনে নিতে হবে। এর বিপরীত ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির পক্ষে পরিপূর্ণ মুসলমান হওয়া সম্ভব নয়। কেননা আল্লাহ্‌র অনুগত হওয়ার দৃঢ় সিদ্ধান্ত থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী জানা না থাকলে, আল্লাহ্‌র অনুগত হওয়া সম্ভব নয়। মুসলমান হতে হলে প্রথমে আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসর্মপণ করার জন্য দৃঢ়ভাবে সংকল্পবদ্ধ হতে হবে, অতঃপর আল্লাহ্‌র প্রতিটি আদেশ-নিষেধ অবগত হয়ে জীবনে তার বাস্তবায়নের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। ইসলাম হলো মানুষের জীবন পরিচালনার নিয়ম-নীতি। আর এ নিয়ম-নীতির অনুসারীগণ হলো মুসলমান। কতোগুলো শর্তের বা নিয়ম-নীতির পরিপালনের মাধ্যমে কেবল কোনো মানুষ মুসলমান হতে পারে। আর তার অনুসরণ না করলে সে অমুসলমান ও তার অস্বীকার করা কুফরী এবং বিরোধিতা করার নাম হলো খোদাদ্রোহিতা। একজন মানুষ কালেমা পাঠ করা এবং সালাত, সিয়ামের আনুষ্ঠানিকতা পালন করা সত্ত্বেও ভ্রান্ত রাজনৈতিক বিশ্বাস ও কর্মের কারণে অমুসলিম, কাফের ও খোদাদ্রোহী হিসেবে মৃত্যুবরণ করতে পারে। এ বিষয়টি উপলব্ধি করার জন্য মুসলমান হওয়ার প্রাথমিক শর্তাবলী এবং মর্মার্থ ও বাস্তব দাবিসমূহ জানা প্রয়োজন। যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলো সে-ই মুসলমান হয়ে গেল। ইসলামের পাঁচটি ভিত্তি রয়েছে। ইসলাম এ পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এ পাঁচটি ভিত্তিমূলের উপর দাঁড়িয়ে আছে ইসলামী জীবন-বিধানের সুরম্য সুদৃঢ় অট্টালিকা। এ অট্টালিকার মধ্যে অবস্থানকারী ব্যক্তি হলো মুসলমান। এই পাঁচটি ভিত্তি হিসেবে পরিগনিত ইবাদতসমূহের আনুষ্ঠানিক পরিপালন করা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে নিজেকে একজন সুদৃঢ় মুসলমান হওয়ার ধারণা ও আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়। বাস্তবতা হলো প্রকৃত মুসলমান হওয়ার জন্য ইসলামের ভিত্তি হিসেবে ঘোষিত ইবাদতসমূহের আনুষ্ঠানিক অনুশীলন যথেষ্ট নয়। এই ইবাদতসমূহের সাথে রাজনৈতিক বিশ্বাসের সম্পর্ক অনুধাবন করে বিশ্বাস ও কর্মের পরিশুদ্ধি আবশ্যক। বিষয়টি অনুধাবনের জন্য এ পাঁচটি ভিত্তির আলোচনা করা যেতে পারে;

ওমর রা. হতে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন, ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর স্থাপিত (১) সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ সা. আল্লাহ্র রাসূল (২) সালাত কায়েম করা (৩) যাকাত দেয়া (৪) হজ্জ করা এবং (৫) রমযানের রোযা রাখা।-সহীহ্ বুখারী: কিতাবুল ঈমান
এ পাঁচটি বিষয় ক্রমান্বয়ে আলোচনা করা হলো–

ঈমান

ইসলামের প্রথম ভিত্তি হলো ঈমান। কর্ম যাই হোক, মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণকারী প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেকে ঈমানদার হিসেবে জানে। তাঁরা ঈমান না থাকা বা ঈমানের ঘাটতির বিষয়টি কোনোভাবে স্বীকার করতে চান না। অথচ প্রকৃত ঘটনা হলো, এ সকল মুসলিম পরিবারের অনেকে ঈমানদার হওয়ার মৌলিক শর্ত পূরণ না করার কারণে সত্যিকার ঈমানদার নয়। তাদের নিজের সম্পর্কে এরূপ দাবির মূল কারণ হলো ঈমানের পরিচয় সম্পর্কে নিজের অজ্ঞতা। আমরা এ পর্যয়ে কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে ঈমান সম্পর্কে জানবো এবং দেখবো প্রচলিত রাজনীতিতে জড়িত হওয়া কীভবে ঈমানের দাবির পরিপন্থি;

ঈমান শব্দের আভিধানিক অর্থ 'বিশ্বাস'। ইসলামী পরিভাষায় শুধুমাত্র বিশ্বাস করাকে ঈমান হিসেবে গণ্য করা হয় না। তিনটি অবস্থার সহাবস্থানের নাম হলো ঈমান। এ তিনটি অবস্থা হলো প্রথমত, কোনো একটি বিষয় দৃঢ়তার সাথে অন্তরে বিশ্বাস করা, দ্বিতীয়ত, দ্ব্যর্থহীনভাবে উক্ত বিষয়ে মৌখিক ঘোষণা বা স্বীকৃতি দেয়া এবং তৃতীয়ত, বাস্তব কার্যাদীর মাধ্যমে নিজের বিশ্বাসের বাহ্যিক পরিস্ফুটন ঘটানো। এ পর্যায়ে উল্লেখ করবো, কী কী বিষয়ের উপর ঈমান আনতে হবে? এবং এ বিশ্বাস স্থাপনের মর্মার্থ কী এবং এর বাস্তব দাবি কতোটুকু?

পবিত্র কালামে হাকীমে আল্লাহ্ বলেন,

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ الْمَلٰٓئِكَةِ وَ الْكِتٰبِ وَ النَّبِيّٖنَ ۱۷۷

তোমরা পূর্বদিকে মুখ করলে, না পশ্চিমদিকে মুখ করলে, এতে সত্যিকার অর্থে কোনো কল্যাণ নিহিত নেই। আসল নেকীর ব্যাপার হচ্ছে, একজন মানুষ ঈমান আনবে আল্লাহ্র উপর, কিয়ামত দিবসের উপর, আল্লাহ্র ফিরিশতাদের উপর, আল্লাহ্র কিতাবের উপর, নবী-রাসূলগণের উপর। –সূরা বাক্বারা: ১৭৭

কালামে হাকীমের উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ্ তাআ'লা পাঁচটি বিষয়ের উপর ঈমান আনার নির্দেশ দিয়েছেন। এ পাঁচটি বিষয় হলো–

(১) মহান আল্লাহ্‌র উপর ঈমান।
(২) পরকালের উপর ঈমান।
(৩) আল্লাহ্‌র ফিরিশতাদের উপর ঈমান।
(৪) আসমানী কিতাবসমূহের উপর ঈমান।
(৫) নবী-রাসূল বা রিসালাতের উপর ঈমান।

এখন আলোচনা করা হবে এ সকল বিষয়ের উপর ঈমান আনার অর্থ কী? ঈমান আনার কারণে কোনো বিশ্বাস অন্তরে লালন করতে হবে এবং কী ধরনের ঘোষণা দিতে হবে ও কী কী বাস্তব কাজ সম্পাদন করতে হবে। আরো স্পষ্টভাবে বললে, যেহেতু প্রসঙ্গটা রাজনীতি, এ সকল বিষয়ের উপর ঈমান আনার সাথে রাজনৈতিক বিশ্বাসের সম্পর্ক কী তাও আলোচনা করা হবে। আমরা নিম্নোক্ত উপ-অনুচ্ছেদে তার আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ্–

আল্লাহ্‌র উপর ঈমান

আমরা ইতিপূর্বে বলেছি যে, ঈমান হলো অন্তরের বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি আর কার্যে পরিণত করার সমষ্টি। মহান আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনা হলো, আল্লাহ্‌র পরিচয় সম্পর্কে কতিপয় বিশ্বাস অন্তরে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা এবং সেই সকল বিশ্বাসের মৌখিক স্বীকৃতি দেয়া ও নিজের বাস্তব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রূপদানের মাধ্যমে বাস্তব সাক্ষী হয়ে দাঁড়ানো। আল্লাহ্ মানব জাতির কাছে কালামুল্লাহ্‌র মাধ্যমে নিজের পরিচয় জানিয়েছেন। মানুষকে মুসলমান হতে হলে কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ্‌র উক্ত পরিচয় অনুসারে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে, মৌখিক স্বীকৃতি দেয়া এবং নিজের কার্যকলাপের মাধ্যমে আল্লাহ্‌কে উক্ত মর্যাদা দিতে হবে। শুধু তাই নয়, আল্লাহ্ নিজের যে সকল গুণবাচক নাম উল্লেখ করেছেন সে অর্থে কাউকে তাঁর সমকক্ষও দ্বাড় করানো যাবে না। কেননা, আল্লাহ্ বলেছেন;

فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا

অতএব আল্লাহ্‌র সাথে তোমরা কাকেও সমকক্ষ করো না।

-সূরা আল বাক্বারা-২২

নিজের ঈমানের অবস্থা জানার জন্য প্রথমে আল্লাহ্‌র পরিচয় জানতে হবে এবং এ সম্পর্কে নিজের বিশ্বাস ও কর্মের অবস্থা পর্যালোচনা করে ঈমানের অবস্থার পরিমাপ করা যাবে। আল্লাহ্ কুরআনের বহু স্থানে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। কালামে হাকিমে আল্লাহর নিম্নোক্ত পরিচয় পাওয়া যায়:

রব : কালামে হাকীমে সর্বপ্রথম আল্লাহ্‌র এ গুণবাচক নামটি উল্লেখ করা হয়েছে। গুরুত্বের দিক দিয়েও আল্লাহ্ শব্দের পর এই শব্দটির স্থান। এটি এমনি এক

আধিক্যবোধক আরবী শব্দ যে, এর সমরূপ বা সমমর্যাদার কোনো শব্দ পৃথিবীর কোনো ভাষায় পরিলক্ষিত হয় না। তবে কুরআনের অনুবাদকগণ ও অভিধানসমূহে এর কাছাকাছি একাধিক শব্দ দ্বারা এর অর্থ প্রকাশের চেষ্টা করেছেন। ইসলামী বিশ্বকোষে যে অর্থসমূহকে সর্বাধিক বিশুদ্ধ বলে স্থান দেয়া হয়েছে, তা হলো; **(১) মালিক ও মুনিব (২) মুরব্বি, প্রতিপালক, পর্যবেক্ষক ও সংরক্ষণকারী (৩) শাসক, আইনদাতা, পরিচালক ও ব্যবস্থাপক**।আল্লাহ্ তাআ'লা এ সবদিক দিয়ে সমগ্র সৃষ্টিলোকের রব্ব। -তাফহীমুল কুরআন

অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ঈমান আনার মাধ্যমে মুসলমান হবেন, তিনি বিশ্বাস করবেন, একমাত্র আল্লাহ্ই তাঁর মালিক ও মনিব ও প্রতিপালক, তিনি আল্লাহ্র স্থলে অন্যান্য সকল মালিকানার ও মনিব হওয়ার দাবিদার সত্তাকে মৌখিকভাবে ও কাজ-কর্মের দ্বারা দ্ব্যর্থহীনভাবে অস্বীকার করবেন। অতএব বাস্তব জীবনে এমন কাউকে মেনে নেয়া যাবে না, যে আল্লাহ্র বিধানের অনুসরণ না করে তার অভিভাবক হয়ে বসতে চায়। তিনি বিশ্বাস করবেন আল্লাহ্ তাঁর পর্যবেক্ষক ও সংরক্ষণকারী। বাস্তব জীবনে নিজের পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব এমন কারও উপর সোপর্দ করবেন না, যে আল্লাহ্র অনুগত নয়। তাই বিশ্বাস করবেন যে, আল্লাহ্ তার এবং সকলের সবকিছু পর্যবেক্ষণ করছেন ও সংরক্ষণ করছেন। ফলে পৃথিবীর যে কোনো সত্তা নিজ ক্ষমতায় তাঁর পর্যবেক্ষণ ও সংরক্ষণের দাবিদার হবে, তিনি সেই সকল সত্তাকে অস্বীকার করবেন। তিনি বিশ্বাস করবেন, মহান আল্লাহ্ই একমাত্র আইনদাতা ও শাসক। সুতরাং, পৃথিবীর যে কোনো পক্ষ মানুষের জন্য স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আইন প্রণয়ন করবে এবং সেই আইনের মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করবে, উক্ত মুসলমান সে আইন ও শাসনব্যবস্থাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করবে। কেননা তিনি একমাত্র আল্লাহ্কেই আইন দেয়ার একমাত্র অধিকারী হিসেবে গ্রহণ করেছেন। যারা নিজেরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে আইন রচনা করে এবং সেই আইনে শাসন করে, তারা প্রকারান্তরে নিজেদেরকে মানুষের রব্ব দাবি করে। কোনো মানুষ যদি সেই আইন সন্তুষ্টির সাথে মেনে নেয়, তবে সে আল্লাহ্র পরিবর্তে সেই মানুষটিকে বা মানুষগুলোকে রব্ব হিসেবে গ্রহণ করলো। আর যারা সেই সকল মানুষের আইনসমূহ সংরক্ষণের জন্য কাজ করছে, তারা নিজেরাতো সেইসব মানুষগুলোকে রব্ব হিসেবে গ্রহণ করলোই, সাথে সাথে সেই মানুষদেরকে রব্ব হিসেবে গ্রহণ করে নিতে জনগণকেও বাধ্য করলো। ফলে তারা আল্লাহ্দ্রোহী হবে। এ অবস্থায় আল্লাহ্র কাছে তাদের ঈমান আনার দাবি কতোটুকু গ্রহণযোগ্য হতে পারে? কবরে যখন সওয়ালের সম্মুখীন হবে, তখন যতই মুখস্ত করে যাক না কেন, আল্লাহ্কে নিজের রব্ব হিসেবে ঘোষণা দিতে পারার কথা

নয়। কেননা, বাস্তবত: সে পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে মানুষকেই রব্ব হিসেবে গ্রহণ করেছিল। সুতরাং, আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনার অর্থ হলো আল্লাহ্‌কে নিজের রব্ব হিসেবে গ্রহণ করা। আর আল্লাহ্‌কে নিজের রব্ব হিসেবে গ্রহণ করার অর্থ হলো পৃথিবীর সকল মানব রচিত আইন, মতবাদ ও শাসন ব্যবস্থার প্রতি অন্তরে পরিপূর্ণ অনাস্থার সৃষ্টি করা, এ সকল আইন মতবাদ ও শাসনব্যবস্থাকে অস্বীকার করা এবং এ সকল আইন, মতবাদ ও শাসনব্যবস্থার অনুসরণ যাতে করতে না হয়, তার জন্য সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় এ সকল আইনের পরিবর্তে আল্লাহ্‌র আইন ও শাসনব্যবস্থা প্রতিস্থাপন করার প্রচেষ্টা চালানো। বাস্তব ক্ষেত্রে এর বিপরীত করা হলে, আল্লাহ্‌র উপরোক্ত গুণ-বৈশিষ্ট্যের তার ঈমান আনার দাবি লৌকিক বলে সাব্যস্ত হবে এবং সে কপট বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

রহমান : রহমান শব্দটির অর্থ হলো অসীম দয়ালু। যিনি আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনলেন তিনি বিশ্বাস করবেন আল্লাহ্‌ই সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান। আল্লাহ্‌ই দয়া করে তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং প্রয়োজনীয় সকল কিছুর ব্যবস্থা করার মাধ্যমে তার সংরক্ষণ করেন। তাঁকে আল্লাহ্‌ই এ অবস্থায় পৌঁছিয়ে দিয়েছেন এবং ভবিষ্যতেও আল্লাহ্‌র দয়াতে তাঁর নিজের সুরক্ষা নিহিত আছে। যখন কেউ আল্লাহ্‌কে পরম দয়ালু বলে বিশ্বাস করবেন, তখন তাঁর বাস্তব কর্মে তা প্রতিফলিত হবে। তিনি অতিমাত্রায় আল্লাহ্‌র প্রতি অনুরক্ত হয়ে যাবেন। তিনি সকল প্রয়োজনে আল্লাহ্‌র মুখাপেক্ষী হয়ে যাবেন। নিজের জীবনের অপরাধসমূহের জন্য তাঁর কাছে ক্ষমা পাওয়ার আশা করবেন। নিজেকে সংশোধন করবেন, তাঁর দয়ায় নিজেকে রক্ষা করার চিন্তা করবেন এবং কখনো আল্লাহ্‌র আইনে কোনো জুলুম আছে বলে অন্তরে বিশ্বাস করবেন না এবং কাজের দ্বারাও তার প্রতি ইঙ্গিত প্রদর্শন করবেন না।

খালিক : খালিক শব্দের অর্থ সৃষ্টিকর্তা। এখানে এমন এক সৃষ্টিকর্তাকে বুঝানো হয়েছে, যিনি কোনো কিছুর অস্তিত্ব ছাড়া সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষসহ জগতের সকল প্রাণীকূল সৃষ্টি করেছেন এবং বিশ্ব জাহানের সবকিছু তাঁর একক সৃষ্টি। সুতরাং, আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনার পর ঈমানদার ব্যক্তিটিকে বিশ্বাস করতে হবে আল্লাহ্‌ মানুষসহ সমগ্র জগতের স্রষ্টা, তিনি অতীতে সৃষ্টি করতে সক্ষম ছিলেন, বর্তমানেও শক্তিমান এবং অনন্ত ভবিষ্যতেও তাঁর একই শক্তি পূর্ণমাত্রায় অটুট থাকবে। সুতরাং, আল্লাহ্‌ই সর্বশক্তিমান। কোনো মানুষ যদি আল্লাহ্‌র এ বৈশিষ্ট্যের প্রতি বিশ্বাসী হয়, তবে সেই মানুষটির বাহ্যিক আচরণেও তা পরিলক্ষিত হবে। এর উপমা হলো এ জগতের কোনো শক্তিধর মানুষ, যার শক্তি সীমিত এবং একটি নির্ধারিত সময়ের পর নি:শেষ হয়ে যাবে, যদি অপর কোনো দুর্বল মানুষকে কোনো বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে এর বিপরীত দিকে কঠোরতা প্রদর্শনের

ঘোষণা দেয় তখন দুর্বল মানুষটি ভীত হয়ে পড়ে এবং উক্ত আদেশ লঙ্ঘন করার স্পর্ধা দেখাতে পারে না। এতএব কোনো মানুষ যদি আল্লাহ্‌কে এ জগতের স্রষ্টা হিসেবে বিশ্বাস করেন এবং এও বিশ্বাস করেন যে, তিনি কুরআনে বর্ণিত জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করতে সক্ষম এবং মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করে সেই জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে সক্ষম, তবে কোনো মানুষের পক্ষে আল্লাহ্‌র নাফরমানী করা সম্ভব হবে না। তাঁর আচার-আচরণে পূর্ণমাত্রায় আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনের ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠবে। মানুষকে আল্লাহ্‌র আইনের পরিবর্তে মনুষ্য আইন দ্বারা শাসনের মাধ্যমে মানুষের প্রভুতে পরিণত হওয়া তো দূরের কথা, আল্লাহ্‌র ভয়ে এ ধরনের কুফরী শক্তির যে কোনো ধরনের হুমকিও তাদের কর্ণকুহর স্পর্শ করতে সক্ষম হবে না। আল্লাহ্‌র আযাবের তুলনায় মানুষের অত্যাচার এতো তুচ্ছ মনে হবে যে, মানুষের এ অত্যাচারকে মেনে নিতেও কুণ্ঠিত হবেন না। যারা আল্লাহ্‌র নির্দেশের পরিপন্থী কাজ করতে মোটেও চিন্তিত হয় না, তাদের মনে নিশ্চয় আল্লাহ্‌র সৃষ্টি ক্ষমতার বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে বুঝতে হবে। তারা হয়তো মনে করে, এ জীবন এক নিছক সৃষ্টি, মৃত্যুর পর যেহেতু দেহ পচে গলে মাটির সাথে নিঃশেষ হয়ে যাবে, তা আর নতুন করে জীবিত হওয়া সম্ভব নয়। তাদের এ ধরনের বিশ্বাসের কারণে তারা পরকালের ব্যাপারে উদাসীন। আর ট্রেডিশন হিসেবে আল্লাহ্‌র উপর আস্থা থাকার ঘোষণা দেয়। সুতরাং, যারা আল্লাহর আনুগত্য করে না, তারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি করার ক্ষমতার উপর ঈমান রাখে না। স্বাভাবিক কারণে তাদের মুসলমান হওয়ার দাবি যুক্তিসঙ্গত নয়।

মালিক : এই শব্দটি মহান আল্লাহ্‌র এমন এক গুণ বর্ণনা করে, যা দিয়ে প্রকাশ পায় তিনি সবকিছুর নিরঙ্কুশ মালিক। মানুষের জীবনের মালিক তিনি, পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের মালিকও তিনি। মানুষ আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনার পর হতে বিশ্বাস করবে তার নিজের জীবনের উপরও নিজের কোনো মালিকানা নেই। এর নিরঙ্কুশ মালিক একমাত্র আল্লাহ্‌। সুতরাং, জীবনকে নিজের ইচ্ছামতো বা অপর কোনো মানুষের ইচ্ছামতো পরিচালনার কোনো অধিকার তার নেই। নিজের জীবনকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুসারে পরিচালনা করবেন। বিশ্বাস করবেন তার সকল সম্পদের মালিকও একমাত্র আল্লাহ্‌। তাঁর সম্পদের ব্যবহারও একমাত্র আল্লাহ্‌র আইন অনুসারে করবেন। তিনি বিশ্বাস করবেন, তাঁর দেশ তথা পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের মালিক একমাত্র আল্লাহ্‌। সুতরাং, দেশ আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও আইন দ্বারা পরিচালনা করবেন। যারা নিজেরা এ অর্থে দেশের সার্বভৌমত্বের মালিক দাবি করে যে, আল্লাহ্‌র আইনের সীমা বিবেচনায় না নিয়ে নিজেদের সিদ্ধান্ত বা ইচ্ছা অনুসারে দেশ পরিচালনা করবে, তাদের প্রতি সমর্থন ঈমানদার ব্যক্তি দিতে

পারেন না। বরং এ সকল অন্যায়ভাবে মালিকানার দাবিদার শাসক বা মানবগোষ্ঠী বা মানুষের মালিকানার দাবি অস্বীকার করবেন। কেননা এ সকল ব্যক্তিগণ আল্লাহ্‌র মালিকানা স্বীকার না করে, নিজেদেরকে জমিনের মালিক ঘোষণা দিয়ে খোদাদ্রোহীতে পরিণত হয়েছে। সুতরাং, তাদের ক্ষমতায় অংশীদার হওয়া, তাদেরকে সমর্থন দেয়া ও সহযোগিতা করা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনার দাবির পরিপন্থী। আল্লাহ্ বিচার দিবসেরও মালিক। জান্নাত, জাহান্নামেরও মালিক। যিনি আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছেন, তিনি বিচার দিবস ও জাহান্নামকে ভয় করবেন এবং জান্নাতের আকাঙ্খা করবেন এবং সে কারণে আল্লাহ্‌র আদেশ নিষেধ মেনে চলবেন।

রাজ্জাক : রাজ্জাক শব্দটির বাংলা অর্থ হলো, রিজিকদাতা। যিনি ঈমান গ্রহণ করেছেন, তিনি আল্লাহ্‌কে রিজিকদাতা হিসেবে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবেন। উক্ত ব্যক্তির চলনে ও বলনে তার এ বিশ্বাসের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হবে। আল্লাহ্ একা সামষ্টিক এবং ব্যক্তিগতভাবে আমাদের প্রত্যেককে রিজিক দিয়ে থাকেন। তিনি ব্যতীত মূলত: এমন কেউ নেই, যে মানুষ ও অপর কোনো প্রাণীকে একটি কনা খাদ্য দানে সক্ষম। মানুষ আল্লাহ্‌র দেয়া উপাদানসমূহকে কেবলমাত্র যথাস্থানে স্থাপন করে থাকে। কিন্তু খাদ্য উৎপাদনের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা মানুষের নেই। মাটির উৎপাদন শক্তি মাটির মধ্যে আল্লাহ্‌ই দিয়েছেন। মাটির উর্বরতার জন্য যে সার ব্যবহার করা হয়, তার উপাদানসমূহ তাঁরই সৃষ্টি। মাটিকে সিক্ত করার জন্য যে পানি ব্যবহার করা হয়, তাও কোনো মানুষ তৈরি করেনি। যে জলবায়ুর প্রভাব রয়েছে তাও মানুষের নিয়ন্ত্রণ বর্হিভূত। যে বীজ বপন করা হয়েছে, তাও তাঁর দেয়া উৎপাদন শক্তির বলে গাছ হতে বের হয়েছে। আবার তা পুনরায় অঙ্কুরোদগম হওয়ার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্‌ই দিয়েছেন। এভাবে একমাত্র আল্লাহ্‌র সৃষ্ট উপাদানসমূহের মধ্যে আল্লাহ্ কতিপয় গুণ সৃষ্টি করেছেন বলে এই সকল উপাদানের সমাবেশের কারণে খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়। সুতরাং, একমাত্র আল্লাহ্‌ই মানুষ, তথা সমগ্র সৃষ্টিকূলের রিজিকদাতা। আবার ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি মানুষের রিজিকদাতাও একমাত্র তিনি। তিনি কোনো একজন মানুষকে কাজ করার মতো দৈহিক, মানসিক শক্তি, দক্ষতা ও যোগ্যতা দান করেছেন বলে সে নিজেকে কোনো কাজে নিয়োগ করে তার জীবনোপকরণ সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। আর যারা নিজেরা অনুৎপাদনশীল থেকে অপর কোনো উৎপাদনশীল মানুষের উপর নির্ভরশীল তাদের রিজিকের ব্যবস্থাও আল্লাহ্‌ই করে থাকেন। কেননা আল্লাহ্‌ই সেই উৎপাদনশীল ব্যক্তিটিকে উৎপাদনশীল হওয়ার সামর্থ দান করেছেন এবং

তার মধ্যে দয়া ও দায়িত্ববোধ স্থাপন করেছেন। সুতরাং, প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিগত রিজিকদাতাও একমাত্র আল্লাহ্।

কোনো মানুষ যখন এ বিষয়ে ঈমান আনবেন যে, তার রিজিকের ব্যবস্থা করার সামর্থ পৃথিবীর কোনো শক্তির নেই; তিনি আল্লাহ্র আনুগত্যের ব্যাপারে এই অজুহাতে শিথীলতা প্রদর্শন করবেন না যে, তাঁর রিজিকের জন্য অপর কোনো মানুষের উপর তিনি নির্ভরশীল। তিনি রিজিকের জন্য ইসলাম বিপক্ষ কোনো শক্তির সহযোগী হতে পারবেন না। এমনকি এ বিশ্বাসও তাঁর মনে থাকবে না যে, আল্লাহ্র বিধান লঙ্ঘনকারী কোনো সরকার তার দেশের রিজিক বৃদ্ধিতে সামান্যতম অবদান রাখতে পারে বা কোনো ব্যক্তি তাঁর ব্যক্তিগত রিজিক বৃদ্ধি করতে পারে। নিজের রিজিকের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে পৃথিবীর সকলের হতে অমুখাপেক্ষী হয়ে একমাত্র আল্লাহ্র উপর নির্ভর করতে পারা আল্লাহ্র এ গুণের ব্যাপারে আস্থা পূর্ণতা লাভের লক্ষণ। এই অবস্থায় তিনি যখন দেখবেন, তাঁর কাছ থেকে অর্থের মাধ্যমে যে সেবা গ্রহণ করা হচ্ছে, তা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠার অন্তরায়– তিনি রিজিকের ভয় না করে, সেই সেবা প্রদান বন্ধ করে দেবেন। যখন দেখবেন যার মাধ্যমে তার অর্থ উপার্জন হচ্ছে, সেই ব্যক্তিটি আল্লাহ্র আনুগত্য করার ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করছে, তৎক্ষণাৎ তিনি নির্ভয়ে সেই ব্যক্তিটিকে পরিত্যাগ করবেন। মোটকথা, চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির স্বার্থে তিনি কখনো আল্লাহ্র আনুগত্যের ব্যাপারে আপোস করবেন না। আর যখন তিনি এ বিষয়ে আপোস করলেন, প্রতীয়মান হবে তার ঈমানের দুর্বলতা হলো আপোসের প্রেরণার মূল উৎস।

আ'লিম : মহান আল্লাহ্র আরও একটি গুণবাচক নাম হলো আ'লিম। আল্লাহ্র ক্ষেত্রে যার অর্থ দাঁড়ায় সর্বজ্ঞানী, সর্বজ্ঞাত, সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, অর্থাৎ তাঁর জ্ঞানের বাইরে কিছু নেই; এমনকি এই বিশ্ব জাহানের একটি ধুলিকনা, অনু-পরমানুও যার দৃষ্টি ও জ্ঞানের বাইরে নেই। কোনো মানুষ যখন আল্লাহ্র ব্যাপারে এরূপ বিশ্বাস স্থাপন করবে, তখন তাঁর মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ প্রতিফলিত হবে।

প্রথমত: তিনি মনে করবেন মানুষের কল্যাণ কিসে আছে, তা মানুষ অপেক্ষা আল্লাহ্ ভালো জানেন। মানুষ যেহেতু ভবিষ্যত সম্পর্কে আন্দাজ-অনুমান করা ছাড়া কিছু জানে না, সেহেতু মানুষের আন্দাজনির্ভর পরিকল্পনা ও দিকনির্দেশনা ভবিষ্যতের কল্যাণকে নিশ্চিত করতে সক্ষম নয়। অপরদিকে আল্লাহ্ যেহেতু তিন কালের সবকিছু সম্যক জ্ঞাত, সেহেতু ভবিষ্যত সম্পর্কিত আল্লাহ্র দিকনির্দেশনা সঠিক এবং কল্যাণকর। যে সকল বিষয়ে আল্লাহ্র দিকনির্দেশনা রয়েছে, সে সকল বিষয়ে নিজেদের সীমিত ও নগণ্যজ্ঞান নিয়ে পুনরায় নিয়ম-নীতি তৈরি করা

বোকামি, মূর্খতা ও অন্যায়। যখন এ ধরনের একটি বিশ্বাস মানুষের মনে বদ্ধমূল থাকবে, তখন সে মানুষ তাঁর প্রতিটি কার্যপন্থা স্থির করার জন্য নিজের জীবনকে কুরআন ও সুন্নাহর কাছে ন্যস্ত করবে। ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পরিচালনাসহ সকল ক্ষেত্রে নিজের কামনা বাসনা ও নফসের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে কুরআনের নির্দেশনার বিপরীতে অপরিপক্ক ও সীমাবদ্ধ মনে করবে, তা পরিত্যাগ করবে এবং একমাত্র আল্লাহ্‌র আইন তথা কুরআন ও সুন্নাহকে যথার্থ মনে করে কর্মপন্থা হিসেবে গ্রহণ করে নেবে। এর ব্যতিক্রম করা আল্লাহ্‌র জ্ঞানের উপর নিজের বা যাদের আইন গ্রহণ করা হয়েছে, তাদেরকে স্থান দেয়ার লক্ষণ হিসেবে পরিগণিত হবে। সুতরাং, আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনার বিষয়ে উক্ত ব্যক্তির দাবি সঠিক হতে পারে না।

দ্বিতীয়ত: ঐ বিশ্বাসী ব্যক্তিটি বিশ্বাস করবেন, আল্লাহ্‌ তাঁর সকল কার্যবিধি সম্পর্কেও পরিজ্ঞাত। ফলে বাস্তব ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার ব্যতিক্রম কোনো কিছু করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। কোনো ব্যক্তি আল্লাহ্‌ নিষিদ্ধ কাজ করার অর্থ হলো আল্লাহকে আলিম হিসেবে বিশ্বাস না করার লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া।

হাকামু : মহান আল্লাহ্‌র এ নামটির অর্থ হলো বিচারক, ফয়সালাকারী। আল্লাহ্‌র ক্ষেত্রে এ শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক ও তাৎপর্যপূর্ণ। আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনার সাথে সাথে মানুষ একমাত্র আল্লাহ্‌কে সকল বিষয়ে ফায়সালাকারী হিসাবে বিশ্বাস করবে এবং বাস্তবে তাকে বিচারক হিসেবে গ্রহণ করে নেবে। আল্লাহ্‌ দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে আমাদের বিচারক। আখিরাতে আল্লাহ্‌কে বিচারক হিসেবে গ্রহণ না করার কোনো সুযোগ ও ক্ষমতা কোনো মানুষ তথা কোনো সৃষ্টির থাকবে না। আখিরাতে আল্লাহ্‌র বিচারক ও ফয়সালাকারী হওয়ার বিষয়ে আলোচনার পূর্বে এ পৃথিবীতে তাঁকে বিচারক হিসেবে বিশ্বাস ও গ্রহণ করার অর্থ আলোচনা করা আবশ্যক। বিচারক বলতে আমরা এমন একজনকে বুঝে থাকি, যিনি কোনো একটি বিষয়ের যথাযথ প্রতিকার নিরুপণ করেন। সাধারণত: অপরাধীদের বিরুদ্ধে গঠনকৃত অভিযোগের ভিত্তিতে বিচারকার্য সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। মানুষের বিচার এ পৃথিবীতে মানুষ করে থাকে। তাহলে আল্লাহ্‌কে এ পৃথিবীতে বিচারক হিসেবে গ্রহণ করে নেয়ার অর্থ কী? কোনো একটি বিচারে বিচারক তার বিবেচনায় যা সঠিক ও ন্যায়ানুগ প্রতিকার, তা-ই গ্রহণ করেন এবং রায় প্রদান করেন। আল্লাহ্‌কে বিচারক হিসেবে গ্রহণ করে নেয়ার অর্থ হলো, কোনো বিষয়ে মহান আল্লাহ্‌র রায়কে প্রতিকার হিসেবে গ্রহণ করে নেয়া। আর আল্লাহ্‌ কর্তৃক নির্ধারিত প্রতিকার আল্লাহ্‌র খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে যারা বিচার ফায়সালা করেন, তাদের বিচারে প্রতিফলিত হয়। আল্লাহ্‌র খলিফা হিসেবে যারা দুনিয়াতে বিচার ফায়সালা করেন,

তাঁরা নিজেদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা আবেগ-অনুরাগ দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে এবং দুনিয়ার কোনো মানুষের নিয়ম-নীতির পরোয়া না করে, কেবলমাত্র আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত ও মনোনীত ইসলামী বিধি-বিধানকে আইনের উৎস হিসেবে গ্রহণ করে নেয়। কেননা এ পৃথিবীতে আল্লাহ্র খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে বিচার করার জন্য আল্লাহ্র বিধান, তথা ইসলামী শরীয়া ছাড়া বিচার করার কোনো সুযোগ নেই। আল্লাহ্ পবিত্র কালামে হাকীমে বলেছেন,

وَ مَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ۴۴

'আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী যারা ফায়সালা করে না, তারাই কাফের;' -মায়েদা-৪৪

وَ مَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۴۵

'আর যারা আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই জালিম'। - মায়েদা; ৪৫

وَ مَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۴۷

'আর যারা আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই ফাসিক,' - মায়েদা; ৪৭

সুতরাং, আল্লাহ্কে বিচারক হিসেবে গ্রহণ করার অর্থ হলো, মহান আল্লাহ্র খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে যারা একমাত্র আল্লাহ্র আইন দ্বারা বিচার ফায়সালা করবে, তাদের বিচার শুধু গ্রহণ করা এবং একমাত্র তাঁর বিচারকে ন্যায় বিচার হিসেবে বিশ্বাস করা। শুধু তাই নয়, আল্লাহ্র খলিফা ব্যতীত অপর কোনো বিচারকের বিচারের বিষয়ে অনাস্থা প্রকাশ ও তার পরিবর্তনের মাধ্যমে আল্লাহ্র বিচারের প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা করতে হবে। যে ব্যক্তি ঈমানের দাবিদার হবেন, তিনি তাঁর অন্তরে এ বিশ্বাস লালন করবেন এবং বাস্তবজীবনেও তার প্রতিফলন ঘটাবেন। যারা এ জীবনে আল্লাহ্র দেয়া বিধানের পরিবর্তে নিজের বা অপর কোনো মানুষের আইন দ্বারা বিচার ফায়সালা করবে এবং যারা তাদের বিচার ফায়সালাকে শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করে নেবে, তারা মূলত: আল্লাহ্কে বিচারক হিসেবে বিশ্বাস করে না। তাদের ঈমানের দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না।

এখন আখিরাতে আল্লাহ্র বিচারক হওয়ার বিষয়টি আলোচনা করা যাক। আখিরাতে আল্লাহ্ স্বয়ং বিচারক হিসেবে বিচারকার্য সম্পাদন করবেন। মানুষ আল্লাহ্কে এ পৃথিবীতে বিচারক হিসেবে গ্রহণ করে মুসলমান হতে পারে,

পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌কে বিচারক হিসেবে গ্রহণ না করে কাফির, ফাসিক ও জালিম হিসেবে জীবন অতিবাহিত করতে পারে। কিন্তু পরপারে আল্লাহ্‌কে বিচারক হিসেবে গ্রহণ করা বা না করার ইখতিয়ার এবং তাঁর বিচারের আওতার বাইরে অবস্থান করার ক্ষমতা কারো থাকবে না। আল্লাহ্ পরপারের বিচার দিনের বিচারক হওয়ার বিষয়টি মানুষ এ দুনিয়ায় অবিশ্বাস করতে পারে, কিন্তু পরকালে আল্লাহ্‌ই বিচার করবেন। আল্লাহ্‌র বিচার হবে সেদিন পক্ষপাতমুক্ত এবং পরিপূর্ণ ন্যায়ভিত্তিক। সেদিন অপরাধী তার অপরাধের জন্য শাস্তি পাবে এবং অনুগত বান্দাহরা পুরস্কৃত হবেন। উল্লেখ্য, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান ও ক্ষমাশীল। তাঁর ক্ষমা মানুষ তার কৃত অপরাধের জন্য তওবা করার মাধ্যমে অর্জন করতে পারে। সেক্ষেত্রে সে আর উক্ত অপরাধের জন্য অপরাধী থাকবে না। কিন্তু সে যেই অপরাধ মাথায় নিয়ে মহান আল্লাহ্‌র বিচারালয়ে উপস্থিত হবে, তার জন্য তাকে দোষী সাব্যস্ত হতে হবে। আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে সাজা মওকুফ করলে তা আলাদা কথা। মানুষ পৃথিবীতে কোনো অপরাধ করে সাক্ষ্য-প্রমাণ ও তথ্যাদীর অভাবে নিষ্কৃতি পেলেও আল্লাহ্‌র চূড়ান্ত বিচারের দিন কোনো তথ্য গোপন থাকার ও প্রমাণের অভাব থাকার কোনো সম্ভাবনা ও নিস্কৃতি পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। সেদিন যারা আল্লাহ্‌র বিচারে পুরস্কৃত হবেন, তারা লাভ করবেন অফুরন্ত নিয়ামত সম্বলিত জান্নাত। আর যারা আল্লাহ্‌র বিচারে দোষী সাব্যস্ত হবে, তাদেরকে দুনিয়ার সাজার মতো জেল-জরিমানার ন্যায় লঘু শাস্তি দিয়ে ছেড়ে দেয়া হবে না। তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামে, যেখানে থাকবে অচিন্তনীয় উত্তাপময় আগুন, বিষধর সর্প, জাক্কুম নামের কন্টকপূর্ণ খাদ্য ও পুঁজ, পচা রক্তের পানীয়। অতএব আল্লাহ্‌কে বিচারক হিসেবে বিশ্বাসী প্রতিটি ব্যক্তি অপরাধ শুরুর পূর্বে পরকালের বিচার দিবস এবং সেদিনের পরিণামের বিষয়টি বিশ্বাস করবে। ফলে এ পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র হুকুম লঙ্ঘন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। যদিও কোনো কারণে কোনো ভুল হয়ে যায়, তিনি তৎক্ষণাৎ ক্ষমা লাভের প্রত্যাশায় আল্লাহ্‌র কাছে তওবা করবেন। তার পক্ষে প্রতিনিয়ত আল্লাহ্‌র আইন লঙ্ঘন, আল্লাহ্‌র আইন ব্যতীত অপর কোনো আইন প্রণয়ন এবং এ সকল মানব আইনের রক্ষণাবেক্ষণ ও শ্রদ্ধা নিবেদন করে এ সবের আনুগত্য করে আল্লাহ্‌র অবাধ্যতায় লিপ্ত থাকা কোনো অবস্থায় সম্ভব নয়। যদি কেউ এরূপ আচরণ করে, তাহলে এ আচরণ বলে দেয় সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌কে চূড়ান্ত বিচারক হিসাবে বিশ্বাস করছেন না। সুতরাং, আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাসের ব্যাপারে তার মৌখিক ঘোষণা কীভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে?

আ'দল : আ'দল শব্দের অর্থ, ন্যায়বিচার। আল্লাহ্ নিজেকে হাকীম বা বিচারক বলার সাথে সাথে আ'দল বা ন্যায়বিচারক বলে ঘোষণা দিয়েছেন। তাঁর বিচারের মধ্যে সামান্যতম জুলুমের স্থান নেই। যারা আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে তাঁরা তাঁর বিচারের বিষয়ে কোনোরূপ সন্দেহ সংশয় রাখবে না। ফলে তিনি পৃথিবীতে আল্লাহ্র বিচারের পরিবর্তে অপর কোনো আইন বা আদালতের অধীনে বিচার পাওয়ার প্রয়োজন বোধ করবেন না। যদি কেউ আল্লাহ্র আইনের বাইরে অপর কোনো আইন বা আদালতের অধীনে বিচার আশা করে, তবে বুঝতে হবে তার মনে আল্লাহ্র বিচারে সুবিচার পাওয়ার বিষয়ে সংশয় রয়েছে। ফলে সে প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে না। একইভাবে একজন ঈমানদার লোকের মনে এ বিশ্বাসও বদ্ধমূল থাকবে যে, আখিরাতেও তার উপর কোনো জুলুম করা হবে না। একইভাবে অন্য কারো উপরও জুলুম করা হবে না। ফলে পৃথিবীতে কোনো বান্দাহর উপর জুলুমকারী ব্যক্তির পক্ষে রক্ষা পাওয়ার সুযোগ নেই। সুতরাং, বাস্তবজীবনে সে জুলুমকারী বা জালিম হতে পারে না।

আহাদঃ আল্লাহ্র এ নামটি আল্লাহ্র একত্ববাদের ঘোষণা দেয়। আল্লাহ্র এ নামটি ঘোষণা দেয়, তিনি এক বা অদ্বিতীয়। তিনি ব্যতীত অপর কোনো উপাস্য নেই। তাঁর সৃষ্টিকর্মের সাথে অপর কোনো অংশীদার নেই। তাঁর গুণও অপর কোনো ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান নেই। তাঁর অস্তিত্ব ও তাঁর বৈশিষ্ট্যের নমুনা বা সাদৃশ্য কেবল তাঁর মধ্যে বিদ্যমান। সুতরাং, যারা আল্লাহ্র উপর ঈমান আনবে, তারা পৃথিবীর কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠীকে এমন কোনো মর্যাদা বা স্বীকৃতি দেবে না, যা কেবলমাত্র আল্লাহ্র প্রাপ্য।

সামাদ : আল্লাহ্র এ নামটি দ্বারা আল্লাহ্র পরমুখাপেক্ষীহীনতা বুঝায়। যারা আল্লাহ্র উপর বিশ্বাসী তাঁরা বিশ্বাস করেন, আল্লাহ্ স্বয়ংসম্পূর্ণ বা পরমুখাপেক্ষীহীন। সুতরাং, কেউ তাঁর আনুগত্য করলো কী করলো না, তাকে রব্ব হিসেবে গ্রহণ করলো কি করলো না, তাঁর প্রতি ঈমান আনল কি আনল না, তারা দ্বীন কায়েম করলো কি করলো না, তাঁর ইবাদত করলো কি করলো না তাতে আল্লাহ্র কিছু আসে যায় না। বরং সকল মানুষ ও সকল জীব একমাত্র আল্লাহ্র উপর সবকিছুর জন্য মুখাপেক্ষী। সুতরাং, যারা আল্লাহ্র এ গুণরাজিতে বিশ্বাসী, তারা নিঃশর্তভাবে সর্বাবস্থায় একমাত্র তাঁর ইবাদত ও আনুগত্য করবে।

সামি'উ এবং **বাসির :** আল্লাহ্র এ দুটি নামের প্রথমটির অর্থ সর্বশ্রোতা এবং দ্বিতীয়টির অর্থ সর্বদ্রষ্টা বা সুক্ষ্মদর্শী, সবজান্তা ইত্যাদি। আল্লাহ্র এ দুটি নাম দ্বারা প্রকাশ পায় আল্লাহ্ জগতের সকল স্থানের ক্ষুদ্র-বৃহৎ, প্রকাশ্য এবং গোপনীয়

সবকিছু শোনেন এবং দেখেন। তাঁর দৃষ্টির অন্তরালে কোনোকিছু সংগঠিত হওয়া সম্ভব নয়। যারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছেন, তাঁরা আল্লাহ্‌র এ গুণের ব্যাপারেও আস্থাশীল। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ্‌ তাদের গোপন ও প্রকাশ্য সকল কথা শোনেন এবং সকল কাজ দেখেন। আর তাঁরা আল্লাহ্‌র শক্তি ও কঠোরতা সম্পর্কেও অবগত আছেন। স্বাভাবিক কারণে আল্লাহ্‌র সামনে তাদের দ্বারা আল্লাহ্‌ নিষিদ্ধ কোনো কাজ সংঘটিত হওয়া সম্ভব নয়। যদি তারা আল্লাহ্‌ নিষিদ্ধ কোনো কাজে জড়িত থাকেন, প্রতীয়মান হবে আল্লাহ্‌র সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা হওয়ার ব্যাপারে তাদের মনে সংশয় রয়েছে, তাদের ঈমানের দাবি কেবল মৌখিক ও আনুষ্ঠানিকতাপূর্ণ। বাস্তবত: তারা যথাযথ ঈমানদার নয়।

ক্কাহ্‌হার, মুনতাকিম, দার : এখানে আল্লাহ্‌র তিনটি নাম উল্লেখিত হয়েছে, যার প্রথমটির অর্থ হলো প্রভাবশালী, শক্তিশালী, দমনকারী ইত্যাদি। আর দ্বিতীয়টির অর্থ হলো প্রতিশোধ গ্রহণকারী এবং তৃতীয়টির অর্থ হলো অত্যন্ত ক্লেশদাতা, আযাবদাতা। এখানে আল্লাহ্‌র এ তিনটি বৈশিষ্ট্য দ্বারা বুঝা যায় আল্লাহ্‌ খোদাদ্রোহীদের বিষয়ে প্রতিশোধ গ্রহণকারী এবং তিনি প্রতিশোধ গ্রহণে নিশ্চিত সক্ষম ও শক্তিমান। সুতরাং, যারা আল্লাহ্‌র অবাধ্যতায় লিপ্ত, আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। আর তিনি তাদেরকে অত্যন্ত ক্লেশ বা আযাব দেবেন। এ আযাব পৃথিবীর কোনো আযাবের সাথে তুলনাযোগ্য নয়। কেননা দুনিয়ার আযাব সর্বোচ্চ মৃত্যু পর্যন্ত। তারপর দুনিয়ার আর কোনো শাস্তি তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। অপরদিকে পরকালের আযাব অনন্ত, অসীম এবং তার কঠোরতাও অকল্পনীয়। আল্লাহ্‌ পরকালের শাস্তির নমুনা কুরআনুল কারীমের বহু স্থানে তুলে ধরেছেন। যেমন;

اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ ۴۳ طَعَامُ الْاَثِيْمِ ۴۴ كَالْمُهْلِ ۚ يَغْلِيْ فِي الْبُطُوْنِ ۴۵ كَغَلْيِ الْحَمِيْمِ ۴۶ خُذُوْهُ فَاعْتِلُوْهُ اِلٰى سَوَآءِ الْجَحِيْمِ ۴۷ ثُمَّ صُبُّوْا فَوْقَ رَاْسِهٖ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ ۴۸ ذُقْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ ۴۹ اِنَّ هٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهٖ تَمْتَرُوْنَ ۵۰

'যাক্কুম গাছ হবে পাপীর খাদ্য। গলিত তামার মতো, তা তার পেটে পুড়তে থাকবে, উত্তপ্ত পানি যেমন– ফুটতে থাকে। বলা হবে, ওকে ধরো ও টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যে, তারপর ওর মাথায় ফুটন্ত পানি ঢেলে দিয়ে শাস্তি দাও।'

-সূরা দুখান: ৪৩-৫০

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَ الْمُنٰفِقٰتِ وَ الْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ هِيَ حَسْبُهُمْ ۚ وَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ۶۸

'আল্লাহ্ মুনাফিক নর-নারী ও অবিশ্বাসীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জাহান্নামের আগুণের, যেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এই তাদের হিসাব, তাদের উপর রয়েছে আল্লাহ্র অভিশাপ আর তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শাস্তি।'

-সূরা তওবা: আয়াত ৬৮

যারা আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস রাখেন, তাঁরা বিশ্বাস করেন আল্লাহ্ পরম পরাক্রমশালী ও এমন ক্ষমতাধর, তাঁর পক্ষে সবকিছু সম্ভব ও অতি সহজ, আল্লাহ্ যেমন দয়াবান ও মেহেরবান, তেমন প্রতিশোধ গ্রহণকারীও। তিনি কঠোর শাস্তিদাতা। অতএব যারা জুলুমকারী, যারা নিজের উপর, অপর বান্দাহর উপর জুলুম করে এবং আল্লাহ্র আইন লঙ্ঘন করে, আল্লাহ্র সাথে অপরকে অংশীদার করে ও আল্লাহ্র আইন পরিত্যাগ করে নিজেরা আইন রচনা করে, বাস্তবত: তারা আল্লাহ্র আইনকে অযোগ্য গণ্য করে আর নিজেদেরকে তথা মানুষের আইনকে শ্রেষ্ঠ গণ্য করে। এরূপ আচরণের কারণে তারা আল্লাহ্র ব্যাপারে জুলুমে লিপ্ত। তারা এবং তাদের সমর্থনকারী ও সহযোগীরা আল্লাহ্র শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হবে। এ অবস্থায় কোনো ঈমান গ্রহণকারী ব্যক্তি মানুষের শাস্তির ভয়ে বা দেশের তাগুত সরকারের ভয়ে তাদের আনুগত্য করে আল্লাহ্র আযাব গ্রহণ করে নেবে না। সে তাগুত শাসকের শাসন নির্ভয়ে অস্বীকার করবে। অতএব যারা এ পৃথিবীতে ক্ষমতা লাভের জন্য আল্লাহ্র আইনের পরিবর্তে মানুষের আইন প্রতিষ্ঠা, প্রণয়নও সংরক্ষণের জন্য রাজনীতি করে, তারা মূলত: আল্লাহ্র শাস্তির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করার মতো ধৃষ্টতা দেখায়। তারা প্রকৃত ঈমানদার নয়।

উপরে আমাদের আলোচনার সাথে আল্লাহ্র সংশ্লিষ্ট নামসমূহ কেবল আলোচনা করা হলো। এ সকল নামসমূহ ছাড়াও আল্লাহ্র আরো গুণবাচক নাম রয়েছে। আল্লাহ্র নিরানব্বইটি গুণবাচক নামের মাধ্যমে আল্লাহ্র পরিচয় তিনি আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। যারা আল্লাহ্র উপর ঈমান আনবেন, তারা আল্লাহ্কে তাঁর দেয়া পরিচয় অনুসারে নিজের রব্ব, প্রভু হিসেবে গ্রহণ করে নেবেন এবং বাস্তব আচার-আচরণের মাধ্যমে নিজের বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটাবেন। উপরোক্ত আলোচনার সারকথা হলো;

আল্লাহ্ আমাদের একক সৃষ্টিকর্তা, তিনি আমাদের জীবন ও সম্পদের নিরঙ্কুশ মালিক। এ জীবন ও সম্পদ একমাত্র তাঁর বিধানমতে পরিচালিত হতে হবে; তিনি আমাদের প্রতিপালক, পর্যবেক্ষক ও সংরক্ষণকারী, তিনি অতিশয় দয়াবান আমাদের রিজিকদাতা, তিনি ব্যতীত আমাদের রিজিকদানের সাধ্য কারো নেই। মহান আল্লাহ্ই এমন জ্ঞানী, যার জ্ঞানের বাইরে কিছু নেই, একমাত্র তিনি জানেন কিসে মানুষের কল্যাণ রয়েছে এবং কিসে মানুষের অকল্যাণ রয়েছে। তিনি

সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায় বিচারক, তাঁর আইন-শাসন সর্বাধিক ন্যায়ানুগ। তিনি একমাত্র আইনদাতা। তাঁর আইনের বাইরে কোনো আইন রচনা করা, প্রয়োগ করা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা ও সমর্থন করার অধিকার কারো নেই। তিনি একক, অমুখাপেক্ষী, অতীতেও ছিলেন এবং ভবিষ্যতেও বিদ্যমান থাকবেন। তাঁর প্রতিশ্রুতি সত্য, তিনি তাঁর অনুগত বান্দাহদেরকে পুরস্কৃত করবেন এবং সীমা লঙ্ঘনকারীদেরকে শাস্তি দেবেন। তিনি সবকিছু দেখেন এবং শোনেন। অতএব মানুষকে তার সকল কৃতকর্মের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহি করতে হবে এবং তাঁর বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। উক্ত বিচার হবে শাস্তি বা পুরস্কৃত হওয়ার ভিত্তি।

ইসলামহীন প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সম্পদের উপর আল্লাহ্‌র মালিকানা স্বীকার করা হয় না। বিচার ব্যবস্থায় গৃহীত আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয় না। রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও আল্লাহ্‌র বিধান উপেক্ষিত থাকে। রাষ্ট্র পরিচালনায় শাসক নিয়োগ, বিচারক, প্রশাসক ও রাষ্ট্রের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে লোক নিয়োগ দেয়ার জন্য নিযুক্ত ব্যক্তির যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্য নির্ধারনের ক্ষেত্রে বস্তুবাদী চিন্তাকে প্রাধান্য দেয়া হয়, তাকওয়া বা আল্লাহ্‌ভীতির বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া হয় না। আল্লাহ্‌র গুণবাচক নামগুলো থেকে আমরা যা বুঝতে পারি, আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনার দাবি আর প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থায় আস্থা রাখা, একসাথে চলতে পারে না।

বিশ্বাস অন্তরের বিষয়, যা কেবলমাত্র উক্ত ব্যক্তি এবং আল্লাহ্‌ অবগত থাকেন। তবে বাস্তব কাজে উক্ত বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটে। যেমন; বিষপানে মৃত্যু হয়– এ বিষয়টি বিশ্বাস করি বলে আমরা বিষপান করি না। তেমনি আমাদের কাজ দ্বারা আমরা বুঝতে পারি আমাদের বিশ্বাস কী? আর তাই যারা আল্লাহ্‌র বিষয়ে উপরোক্ত বিশ্বাস স্থাপন করবে, তাদের দ্বারা কতোগুলো কাজ সংঘটিত হবে এবং কতোগুলো কাজ সংঘটিত হবে না। আল্লাহ্‌কে সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, মেহেরবান আবার প্রতিশোধ গ্রহণকারী ও কঠোর শাস্তিদাতা, চিরঞ্জীব ও ক্ষমতাধর হিসেবে বিশ্বাস করার কারণে আল্লাহ্‌র বেহেশত পাওয়ার প্রত্যাশায় ও জাহান্নামের ভয়ে নিজে কোনো পাপকার্যে লিপ্ত হবেন না এবং সর্বদা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য তাঁর মনোনীত ইসলামের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণ করবেন। অপরদিকে যাদের বাস্তব কার্যাদীর মধ্যে এ সকল বিষয় পরিলক্ষিত হবে না, তারা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনার মৌখিক ঘোষণা দেয়া সত্ত্বেও তারা পূর্ণ ঈমানদার নয়, বরং তারা কপট ও মুনাফিক, অন্তত: ঈমান ত্রুটিপূর্ণ।

পরকালের উপর ঈমান

একজন মানুষকে আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনার সাথে সাথে পরকালের উপর ঈমান আনতে হবে। পরকাল হলো মানুষের জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য। পরকালের উপর বিশ্বাসের ভিত্তিতে মুসলমানদের জীবনধারা আবর্তিত। পরকালের জীবন অনন্ত, সীমাহীন জীবন। আল্লাহ্ পরকালের প্রতি বিশ্বাসের অপরিহার্যতা সম্পর্কে বলেন–

وَّ اَنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ ١٠

'এবং যারা পরকালকে বিশ্বাস করবে না, তাদের জন্য রয়েছে পরকালের ভয়াবহ শাস্তি।' –সূরা বনী ইসরাঈল: ১০

আল্লাহ্ কালামে হাকীমে মানুষকে পরকালের সাথে বহু আয়াতের মাধ্যমে পরিচিত করে তুলেছেন। যেমন;

اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّ لَهْوٌ وَّ زِيْنَةٌ وَّ تَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَ تَكَاثُرٌ فِي الْاَمْوَالِ وَ الْاَوْلَادِ ؕ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا ؕ وَ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۙ وَّ مَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانٌ ؕ وَ مَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ٢٠

'তোমরা জেনে রাখো, পার্থিব জীবনতো ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক শ্লাঘা ও ধনে জনে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কিছু নয়। তার উপমা বৃষ্টি, যা দিয়ে উৎপন্ন শস্যসম্ভার অবিশ্বাসীদের চমৎকৃত করে, অত:পর তা শুকিয়ে যায়। ফলে তুমি তা পীতবর্ণ দেখতে পাও। অবশেষে তা খড়-কুটায় পরিণত হয়। পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ছাড়া কিছু নয়।'-সূরা হাদীদ: আয়াত ২০

অপর আয়াতে বলা হয়েছে:

وَ نُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ؕ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ ٦٨ وَ اَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا وَ وُضِعَ الْكِتٰبُ وَ جِايْٓءَ بِالنَّبِيّٖنَ وَ الشُّهَدَآءِ وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ٦٩ وَ وُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ۝ ٧٠ وَ سِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْهَا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَ قَالَ

لَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ رَبِّكُمْ وَ يُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا١ؕ قَالُوْا بَلٰى وَ لٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ٧١ قِيْلَ ادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا١ۚ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ٧٢ وَ سِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا١ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْهَا وَ فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَ قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ٧٣ وَ قَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ صَدَقَنَا وَعْدَهٗ وَ اَوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَبَوَّاُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ١ۚ فَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ٧٤

‘শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, ফলে আসমান ও যমীনে যারা আছে, সবাই বেহুশ হয়ে যাবে, তবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন। অত:পর আবার শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, তৎক্ষণাৎ তারা দন্ডায়মান হয়ে দেখতে থাকবে। পৃথিবী তার পালনকর্তার নূরে উদ্ভাসিত হবে, আমলনামা স্থাপন করা হবে, পয়গম্বরগণ ও সাক্ষীগণকে আনা হবে এবং সকলের মধ্যে ন্যায় বিচার করা হবে, তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। প্রত্যেকে যা করেছে, তার পূর্ণ প্রতিফল দেয়া হবে। তারা যা কিছু করে, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ সম্যক অবগত। কাফিরদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাঁকিয়ে নেয়া হবে। তারা যখন সেখানে পৌঁছবে, তখন তার দরজাসমূহ খুলে দেয়া হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে পয়গম্বর আসেনি, যারা তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করতো এবং সতর্ক করতো এ দিনের সাক্ষাতের ব্যাপারে? তারা বলবে, হ্যাঁ, কিন্তু কাফেরদের প্রতি শাস্তির হুকুম বাস্তবায়িত হয়েছে। বলা হবে, তোমরা জাহান্নামের দরজা দিয়ে প্রবেশ করো, সেখানে চিরকাল অবস্থানের জন্য। কতো নিকৃষ্ট অহংকারীদের আবাসস্থল। যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করতো তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা উন্মুক্ত দরজা দিয়ে জান্নাতে পৌঁছাবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের প্রতি সালাম। তোমরা সুখে থাকো। অতঃপর সদাসর্বদা বসবাসের জন্যে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করো। তাঁরা বলবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি আমাদের প্রতি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে এ ভূমির উত্তরাধিকারী করেছেন। আমরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা বসবাস করবো। আমলকারীদের পুরস্কার কতো না চমৎকার।’ –সূরা যুমার: আয়াত ৬৮-৭৪

কুরআনুল কারীমের উপরোক্ত আয়াতসমূহ হতে আখিরাতের যে চিত্র পাওয়া যায় তা হলো, আল্লাহ্‌র নির্ধারিত কোনো একটি বিশেষ সময়ে আল্লাহ্‌র আদেশে শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে। যার ফলে এ পৃথিবীর সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। অত:পর পুনরায় আল্লাহ্‌র নির্দেশে আরো একটি ফুঁক দেয়া হলে সকল মানুষ পুনরুজ্জীবিত হবে এবং সমবেত হবে। তখন আল্লাহ্‌ তাদের কৃতকর্মের বিচার করবেন এবং বিচারের সময় সকল সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত করে পূর্ণ ন্যায় বিচার করা হবে। পৃথিবীতে যারা শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছে, অর্থাৎ, যারা ঈমান আনেনি অথবা ঈমান আনার ঘোষণা দেয়া সত্ত্বেও মুনাফেকী করেছে, তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, যেখানে তারা চিরদিন থেকে সীমাহীন দূর্ভোগ আস্বাদন করবে এবং যারা ঈমানদার এ দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র হুকুম-আহকাম যথাযথভাবে পালন করেছে, শিরক থেকে, খোদাদ্রোহিতা থেকে বিরত ছিল, তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সেখানে তাঁরা চিরদিন থাকবে এবং আল্লাহ্‌র সীমাহীন নিয়ামত ভোগ করবে এবং মহাসম্মানিত হবে।

সুতরাং, যারা ঈমান এনেছে, তাঁরা পরকালের বিষয়ে আল্লাহ্‌ তাঁর বান্দাহদেরকে যা কিছু অবগত করেছেন, তার সবকিছু দৃঢ় প্রত্যয়ে বিশ্বাস করবেন। তাঁরা জাহান্নামের ভয়ে ভীত থাকবেন, ফলে ইসলামী বিধি-বিধান লঙ্ঘনের মাধ্যমে অপরাধ করবেন না এবং মহান আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুত নিয়ামত জান্নাতের প্রত্যাশায় আল্লাহ্‌র ইবাদতে সর্বদা নিযুক্ত থাকবেন। সর্বদা সতর্ক থাকবেন, যাতে নিজেদের অসতর্কতার কারণে কোনো ভুল-ত্রুটি না হয়ে যায় এবং মানুষের সহজাত প্রকৃতি হিসেবে কোনো ভুল-ত্রুটি হয়ে গেলেও আল্লাহ্‌র ক্ষমাশীলতার উপর বিশ্বাস করে তাঁর নিকট তওবা করবেন। পক্ষান্তরে যারা ঈমান আনার ঘোষণা দেয়া সত্ত্বেও স্বেচ্ছায় আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান অমান্য করছে এবং প্রকাশ্যভাবে আল্লাহ্‌র বিধি-বিধানের পরিবর্তে মানুষের বিধান অনুসরণ করছে ও নিজেরা আইন প্রণয়ন করছে, তারা প্রকারান্তরে পরকালকে অস্বীকার করে। যেমন- আল্লাহ্‌ কুরআনুল কারীমে ঘোষণা করেছেন–

اَرَءَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ۝١ فَذٰلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ۝٢ وَ لَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ۝٣

‘আপনি কি দেখেছেন তাকে, যে বিচার দিবসকে মিথ্যা বলে (অস্বীকার করে)? সে সেই ব্যক্তি, যে ইয়াতিমকে গলা ধাক্কা দেয় এবং মিসকিনকে অন্ন দিতে উৎসাহিত করে না।’ -সূরা মাউন: আয়াত ১-৩

উপরোক্ত আয়াত হতে প্রতীয়মান হয়, যারা পরকালকে অস্বীকার করে বা মিথ্যা মনে করে, কেবল তারা আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান স্বেচ্ছায় লঙ্ঘন করতে পারে। কেননা যদি কেউ আল্লাহ্‌কে ও পরকালকে বিশ্বাস করে, তবে ইয়াতিমকে গলাধাক্কা দেয়ার মতো স্পর্ধা তার হতে পারে না। সে এ গলাধাক্কা দেয়ার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহীতার বিষয়টি বিশ্বাস করলে তার পক্ষে এরূপ গলাধাক্কা দেয়া সম্ভব হবে না। আল্লাহ্‌র আয়াত অনুসারে প্রমাণিত হয়, যারা আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির কারণ ঘটতে পারে, প্রতিনিয়ত এরূপ কাজ করে বা আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করে, তারা ঈমান আনার ঘোষণা দিলেও মূলত পরকালের উপর তারা ঈমান আনেনি। বিষয়টি একটি উদাহরণের মাধ্যমে পরিষ্কার হয়ে যায়।

'কেউ তার এমন একটি ঘর বা হলরুম পাহারা দেয়ার জন্য ও রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য একজন পাহারাদার নিয়োগ করলো, যেখানে উন্নত ও লোভনীয় খাদ্য-সামগ্রি, স্বর্ণ, হিরক ও সহজে বহনযোগ্য বহু মূল্যবান সম্পদ রয়েছে। দারোয়ানকে এ শর্তে নিয়োগ দেয়া হয়েছে যে, তাকে একটি নির্দিষ্ট সময় বা একমাস পর্যন্ত এ রুমটি পাহারা দিতে হবে। এ সময়ে তাকে প্রত্যহ মাত্র দুবার খাদ্য ও পানীয় দেয়া হবে। সে উক্ত রুমে রক্ষিত কোনো খাদ্য ও সম্পদ স্পর্শ করতে পারবে না। যদি চুক্তি লঙ্ঘন করে বিক্ষিপ্তভাবে রাখা এ সকল দ্রব্যের কোনোটি ভোগ করে বা আত্মসাৎ করার চেষ্টা করে, তবে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে। অপরদিকে সে যদি সফলতার সাথে তার পাহারাকার্য উক্ত নির্দিষ্ট মেয়াদে পূর্ণ করতে পারে, তবে তাকে উক্ত খাদ্যসামগ্রি ও সম্পদের অর্ধেক দিয়ে দেয়া হবে। আর তাকে আরও জানিয়ে দেয়া হলো তার গতিবিধি রেকর্ড করে রাখার জন্য একটি স্বয়ংক্রীয় ক্যামেরা সেখানে স্থাপন করা আছে, যা সে কোনোভাবেই ফাঁকি দিতে সক্ষম নয়।'

বর্ণিত অবস্থায় উক্ত দারোয়ানের ভূমিকা কী হবে, তা তার বিশ্বাসের উপর নির্ভর করবে। সে যদি বিশ্বাস করে, প্রকৃতপক্ষে তার প্রতিটি মুহূর্তের অবস্থা রেকর্ড হচ্ছে এবং তার নিয়োগকর্তা তা সরাসরি ক্যামেরার সাহায্যে দেখছেন এবং যে কোনো কিছু স্পর্শ না করলে তাকে মেয়াদান্তে অর্ধেক সম্পদ দিয়ে দেয়া হবে, তবে সে শত খাদ্য কষ্টে থাকা সত্ত্বেও কোনো কিছু স্পর্শ করবে না। কিন্তু সে যদি মনে করে, নিয়োগকর্তার দেয়া তথ্য মোটেও সঠিক নয়, ক্যামেরা নামের কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই, মেয়াদান্তে তাকে কিছু দেয়া হবে না এবং নিয়োগকর্তা কিছু আঁচ করতে পারবে না, কেবলমাত্র তাকে দিয়ে ঠিকঠাক মতো পাহারা দেয়ানোর জন্য মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তবে সে অর্ধভুক্ত না থেকে খাদ্য কিছুটা হলেও খেয়ে নিতে পারে এবং যথাসম্ভব লোভনীয় সম্পদ আত্মসাৎ করার চেষ্টা করতে পারে।

অতএব যদি সে এ ধরনের আত্মসাৎমূলক কাজ করে, তবে তার এ কাজ প্রমাণ করবে সে তার নিয়োগকর্তার ঘোষণা, সতর্কতা ও প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করেনি। আর তাই বলা যায় পরকালীন ভয়াবহ জাহান্নামের বিষয়ে সতর্ক করা সত্ত্বেও যারা আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান বাস্তবে অনুসরণ করছে না, আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্য কাউকে আইন-বিধান-আদেশ দাতা হিসেবে গ্রহণ করছে, আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করছে, রাসূল সা. এর আদর্শের অনুসারী নয় এমন ব্যক্তিদেরকে নিজের অনুসরণযোগ্য আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করছে, তারা মূলতঃ পরকাল বিশ্বাস করেনি বা সন্দিহান এবং সন্দেহর মাত্রা বিশ্বাস অপেক্ষা বেশি।

নবী-রাসূল বা রিসালাতের উপর ঈমান

আল্লাহ্ মানুষ সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁর ইবাদতের জন্য। মানুষকে আল্লাহ্‌র ইবাদত করার জন্য প্রথমে ইবাদতের প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি জানতে হবে, তাছাড়া মানুষের সামনে আল্লাহ্‌র একটি পরিচয়ও থাকতে হবে। আল্লাহ্ পৃথিবীতে মানুষ পাঠানোর সূচনালগ্ন থেকে মানুষের মধ্য থেকে নবী প্রেরণ করেছেন; যেন উক্ত নবী আল্লাহ্‌র অপরাপর বান্দাহর কাছে আল্লাহ্‌র পরিচয় তুলে ধরতে পারেন এবং তাদেরকে আল্লাহ্‌র ইবাদত করার বিষয়টি শিক্ষা দিতে পারেন এবং ইবাদত করা না করার ফলাফলও অবগত করে তাদেরকে সচেতন করতে পারেন। পবিত্র কুরআনুল কারীমে আল্লাহ্ বলেন:

كَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَ يُزَكِّيْكُمْ وَ يُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ١٥١

‘আমি তোমাদের মধ্যে তোমাদের একজনকে রাসূল করে পাঠিয়েছি, যে আমার আয়াতসমূহ তোমাদের কাছে পাঠ করে, তোমাদের পবিত্র করে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেয় এবং তোমরা যা জানতে না, তা শিক্ষা দেয়।’

–সূরা বাক্বারা: আয়াত ১৫১

কুরআনুল কারীমের অপর আয়াতে বলা হয়েছে:

عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ اَحَدًا ٢٦ . اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ فَاِنَّهٗ يَسْلُكُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًا ٢٧ . لِّيَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوْا رِسٰلٰتِ رَبِّهِمْ وَ اَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَ اَحْصٰى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ٢٨ .

‘তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী, পরন্তু তিনি অদৃশ্য বিষয় কারো কাছে প্রকাশ করেন না, তাঁর মনোনীত রাসূল ব্যতীত। তখন তিনি তাঁর (রাসূলের) অগ্রে ও পশ্চাতে প্রহরী নিযুক্ত করেন, যাতে আল্লাহ্ তা’য়ালা জেনে নেন যে, রাসূলগণ তাঁদের পালনকর্তার পয়গাম পৌঁছিয়েছেন কিনা। রাসূলগণের কাছে যা আছে, তা তাঁর জ্ঞান-গোচর। তিনি সবকিছুর সংখ্যার হিসাব রাখেন।’ -সূরা জ্বীন: ২৭-২৮

আল্লাহ্ মানুষকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন একটি স্বাধীন সত্ত্বা দিয়ে। মানুষ তার কাজকর্ম সম্পাদনের বিষয়ে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অনেকটা স্বাধীন। সে ইচ্ছা করলে নিজেকে ভালো কাজে নিয়োজিত করতে পারে, আবার অপরাধেও জড়িয়ে পরতে পারে। কিন্তু পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকে আল্লাহ্ বিবেক নামক গুরুত্বপূর্ণ একটি শক্তি দিয়েছেন, যার প্রভাবে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ নিজেকে ভালো হিসেবে গড়ে তোলাকে সঙ্গত মনে করে। তথাপিও মানুষ বিভিন্ন স্বার্থের বশবর্তী হয়ে বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পরে। আবার অনেক ক্ষেত্রে জ্ঞানের অনস্বীকার্য সীমাবদ্ধতার কারণে প্রকৃত কল্যাণ কিসে আছে, তাও বুঝতে পারে না। অপরদিকে তার এ সীমিত জ্ঞান দ্বারা আল্লাহ্কে জানা এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করার পদ্ধতি বুঝা, জান্নাত ও জাহান্নামের অস্তিত্ব অনুধাবন করা এবং মৃত্যু পরবর্তী পুনরুজ্জীবনকে জানা অসম্ভব। এ সকল বিষয়ের জ্ঞান রয়েছে একমাত্র আল্লাহ্র আওতাধীন। এ জ্ঞান মানুষের ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির জন্য অপরিহার্য। মানুষ তা অর্জন করতে ব্যর্থ হলে এ পৃথিবীতেও যেমন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে না, পরকালেও মুক্তি পাওয়া যাবে না। সুতরাং, এ জ্ঞান প্রাপ্তির জন্য আল্লাহ্র সাথে মানুষের একটি যোগসূত্র স্থাপন অত্যাবশ্যক। আল্লাহ্ প্রতিটি মানুষের সাথে সংযোগ স্থাপন করে তা জানিয়ে দেন না, তাছাড়া তা মানুষের পরীক্ষার জন্যও যুক্তিসঙ্গত নয়। কেননা, না দেখে বিশ্বাস করা হলো ঈমান। তাই আল্লাহ্ নবী ও রাসূলগণের মাধ্যমে পৃথিবীর সকল মানুষের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করেছেন। উপরোক্ত আয়াতদ্বয় হতে প্রতীয়মান হয় একমাত্র আল্লাহ্ই সকল গায়েবী জ্ঞানের অধিকারী। এ সকল জ্ঞান তিনি সাধারণ মানুষকেও প্রত্যক্ষভাবে দান করেন না। তিনি তাঁর নবী-রাসূলগণকে এ জ্ঞানের যতটুকু জানানো দরকার, ততটুকুই অবহিত করেন। মানুষের মধ্য হতেই নবী-রাসূল মনোনীত করেন, যাতে উক্ত নবী ও রাসূলগণ সকল মানুষকে জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে পারেন এবং মানুষ যা জানতো না তা জানাতে পারেন। আল্লাহ্র সাথে মানুষের যোগসূত্র স্থাপনের একমাত্র মাধ্যম হলো নবী-রাসূলগণ। আর তাই আল্লাহ্র উপর ঈমান আনার পাশাপাশি নবী-রাসূলগণের উপর ঈমান আনাও অত্যাবশ্যক। নবী-রাসূলগণের

উপর ঈমান আনা ব্যতীত মুসলমান হওয়া এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করা সম্ভব নয়।

এখন আলোচনা করা যাক, নবী-রাসূলগণের উপর ঈমান আনার অর্থ কী দাঁড়ায় এবং রাজনীতির সাথে কী তার সম্পর্ক। আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেছেন:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَ الْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَ ذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ٢١.

'তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও পরকালকে ও আল্লাহ্‌কে বেশি স্মরণ করে, তাদের জন্য আল্লাহ্‌র রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।'

সূরা আহ্‌যাব: আয়াত ২১

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّ لَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗۤ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ١ؕ وَ مَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا ٣٦.

'আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল কোনো বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোনো বিশ্বাসী পুরুষ বা নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে স্পষ্টতই পথভ্রষ্ট হবে।' -সূরা আহ্‌যাব: ৩৬

অন্যত্র বলা হয়েছে:

وَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ٧١.

'যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে তাঁরা অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে।' -সূরা আহ্‌যাব: আয়াত ৭১

আল্লাহ্ রাসূল সম্পর্কে তথা মুহাম্মদ সা. সম্পর্কে মানব জাতিকে যে নির্দেশ দিয়েছেন, তার সারকথা হলো:

রাসূল সা. এর মধ্যে মানব জাতির জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে এবং যারা সেই আদর্শের অনুসরণ করবে, একমাত্র তাঁরা মহাসাফল্য অর্জন করবে। অপরদিকে মানুষকে হুশিয়ার করে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, যে কোনো ব্যাপারে আল্লাহ্‌র রাসূলের দিক-নির্দেশনা বিদ্যমান থাকলে, সে বিষয়ে কোনো মানুষ নিজের ইচ্ছার অনুসারী হয়ে মনের গোলামীতে লিপ্ত হতে পারবে না। কেউ লিপ্ত হলে আল্লাহ্‌র কাছে গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট হিসেবে গণ্য হবে। আল্লাহ্‌র রাসূলের উপর ঈমান

আনার অর্থ হলো নিজের জীবনে রাসূল সা. এর শর্তহীন অনুসরণ করা। তাছাড়া স্বাভাবিক বুদ্ধির দাবিও তাই যে, যখন কাউকেও আল্লাহ্‌র নবী বা প্রতিনিধি হিসাবে বিশ্বাস করা হয়, তখন তার আহ্বানে সাড়া দিতে হবে।

রাসূল সা. এর পূর্ণ অনুসরণের জন্য প্রথমে তাঁর জীবন সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। অত:পর নিজের জীবন সেমতে পরিচালিত কিনা, তা বিচার করতে হবে। যদি নিজ জীবন বিশ্লেষণে মনে হয় তাঁর অনুসরণ হচ্ছে বা করা যাচ্ছে, তবে অনুসারী হবেন ঈমানদার বা মুসলমান। আর বিপরীত ক্ষেত্রে তাঁর পরিচয়ও বিপরীতই হবে।

রাসূল সা. এর জীবন এক সীমাহীন জ্ঞান দরিয়া। কেবলমাত্র কুরআন আর রাসূল সা. এর জীবন বিশ্লেষণে একজন দীর্ঘায়ূ ব্যক্তির জীবন কাটিয়ে দেয়া সম্ভব, তারপরও বিশ্লেষণ অসমাপ্ত রয়ে যাবে। তথাপিও আমরা অতি সংক্ষেপে রাসূল সা. এর জীবনের দিকে দৃষ্টি দেবো এবং আমাদের কাজ-কর্মের দিকে দৃষ্টিপাত করবো। উল্লেখ্য, পবিত্র কুরআনুল কারীম, হাদীসের গ্রন্থসমূহ এবং নির্ভরযোগ্য সীরাত গ্রন্থসমূহের অধ্যয়নের মাধ্যমে আমরা নবী সা. এর জীবন চিত্র দেখতে পাই। প্রতিটি মানুষকে এই উৎস হতে রাসূল সা. এর জীবন ও আদর্শ জেনে নিয়ে তাঁর অনুসরণের মাধ্যমে মুসলমান হতে হবে। আমরা এখানে দু'একটি কথার মাধ্যমে রাসূল সা. এর আদর্শের নমুনার দিকে মনোনিবেশ করবো। রাসূল সা. এর তেষট্টি বছর জীবনের মধ্যে ৪০ বছর সাধারণ মানুষের জীবনের মধ্যে গণ্য। নবুওয়াত প্রাপ্তির পরবর্তী ২৩ বছর তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল হিসেবে জীবন যাপন করেছেন। রাসূল সা. এর উপর ঈমান আনার দাবি সত্য হলে আমাদেরকে এই ২৩ বছর জীবনের অনুসরণ করতে হবে। রাসূল সা. এর নবুওয়াতী জিন্দেগীর প্রথম ঘটনাটি হলো, জিবরীল আ. নবী সা. এর নিকট আল্লাহ্‌র একটি নির্দেশ পৌঁছে দেন, যা সূরা আ'লাক্ব এ বর্ণীত হয়েছে। যেমন-

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَۚ١ . خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍۚ٢ . اِقْرَاْ وَ رَبُّكَ الْاَكْرَمُۙ٣ . الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِۙ٤ . . عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْؕ٥ .

'পড়ুন, আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাটবাধা রক্ত থেকে। পাঠ করুন আপনার পালনকর্তা মহাদয়ালু। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না।'

–সূরা আ'লাক্ব: আয়াত ১-৫

উপরোক্ত আয়াতগুলো কুরআনুল কারীমের সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত। উক্ত আয়াতগুলোতে আল্লাহ্ রাসূলকে (সা.) পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ্র নামে। আল্লাহ্ সেই সাথে তাঁর দয়াময়তার কথাও জানিয়ে দিয়েছেন। আরও বলেছেন, মানুষ যা জানতো না, তা আল্লাহ্ মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন। এই আয়াতের মাধ্যমে সর্বপ্রথমই জ্ঞান অর্জনের তাকিদ করা হয়েছে। আর এ জ্ঞান রাসূল সা.কে সমগ্র জগতের সকল মানুষ হতে শ্রেষ্ঠতর করেছে। রাসূল সা. এর কাছে আল্লাহ্র যে জ্ঞানের নিয়ামত এসেছে, পৃথিবীর সকল মানুষ শান্তি ও মুক্তির জন্য সে জ্ঞানের মুখাপেক্ষী। মানুষ নিজে কিছু জানতো না এবং জানার নিজস্ব সামর্থও তার নেই। আল্লাহ্ই তাকে জানিয়ে দিয়েছেন এবং জানার ক্ষমতা দিয়েছেন। সুতরাং, প্রতিটি মানুষের ঈমান আনার সাথে সাথে প্রথম যে কর্তব্য দাঁড়ায় তা হলো, জ্ঞান আহরণ করা। যেহেতু আল্লাহ্ মানুষকে না জানালে সে কিছু জানতো না এবং আল্লাহ্ তাঁর রাসূল সা. কে যা জানিয়েছেন, তা-ই একমাত্র নিশ্চিত-নির্ভুল, সেহেতু মানুষের জ্ঞান লাভের প্রথম উৎস হবে আল্লাহ্র কুরআন এবং রাসূল সা. এর হাদীস। রাসূল সা. এর জীবদ্দশায় যারা ঈমান এনেছেন, নবী সা. তাদেরকে প্রথমে কুরআন শিক্ষা দিতেন এবং এ সকল সাহাবাগণ কুরআনের পাশাপাশি রাসূল সা. এর পবিত্র মুখনি:সৃত হাদীস শুনতেন এবং স্মৃতিতে বদ্ধমূল করে রেখে নিজেদেরকে সে মতে পরিচালিত করে সোনার মানুষে পরিণত হয়েছিলেন। নবী সা. এর অবর্তমানে এখনও মানুষ আল্লাহ্র কুরআন ও রাসূল সা. এর হাদীস অধ্যয়নের মাধ্যমে নিজেকে চিনতে, আল্লাহ্র সৃষ্টিলোক, নিজের জীবনের অতীত ও ভবিষ্যত এবং তার দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে সম্যক অবগত হতে সক্ষম। তার এ জ্ঞান তাকে পশু থেকে এবং পশু শ্রেণির মানুষ হতে আলাদা করে দেবে। তার জীবন সফল করে দেবে। আর এ জ্ঞানের অভাব তাকে পশু চরিত্রে চিত্রিত করবে। অতএব যারা রাসূল সা. এর উপর ঈমান আনার দাবি করবে, তাদের প্রথম কর্তব্য হবে কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান আহরণ করা। সে যদি পরিবার প্রধান হয়, তবে সে পরিবারের প্রতিটি সদস্যের জন্য কুরআন হাদীসের শিক্ষা গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করবে, সমাজপতি হলে, সে সমাজে ইসলামী শিক্ষার প্রসার ঘটাবে, আর রাষ্ট্রপ্রধান হলে রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনে বদ্ধপরিকর থাকবে। কোনো মানুষের মধ্যে এ ধরনের প্রবণতা পরিলক্ষিত না হলে রাসূল সা. এর প্রতি ঈমান আনার দাবি যথার্থ হবে না।

রাসূল সা. এর প্রতি পড়ার আদেশ সম্বলিত ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পর যে আদেশ সম্বলিত ওহীর অবতারনা হয় তা হলো:

يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۙ۱ . قُمْ فَاَنْذِرْ ۙ۲ . وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ ۙ۳ .

'হে বস্ত্রাবৃত, ওঠো এবং সাবধান করে দাও, তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো।' সূরা আল মুদ্দাস্‌সিরঃ আয়াত; ১-৩

ইতোপূর্বে যে আয়াতের উল্লেখ করা হয়েছে, উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। ঐ আদেশ দানের পর কিছুকাল বিরতি দিয়ে আল্লাহ্ মূল উদ্দেশ্য সম্বলিত ওহী প্রেরণ করেন। এ আয়াত পাঠে মনে হয় আল্লাহ্ যেন রাসূল সা. কে বলছেন, হে বস্ত্র আচ্ছাদিত হয়ে শয়নকারী, তুমি উঠো! তোমার এখন শুয়ে থাকলে চলবে না। আজ ভ্রান্ততার মহাপ্লাবনে আমার বান্দাহরা ভেসে যাচ্ছে ধ্বংসের দিকে। তারা তাদের প্রভুকে ভুলে নাফরমানীতে লিপ্ত রয়েছে। তুমি তাদেরকে সাবধান করে দাও। তাদেরকে জানিয়ে দাও একমাত্র আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ্ ব্যতীত সবকিছু একদিন নি:শ্বেষ হয়ে যাবে আল্লাহ্র ইচ্ছায়। আবার আল্লাহ্ই তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করে তাদের কৃতকর্মের ফলাফল দেবেন। তাদেরকে জানিয়ে দাও, আল্লাহ্র মুকাবিলায় সবকিছু দুর্বল, সবকিছু নি:স্ব। সুতরাং, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব আর মহিমা বর্ণনা করো এবং পৃথিবীর যে সকল শক্তি শ্রেষ্ঠ হওয়ার দাবিদার, তাদেরকে দৃঢ়তার সাথে অস্বীকার করে আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্বকে ঘোষণা করে দাও।

যে সমাজে উপরোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়েছিল, সে সমাজ ছিল শিরকের প্রাণকেন্দ্র। কুফরী ও মুশরেকীর একনিষ্ঠ সেবক ছিল প্রভাবশালী গোত্রপতিরা। এ অবস্থায় একমাত্র আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণার, দাওয়াত দেয়ার ও আল্লাহ্র বিধান ছাড়া সবকিছু বাতিল ঘোষণা দেয়ার পর তাদের দীর্ঘদিনের প্রভাব ও কর্তৃত্ব খতম হয়ে যাওয়া অবশ্যম্ভাবী। ফলে যে সকল নাদান ও মূর্খ প্রকৃতির লোক আল্লাহ্র কর্তৃত্ব মেনে নিয়ে তাঁর বান্দাহ হয়ে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের পরিবর্তে, এ পৃথিবীতে কর্তৃত্ব রক্ষাকে অধিক পছন্দ করে তাদের পক্ষ হতে মরণপন বিরোধিতা আসা স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে তাদেরকে তাও জানিয়ে দেয়া হলো হে গোত্রপতিগণ তোমরা জেনে রাখো, আল্লাহ্ই শ্রেষ্ঠ। অতএব আল্লাহ্র মুকাবিলায় তোমাদের শক্তি মাকড়সার জাল সদৃশ, আর তাই তোমাদের ভয়ে আল্লাহ্র দাওয়াতের কাজ বন্ধ করার কোনো প্রশ্ন উঠতে পারে না।

রাসূল সা. নবুওয়াত লাভের পর থেকে ওফাতের পূর্ব পর্যন্ত মানুষের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছিয়ে দিয়েছেন এবং যারা রাসূল সা. এর প্রতি ঈমান এনেছেন সে সকল অনুসারীগণও রাসূল সা. এর সাথে এ মহান দাওয়াতী কাজে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ফলে রাসূল সা. সহ প্রায় প্রতিটি সাহাবীর জীবনে নেমে আসে কাফির ও মুশরিকদের কর্তৃক নির্যাতনের প্রচণ্ডআঘাত। কোনো নির্যাতনের

ঝড় আল্লাহ্‌র দ্বীনের এ দাওয়াতকে থামিয়ে দিতে পারেনি। বরং আরও প্রবল গতিতে দাওয়াতের কাজ প্রসারিত হতে থাকে। বহু সাহাবী শহীদ হন এবং বহু যুদ্ধ সংঘটিত হয় কাফিরদের সাথে। সবকিছুর পরও যারা প্রিয় নবীজী সা. এর উপর ঈমান এনেছিলেন, তাঁরা সবাই এ কাজে অংশ নিয়েছিলেন এবং স্বয়ং রাসূল সা. নিজেও দাওয়াত দিতে গিয়ে শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণারশিকার হয়েছিলেন। আজকে রাসূল সা. এর উপর ঈমান আনার দাবি যারা করছেন, তাদেরকে রাসূল সা. কে অনুসরণ করে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিতে হবে। ঈমান আনার দাবি যদি সত্য হয় তবে এ কাজ থেকে পিছিয়ে থাকার কথা নয়।

এখন আমরা রাসূল সা. এর জীবনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও আদর্শের দিকে স্বল্প পরিসরে আলোকপাত করবো। আমরা রাসূল সা. এর জীবনের মিশনের দিকে তাকালে দেখি, রাসূল সা. নবুওয়াত লাভ করার পর দুনিয়াবাসীর কাছে তাওহীদের দাওয়াত পেশ করেছিলেন। দাওয়াতী কাজের সূচনালগ্ন থেকে শুরু করে হিযরত পর্যন্ত রাসূল সা. এবং তাঁর অনুসারীদের উপর চরম নির্যাতন চলতে থাকে। জঘন্যতম নির্যাতন সহ্য করেও রাসূল সা. এবং তাঁর অনুসারীরা সত্যের দাওয়াত প্রকাশ্যে পৌঁছাতে থাকেন এবং মানুষ কাফেরী নির্যাতনের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। সে সময়ে মক্কার কাফের সর্দাররা ইসলামের জয়যাত্রার অদমনীয়তা লক্ষ্য করে শেষ পর্যন্ত তাদের সভা আহ্বান করে। ইসলামী দাওয়াতের ধারা চিরতরে নিভিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে উক্ত বৈঠকে রাসূল সা. কে হত্যার নীলনকশা প্রণয়ন করে। এ পরিস্থিতিতে আল্লাহ্‌র হাবীব আল্লাহ্‌র নির্দেশে মক্কাভূমি ত্যাগ করে মদিনায় হিজরত করেন। এতেও কুফরী শক্তি থেমে যায়নি। ইতিমধ্যে আল্লাহ্‌ রাসূল সা.কে দিলেন উত্তম চরিত্রের বহু অনুসারী। রাসূল সা. তাঁর এ অনুসারীদেরকে নিয়ে কাফেরদের সাথে বহুবার দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধের মুখোমুখী হয়েছেন এবং কাফেরদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন। পরিশেষে মেহেরবান আল্লাহ্‌ রাসূল সা. এবং তাঁর অনুসারীদের ঐকান্তিক চেষ্টা-সাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে দান করলেন মহা বিজয়। কুফরী শক্তির অবসান ঘটলো, আর প্রতিষ্ঠিত হলো ইসলামী শাসনব্যবস্থা। ফলে সমাজ ও দেশ শাসনের সকল মানব মনগড়া বিধি-বিধান বিজিত ও বিলুপ্ত হয়ে যায়। মানুষ মানুষের তৈরি করা কু-প্রথা ও প্রহসনের বিচার ব্যবস্থার অনুসরণ পরিত্যাগ করে মানুষের গোলাম হওয়া থেকে পরিত্রান পায়। আল্লাহ্‌র আইন ও বিচার ব্যবস্থার অধীনে পরিচালিত হওয়ার কারণে সমাজের সকল মানুষ আল্লাহ্‌র গোলামে পরিণত হয় এবং সকলে একই পরিচয়ে (আল্লাহর বান্দাহ) পরিচিত হওয়ার সুযোগ পায়। রাসূল সা. তাঁর তেইশ বছরের সাধনায় যে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা

প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তা রক্ষণাবেক্ষনের জন্য ওফাতের পূর্বে তাঁর অনুসারীদেরকে দায়িত্ব অর্পণ করে আমানত স্বরুপ রেখে গেছেন।

অতএব রাসূল সা. এর উপর যারা ঈমান আনবে, তাদের জীবনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও মিশন তাই হবে, যা রাসূল সা. দেখিয়ে গেছেন। অর্থাৎ, ঈমান আনার সাথে সাথে মুসলমান ব্যক্তিটি দেশ বা রষ্ট্রে মানুষের তৈরি করা আইন ও মতবাদ এর স্থলে আল্লাহ্‌র আইন বা শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। কেউ এ কাজে আত্মনিয়োগ না করলে, রাসূল সা. এর প্রতি ঈমান আনার দাবির সত্যতা পাওয়া যায় না। আর যারা অন্তত: এ কাজটি মন থেকে সমর্থন ও সহযোগিতার মনোভাব পোষণ করে, তাদের মধ্যে কিছুটা হলেও ঈমান বিদ্যমান আছে। কিন্তু যারা প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভের আশায় অথবা অন্য কোনো কারণে ইসলামী শাসনব্যবস্থা বা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করার পরিবর্তে মনুষ্য আইন ও শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন ও সংরক্ষণের রাজনীতিতে জড়িত বা সমর্থনকারী তারা মৌখিকভাবে যতই ঈমানের ঘোষণা দিক না কেন, যতই তাসবীহ-তাহলীলের বাহ্যিক অনুশীলন করুক না কেন, তারা রাসূল সা. এর প্রতি ঈমানদার হতে পারে না। বরং তারা সুবিধাবাদী এবং বিশ্বাসে সন্দেহবাদী। কেননা, আল্লাহ্ বলেছেন:

وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّ لَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗۤ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ؕ وَ مَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا ؕ ٣٦

'আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল কোনো বিষয়ে নির্দেশ দিলে, কোনো বিশ্বাসী পুরুষ বা নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে স্পষ্টতই পথভ্রষ্ট হবে।' -সূরা আহ্যাব: ৩৬

অতএব কোনো রাষ্ট্রের অধিকার নেই, আল্লাহ্‌র বিধান ব্যতীত অপর কোনো বিধান দ্বারা বিচার ফায়সালা করার। যে সকল রাজনৈতিক দল ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার রাজনীতি না করে মানব রচিত মতবাদকে কেবল লালন করছে এবং যে সরকার মানব রচিত মতবাদ দ্বারাই দেশ পরিচালনা করে, সেই সরকার এবং সেই সরকারের রাজনীতি করে ঈমানদার হওয়ার সুযোগ আছে কী নেই, তা খুব সহজে অনুমেয়। যেহেতু আল্লাহ্‌র রাসূল সা. একমাত্র আল্লাহ্‌র দেয়া বিধান মতো রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন, সেহেতু কোনো রাষ্ট্র প্রধান বা সরকার প্রধান ও তাঁর সহযোগীরা রাসূল সা. এর উপর ঈমান আনলে, রাসূল সা. এর অনুসরণ করে আল্লাহ্‌র বিধান অনুসারেই রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। বিপরীত মর্মে, তা না করলে বুঝতে হবে, তারা রাসূল সা. এর উপর ঈমান আনেনি। যারা সেক্যুলার রাজনীতির

সাথে সম্পর্কিত, তাদের বিষয়টি উপরোক্ত নির্ণায়ক দ্বারা বিশ্লেষণ করা হলে খুব সহজে দেখা যাবে তারা জন্মগতভাবে মুসলিম হলেও রাসূল সা. এর উপর সত্যিকার অর্থে ঈমান আনার শর্ত পূরণ করতে পারেনি।

আসমানী কিতাবসমূহের উপর ঈমান

আল্লাহ্ কালামুল্লাহতে বলেন:

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ الْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَ الْكِتٰبِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ؕ وَ مَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَ مَلٰٓئِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا١٣٦ .

'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র, তাঁর রাসূলের, তিনি যে কিতাব তাঁর রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন, তার উপর ও যে কিতাব তিনি পূর্বে অবতীর্ণ করেছেন, তার উপর বিশ্বাস করো। আর যে কেউ আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূল ও পরকালকে অবিশ্বাস করবে, সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হবে।'

-সূরা নিসা: আয়াত **১৩৬**

কুরআনুল কারীমের উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ বিশ্বাসীদেরকে আসমানী কিতাবসমূহের উপর ঈমান আনার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ মানব সৃষ্টির সূচনালগ্ন হতে মানব জাতির হেদায়াতের জন্য নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন। নবী রাসূলগণ মানবজাতিকে তাদের মুক্তির জন্য আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করতেন। মহান আল্লাহ্‌র দিকে নবী রাসূলগণের এ আহ্বান তাদের ইচ্ছামাফিক পদ্ধতিতে ছিল না, বরং তাঁরা আল্লাহ্‌র নির্দেশনা অনুসারে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করতেন।

আল্লাহ্ প্রত্যেক জাতির কাছে নবী প্রেরণ করেছেন। এসকল নবীগণের মধ্যে কাউকে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন এবং রাসূলগণের উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। এ কিতাব হলো মানব জাতির জন্য পালনীয় আল্লাহ্‌র দিক-নির্দেশনা। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে আল্লাহ্ প্রয়োজন অনুসারে পূর্ববর্তী কিতাব রহিত করে নতুন করে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহ্ সবশেষে পূর্ববর্তী সকল কিতাবকে রহিত করে সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ সা. এর উপর আসমানী কিতাব কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। প্রত্যেক নবীর উম্মতের জন্য তৎকালীন রাসূলগণের উপর অবতীর্ণ কিতাবের অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। যারা নিজেদের জন্য সংশ্লিষ্ট কিতাবের অনুসরণের জন্য সংকল্পবদ্ধ হয় এবং অনুসরণ করে, তাঁরা মুসলমান। সুতরাং, যারা ইব্রাহিম আ. এর যুগে ইব্রাহিম আ. এর প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের অনুসারী ছিল, তাঁরা ছিল মুসলমান। আবার যারা মূসা আ. এর

উম্মত ছিল, তাদের যুগে যেহেতু পূর্বের কিতাব রহিত করে আল্লাহ্ তাওরাত দিয়েছিলেন, সেহেতু যারা তাওরাতের অনুসারী ছিল, তাঁরা মুসলমান। আল্লাহ্র কিতাবের প্রতি ঈমান আনার অর্থ হলো- আল্লাহ্ যত কিতাব প্রেরণ করেছেন, তার সব কয়টিকে আল্লাহ্র কিতাব হিসেবে বিশ্বাস করা। যেহেতু আল্লাহ্ একটি কিতাব দেয়ার পর পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ রহিত করে দিয়েছেন, সেহেতু সর্বশেষ কিতাবের অনুসরণ করা। আল্লাহ্ আমাদের নবী সা. এর উপর পরিপূর্ণ জীবন বিধানরূপে আল কুরআন অবতীর্ণ করেছেন এবং কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে পূর্ববর্তী সকল কিতাব রহিত হয়ে গেছে। যেহেতু পূর্ববর্তী সকল কিতাব রহিত হয়ে গেছে, সেহেতু আল্লাহ্ সে সকল কিতাব সংরক্ষণেরও কোনো ব্যবস্থা করেননি। ফলে তার সব কয়টি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হারিয়ে বিকৃত গ্রন্থে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে আল্লাহ্র মনোনীত একমাত্র জীবন বিধান হিসেবে আসমানী কিতাব আল কুরআন আল্লাহ্র হিফাজতের কারণে সম্পূর্ণ অবিকৃত ও অক্ষত অবস্থায় বিদ্যমান আছে। অতএব যিনি নিজেকে মুসলমান হিসেবে দাবি করবেন তিনি কুরআনুল কারীমের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবেন। আর যে কুরআনুল কারীমের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবেন, তিনি ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কুরআনের বিধি-নিষেধ আন্তরিকতার সাথে পরিপালন করবেন, কুরআন নির্দেশিত রূপরেখানুসারে পরিবার গঠন করবেন এবং সমাজ-রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে কুরআনী বিধানমতে রাষ্ট্র-সমাজ পরিচালনা করবেন এবং যে সমাজ ও রাষ্ট্রে কুরআনের শাসন প্রতিষ্ঠিত নেই, কুরআনের নির্দেশমতে সে সমাজ বা রাষ্ট্রে কুরআনী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য সাধ্যমত প্রচেষ্টা চালাবেন। অতএব যে ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত জীবনে, পারিবারিক, সামাজিক জীবনে ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে কুরআনের বিধি-বিধান প্রবর্তনের পরিবর্তে অপর কোনো বিধানের প্রবর্তন, অনুসরণ ও সংরক্ষণের রাজনীতিতে নিয়োজিত সেই ব্যক্তি মুখে যতই ঈমান গ্রহণের বা মুসলমান হওয়ার ঘোষণা দিক না কেন, সে প্রকৃতপক্ষে কুরআনের উপর পূর্ণ ঈমান আনতে পারেনি বা আনেনি। অতএব তার পক্ষে মুসলমান দাবি করার সঙ্গত কোনো কারণ নেই।

যারা সেক্যুলার রাজনীতি করেন তারা জন্মসূত্রে মুসলিম হওয়ার কারণে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারেন, কুরআনের উপর বিশ্বাস থাকার কথা ঘোষণা দিতে পারেন, কুরআনের শিক্ষালয় বা মাদ্রাসায় অনুদান দিয়ে থাকতে পারেন, কিন্তু তারা কুরআনের উপর ঈমান আনার দাবির বিষয়ে উপরোক্ত মানদণ্ডে এ কারণে উত্তীর্ণ হবেন না যে, তারা দেশের আইন প্রণয়ন, নীতি নির্ধারণ ও দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে কোথাও কুরআনকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। তাদের এ ধরনে দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ কুরআনের উপর তাদের আস্থাহীনতার লক্ষণ প্রকাশ করে।

ফেরেশতাদের উপর ঈমান

ফেরেশতাদের উপর ঈমান আনা ঈমানের একটি অপরিহার্য অংশ। মূলত: ফেরেশতাদের উপর ঈমান আনা না হলে পূর্বে উল্লেখিত বিষয়সমূহের উপর ঈমান আনা সম্ভব নয়। কেননা আল্লাহ্ ফেরেশতাদের মাধ্যমে নবী-রাসূলগণের সাথে সংযোগ রক্ষা করেছেন এবং আসমানী কিতাবসমূহের বাহকও ছিলেন ফেরেশতাগণ। আর নবী-রাসূল এবং তাঁদের উপর অবতীর্ণ কিতাবের মাধ্যমে আল্লাহ্র অস্তিত্ব, আখিরাতের অস্তিত্ব, নবী-রাসূলগণের নেতৃত্ব মেনে নেয়ার অপরিহার্যতা সম্পর্কে আল্লাহ্র নির্দেশ ইত্যাদি বিষয় আমরা অবগত হতে পারি। অতএব কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে ফেরেশতাদের যে বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমরা অবগত হয়েছি, তা পূর্ণরূপে বিশ্বাস করতে হবে। যদিও আল্লাহ্ কোনো কিছুর সাহায্য ছাড়া যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারেন, তথাপিও তিনি তাঁর সমগ্র সৃষ্টি জগতের নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাঁর সৃষ্টি ফেরেশতাদের নিয়োজিত রেখেছেন। ফেরেশতাগণ আল্লাহ্র নির্দেশ এবং আল্লাহ্র দেয়া শক্তি সামর্থের মাধ্যমে আল্লাহ্র দেয়া দায়িত্ব কর্তব্যসমূহ যথাযথভাবে পালন করে থাকেন। সুতরাং, কালামে হাকিমে আল্লাহ্র দেয়া বর্ণনা অনুসারে ফেরেশতাদের উপর ঈমান আনা অপরিহার্য।

সালাত কায়েম করা

ইসলামের অপর গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হলো সালাত। একজন মুসলমান এবং অমুসলমানের মধ্যে প্রথম সুস্পষ্ট পার্থক্যকারী বিষয় হলো সালাত। আল্লাহ্, পরকাল, আল্লাহ্র রাসূল সা. ইত্যাদি বিষয়সমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপন একান্ত অন্তরের বিষয়। তার বিশ্বাসের ঘোষণা অন্তর হতে আসলো কিনা, তা একজন মানুষের স্বেচ্ছা প্রণোদিত কাজসমূহের মাধ্যমে দৃশ্যমান হয়। আল্লাহ্র আদেশসমূহের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আদেশ হলো সালাত। যেমন- আল্লাহ্ বলেন–

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ۳ ۰ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ۖ

‘সে সমস্ত লোক যারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাঁদেরকে যে রুজি দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে, তাঁরাই হলো সত্যিকার ঈমানদার।’

–সূরা আনফাল: আয়াত ৩-৪

একজন মানুষ বিভিন্ন কারণে ঈমান আনার ঘোষণা দিতে পারে। কখনো কখনো মানুষ পার্থিব স্বার্থ লাভের জন্য ঈমান আনার ঘোষণা দিতে পারে। এ ধরনের ঘোষণা দাতারা প্রকৃত ঈমানদার নয়। যদি কেবলমাত্র ঘোষণার ভিত্তিতে একজন মানুষকে ঈমানদার হিসেবে গণ্য করা হয়, তবে প্রকৃত ঈমানদারদের থেকে এ সকল কপট ঈমানদারদেরকে পৃথক করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে ঈমানদার ও ঈমানের ঘোষণাকারী কপটদের মধ্যে পার্থক্যকারী প্রধান বিষয় হলো সালাত। যারা কপট বিশ্বাসী, তারা কেবল মানুষকে দেখানোর জন্য ঈমানের ঘোষণা দেয়। আবার নিজেদের ঘোষণার প্রতি অপরকে বিশ্বাসী করার জন্য মানুষকে দেখিয়ে দেখিয়ে সালাত পড়ে থাকে। ফলে যখন মানুষকে দেখানোর দরকার হয় না, তখন তারা সালাতও আদায় করার দরকার মনে করে না। ফলে সুযোগ পেলে সালাত ছেড়ে দেয়। অপরদিকে যারা প্রকৃত ঈমানদার তাঁদের মূল লক্ষ্য হলো আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করা। তাঁরা একমাত্র আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার জন্য ঈমানের ঘোষণা দেয়। ফলে আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার জন্য তাঁরা সালাত আদায় করে। যেহেতু তাঁরা বিশ্বাস করেন আল্লাহ্ সর্ব অবস্থায় দেখেন, সেহেতু কখনো সালাত ছেড়ে দেন না এবং সালাত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আল্লাহ্র কাছে সত্যিকার ঈমানদার হওয়ার পরিচয় দিয়ে থাকেন। আর তাই আল্লাহ্ কেবল সালাত প্রতিষ্ঠাকারীদেরকে সত্যিকার ঈমানদার বলে ঘোষণা করেছেন। অপরদিকে যারা সালাত আদায় করে না, তাদেরকে আল্লাহ্ অবিশ্বাসী হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। যেমন- আল্লাহ্ বলেন–

فَلَا صَدَّقَ وَ لَا صَلّٰى ۳۱ ۰ وَ لٰكِنْ كَذَّبَ وَ تَوَلّٰى ۳۲ ۰

'সে বিশ্বাস করেনি এবং সালাত ঠিকমতো পড়েনি বরং সে অবিশ্বাস করেছিল ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।'–সূরা ক্বিয়ামাহ্: আয়াত ৩১-৩২

অতএব মুসলমান ও অমুসলমানের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী মৌলিক বিষয়সমূহের মধ্যে প্রধান বিষয় হলো সালাত। আল্লাহ্ রাসূল সা. এর উম্মতের জন্য দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। অতএব আল্লাহ্ কর্তৃক ফরযকৃত পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের যে ওয়াক্ত হতে কোনো মানুষ সালাত আদায় করা ছেড়ে দিল তখন থেকে তার মুসলমান পরিচয়ের অবসান ঘটলো এবং পুনরায় সালাত শুরু না করা পর্যন্ত মুসলমান থাকলো না। কেননা মুসলমান হওয়ার অন্যতম প্রধান শর্ত হলো সালাত আদায় করা। আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত সহীহ আল বুখারীর এক হাদীসে রাসূল সা. বলেছেন–

'তোমরা বলো তো, যদি তোমাদের কারো বাড়ির দরজায় একটি নদী থাকে, আর সে তাতে দৈনিক পাঁচবার করে গোসল করে, তাহলে কী তার শরীরে কোনোরূপ ময়লা থাকবে? জবাবে সবাই বললো– না, তার শরীরে কোনোরূপ ময়লা থাকবে না। রাসূল সা. বললেন, পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের ব্যাপারটিও অনুরূপ, এর সাহায্যে আল্লাহ্ গুণাসমূহের (ধুয়ে মুছে) বিলোপ সাধন করেন।'

আনাস রা. হতে বর্ণিত অপর এক হাদীসে রাসূল সা. বলেন–

'তোমাদের কেউ যখন সালাত আদায় করতে দাঁড়ায়, সে তখন তাঁর প্রতিপালকের সাথে কথা বলে।'

উপরোক্ত হাদীসের প্রথমটি অনুসারে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত মানুষের পাপসমূহকে বিলোপ করে দেয় এবং দ্বিতীয় হাদীসটিতে বলা হয়েছে, মানুষ সালাতে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্র সাথে কথা বলে। আমরা সালাত সম্পর্কে একটু চিন্তা করলে মহানবী সা. এর কথার যথার্থতা বুঝতে সক্ষম হবো। সালাত এমন একটি ইবাদত যে, এর মর্মার্থ উপলব্ধি করে পূর্ণ ঈমানের সাথে নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা হলে এবং সে অনুসারে নিজের বাস্তব কাজ বা আমল সংশোধন করে নিলে কোনো মানুষের মধ্যে পাপ বা গুণাহের অস্তিত্ব থাকার কোনো সুযোগ নেই। সালাতের মাধ্যমে দৈনিক পাঁচবার স্বয়ং স্রষ্টা আল্লাহ্র সামনে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্র কতিপয় গুণরাজি, অধিকার ও মর্যাদার স্বীকৃতি দেয়া হয় এবং মানুষের প্রতি আল্লাহ্কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব কর্তব্য স্মরণ করার মাধ্যমে আল্লাহ্র নির্দেশনা গ্রহণ করা হয় এবং উক্ত দায়িত্ব কর্তব্য যথাযথভাবে পালনের জন্য আল্লাহ্র কাছে সরাসরি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। যেহেতু আমরা সালাতের মাধ্যমে স্বয়ং বিশ্ব জাহানের মালিক আল্লাহ্র সাথে কথা বলে আল্লাহ্র গুণরাজির স্বীকৃতি দিয়ে তাঁর কাছ থেকে তাঁর প্রদত্ত দায়িত্ব কর্তব্য বুঝে নিয়ে তা যথাযথভাবে পালন করার জন্য আল্লাহ্র নিকট ওয়াদাবদ্ধ

হই, স্বাভাবিক কারণে বাস্তব জীবনে এসে উক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন না করার কথা নয়। আর উক্ত দায়িত্ব কর্তব্য পালিত হলে গুণাহ বা পাপ হওয়ার সুযোগ নেই?

পক্ষান্তরে সালাতের মাধ্যমে আমরা যে সকল দায়িত্ব কর্তব্য বুঝে নেই, তা যদি বাস্তব জীবনে এসে পালন না করি বা তার বিপরীত কাজ করতে থাকি, তবে সালাতের মাধ্যমে পাপসমূহের বিলোপ সাধন সম্ভব নয়। এ বিষয়টি অনুধাবনের জন্য একটি উপমা দেয়া যেতে পারে। মনে করুন কোনো একটি মার্কেটিং কোম্পানী তার পণ্যসমূহের ব্যাপক মার্কেট সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বহুসংখ্যক কর্মী নিয়োগ দিয়েছে। প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য অর্জনের জন্য তাদেরকে যোগ্যতম করে তোলা ও তাদেরকে দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলার জন্য একটি বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। আর তা হলো, প্রতিটি কর্মী প্রত্যহ পণ্যের বাজার সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রচারকার্যে বের হওয়ার পূর্বে অফিসে উপস্থিত হয়ে হাজিরা বহিতে স্বাক্ষর করবে। অত:পর উক্ত প্রতিষ্ঠানের পণ্যসামগ্রির গুণাগুণ সম্পর্কে কিছু সময় পড়াশুনা করবে এবং পণ্যসামগ্রির গুণাগুণ কোনো কর্মকর্তার সামনে আবৃত্তি/রিইহের্সাল করবে এবং নিজেদের দৈনিক কাজসমূহ বুঝে নেবে ও উক্ত কাজ যথাযথভাবে সম্পাদন করার জন্য শপথ করবে। এখন কোনো একজন কর্মচারী যদি অফিসে সঠিক সময়ে উপস্থিত হয়ে উপরোক্ত কাজে অংশগ্রহণ না করে, তবে কী সে উক্ত অফিসের কর্মচারী হিসেবে গণ্য হবে? অপর একজন কর্মচারী দৈনিক অফিসে উপস্থিত হয়ে দৈনিক এই কাজটি করে ঠিকই, কিন্তু যখন এ কাজ শেষ করে অফিস থেকে বের হয়ে যায়, তখন বাইরে গিয়ে উক্ত প্রতিষ্ঠানের পণ্যসামগ্রিনিজেও ব্যবহার করে না এবং বলে এগুলোর গুণগত মান ভালো না হওয়ায় সে তা ব্যবহার করে না, সে অপরকে এ প্রতিষ্ঠানের পণ্যের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করার পরিবর্তে অপর কোনো প্রতিষ্ঠানের পণ্যের প্রতি ভোক্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং মানুষকে এ প্রতিষ্ঠানের পণ্য সম্পর্কে সঠিক গুণাগুণ বর্ণনা করার পরিবর্তে মিথ্যা বর্ণনার মাধ্যমে পণ্যের দোষ বর্ণনা করে। এক্ষেত্রে এই কর্মচারীর কাজ-কর্ম সম্পর্কে উক্ত প্রতিষ্ঠান নিশ্চিতভাবে অবগত হওয়ার পর তার প্রতি কিরূপ আচরণ করা উচিত? তার কী প্রতিষ্ঠানের বেতন ঠিক সময়ে পাওয়া উচিত? প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী হিসেবে কী তার স্বীকৃতি পাওয়া উচিত? সে পুনরায় পরবর্তী দিনগুলোতে একইভাবে প্রতিষ্ঠানের মূখ্য কর্মকর্তার সামনে ঐ নিয়মে আবৃত্তি করলে কি তার এ ঘোষণা উক্ত কর্তার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে? নাকি তার তিরস্কার পাওয়া উচিত?

যে কোনো সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ উক্ত কর্মচারীর ভাগ্যে কী ঘটবে, তা বুঝতে সক্ষম হবেন। কোনো কর্মচারী যখনই উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিয়মানুসারে তাদের

অফিসে উপস্থিত হয়ে উক্ত কাজ সম্পাদন করবে না, তারা উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী হিসেবে গণ্য হবে না। আর যারা উপস্থিত হয়ে প্রত্যহ এ সকল ঘোষণা দেয়া ও শপথ বাক্য পাঠ করে অফিস থেকে বের হয়ে তার বিপরীত কাজ করতে থাকেন, তারা বরখাস্ত হওয়ার যোগ্য এবং মিথ্যা ঘোষণার কারণে অধিকমাত্রায় তিরস্কৃত হবেন।

সুতরাং, যারা মুসলমান হওয়ার জন্য আল্লাহ্ কর্তৃক আরোপিত অন্যতম প্রধান শর্ত সালাত ত্যাগ করে, তারা নিজেদেরকে মুসলমান দাবি করার অধিকারী নয়। তারা মুসলমান নয়। আর যারা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত পড়েন ঠিকই, কিন্তু সালাতে যে ঘোষণা দেন এবং যে সকল দায়িত্ব কর্তব্য বুঝে নেন, বাস্তব জীবনে এসে বাস্তব কার্যাদীর মাধ্যমে উক্ত ঘোষণা প্রদান করেন না এবং গৃহীত দায়িত্ব কর্তব্য পালনের পরিবর্তে তার বিরুদ্ধাচরণ করেন, তারা মুসলমান তো ননই, বরং মুনাফিক বা কপট বিশ্বাসী হিসেবে গণ্য হওয়া স্বাভাবিক।

এখন বুঝে নেবো, আমরা সালাতের মাধ্যমে আল্লাহ্র কাছে কী কী ঘোষণা দিয়ে থাকি? কী কী দায়িত্ব কর্তব্য স্বীকার করি এবং কী কী প্রতিজ্ঞা করে থাকি। পাশাপাশি আমাদের দৈনন্দিন কার্যক্রম, রাজনৈতিক বিশ্বাস ও কর্মের সাথেও এ সকল বিষয়সমূহ মিলিয়ে দেখতে হবে।
নিম্নের উপ-অনুচ্ছেদসমূহে আমরা এ সকল বিষয়সমূহ আলোচনা করবো।

সালাতে প্রদত্ত ঘোষণা, গৃহীত দায়িত্ব-কর্তব্য ও প্রদত্ত প্রতিজ্ঞা

আল্লাহু আকবার (তাকবীরে তাহরিমা): আল্লাহু আকবার শব্দটি সালাতের সর্ব প্রথম শব্দ। আমরা এ শব্দটি উচ্চারণের মাধ্যমে একটি বিরাট ঘোষণা দিয়ে থাকি, যে ঘোষণার সাথে সাথে পৃথিবীর সকল শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব আমাদের হৃদয়পট হতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ঝড়ে পড়ে। আমরা এ শব্দটির দ্বারা বলে থাকি বা ঘোষণা করে থাকি 'আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ।' অর্থাৎ, সর্বদিক থেকে তিনি বড়, সব থেকে মহান, তাঁর মুকাবিলায় সকল শক্তিই দুর্বল, অসহায় ও অসাড়। তাঁর তুলনায় পৃথিবীর সবকিছু চরমভাবে অযোগ্য ও শক্তি-সামর্থহীন। একমাত্র তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, আর অন্য সবাই নিজস্ব ক্ষমতায় জ্ঞানহীন, একমাত্র তিনি সব থেকে বড় দয়াময়, আর অবশিষ্ট কোনো কিছুর নিজস্ব কোনো দয়া করার সামর্থ নেই। তাঁর দেয়া জ্ঞান নির্ভুল, নির্ভরযোগ্য, অপর কারো জ্ঞানের উপরই নিরঙ্কুশভাবে নির্ভর করা যায় না। একমাত্র তাঁর দেয়া ফায়সালা কল্যাণময়, কল্যাণ কিসে আছে, আল্লাহর

মোকাবেলায় তা বুঝার সামর্থ আর কারো নেই। অর্থাৎ, সবদিক থেকে তিনি এবং তাঁর নির্দেশনা সর্বশ্রেষ্ঠ।

সালাতে যে ঘোষণাটি দেয়া হয়, তা নামাজির বিশ্বাসের প্রতিফলন কিনা, তা উক্ত নামাজির বাস্তব কাজের মাধ্যমে প্রমাণিত হবে। অর্থাৎ, নামাজি সালাতে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিলো আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ আর সালাত শেষ করে কোনো ব্যক্তিকে বলে দিলো তুমি আল্লাহ্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অথবা এমন কোনো কাজ করলো যে, তার কাজ বলে দিল আল্লাহ্ নয়, বরং অন্য কোনো ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, তবে বুঝতে হবে উক্ত নামাজির ঘোষণা তার বিশ্বাসের বহি:প্রকাশ নয়। বিষয়টি আরো পরিষ্কার করে বলতে চাইলে বলতে হবে ধরুন, কাউকে পাশাপাশি দু'টি বিকল্প দিয়ে বলা হলো, যে কোনো একটিকে গ্রহণ করার জন্য, উক্ত ব্যক্তি উন্মাদ না হলে বা স্বাভাবিক বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ হলে দু'টির মধ্যে শ্রেষ্ঠটি গ্রহণ করবেন এবং তিনি যেটিকে গ্রহণ করেছেন, বুঝতে হবে তিনি ঐটিকে শ্রেষ্ঠ বলে গ্রহণ করেছেন বা শ্রেষ্ঠ মনে করেন এবং শ্রেষ্ঠ বলে রায় দিয়েছেন। এই বিবেচনাকে সামনে রেখে বলবো মানুষের সামনে বর্তমানে দু'ধরনের জীবন বিধান রয়েছে, তার একটি হলো ইসলাম– যা আল্লাহ্ কর্তৃক মনোনীত, অপরটি হলো মানব রচিত মতবাদ, যা আজকের বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণীত, মনোনীত এবং অনুসৃত। এখন কারো সামনে দু'টি বিধানই উপস্থাপন করা হলো। তিনি যেটিকে গ্রহণ করে নেবেন, প্রতীয়মান হবে তিনি ঐটিকেই অধিক উপযুক্ত, কল্যাণময়, দক্ষ ও যোগ্য বিধান হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং বাস্তব কাজের দ্বারা শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করলেন। এখন যদি তিনি আল্লাহ্র বিধানকে গ্রহণ করে নেন, তবে আল্লাহ্র বিধানকে শ্রেষ্ঠ বলে গ্রহণ করলেন এবং আল্লাহ্কেই বাস্তবে শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা দিলেন। আর যদি মানুষের রচিত বিধানকে গ্রহণ করে নেন, তবে সেই মানব রচিত বিধানকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃতি দিলেন এবং প্রকারান্তরে আল্লাহ্কে মানুষের তুলনায় ছোট ও অযোগ্য (নাউযুবিল্লাহ) জ্ঞান করে মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা দিলেন। ফলে ঐ নামাজি একটু পূর্বে সালাতে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্কে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে যে ঘোষণা দিয়ে এসেছে, তা একটি প্রতারণামূলক মিথ্যা ঘোষণা ছাড়া আর কিছু নয়। তিনি সালাতে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্কে শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা দিলেন আর বাইরে এসে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে মানুষকে শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা দিলেন। অতএব তার এ ঘোষণা আল্লাহ্র কাছে কতোটুকু গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত, তা সহজে অনুমেয়। যারা মানব রচিত আইন-বিধান, মতবাদ প্রণয়ন করেন, প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করেন, এ সকল বিধান সংরক্ষণ করেন এবং এ সকল বিধানের প্রণয়নকারী, প্রতিষ্ঠাকারী ও সংরক্ষণকারী ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দলের সাথে অংশগ্রহণ

করেন ও সমর্থন করেন, তারা দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে অসংখ্যবার আল্লাহ্কে শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা দেয়া সত্ত্বেও বাস্তবে এসে মানুষকে শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা প্রদান করেন। অতএব তাদের সালাত কি আল্লাহ্র নিকট গ্রহণযোগ্য হবে? তারা কি নিজেদেরকে মুসলমান দাবি করতে পারেন? কখনো নয়, বরং তারা আল্লাহ্র কাছে মিথ্যাবাদী বলে সাব্যস্ত হবেন, এটাই স্বাভাবিক।

কেননা, আল্লাহ্ বলেন:

اِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ ۘ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ ؕ وَ اللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ ۚ ۱

মুনাফিকরা আপনার কাছে এসে বলে- আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ জানেন যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। -সূরা আল মুনাফিক্বুন-১

এখানে মুনাফিকদের এ কথা সত্য ছিল যে, মুহাম্মদ সা. আল্লাহ্র রাসূল, কিন্তু মুনাফিকরা প্রকৃতপক্ষে এ সত্যটি বিশ্বাস করতো না। আর মুনাফিকরা এ সত্যটি বিশ্বাস না করা সত্ত্বেও এরূপ ঘোষণা দেয়ায় তারা মিথ্যাবাদী।

এখন চিন্তা করুন, যারা সেক্যুলার রাজনীতির সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত এবং নের্তৃত্ব দিচ্ছেন, তারা নিশ্চয় জানেন রাষ্ট্র পরিচালনার আল্লাহ্ মনোনীত একমাত্র ব্যবস্থা হলো ইসলাম। কিন্তু তারা রাষ্ট্র পরিচালনায় ইসলামী বিধিবিধান গ্রহণ করছেন না, তার পরিবর্তে বিদ্যমান মানুষ্য আইনকে অনুসরণ করছেন অথবা নিজেরা ইসলামী বিধানকে গ্রহণ না করে নিজেদের ইচ্ছা মাফিক আইন-বিধান ও পরিচালনার নীতি তৈরি করে নিচ্ছেন এবং দেশের মানুষের উপর তা চাপিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু কেন? তাদের এ কার্যক্রম কিন্তু এটাই নির্দেশ করে তাদের বিবেচনায় আল্লাহ্ মনোনীত ইসলাম অপেক্ষা তাদের সিদ্ধান্ত অধিক উপযুক্ত, উন্নত, শ্রেষ্ঠ ও যুগোপযোগী।

ছানা পাঠ : আমরা উপরোক্ত 'আল্লাহু আকবার' শব্দটি উচ্চারণের পর আল্লাহ্র সম্মুখে দন্ডায়মান হয়ে হাত বাঁধি, তাকে বলা হয় তাকবীরে তাহরীমা। যার পর দুনিয়ার সবকিছু হতে সালাতরত ব্যক্তিটি সম্পূর্ণ অবসর হয়ে একমাত্র আল্লাহ্র সাথে সংযোগ স্থাপন করেন। এ পর্যায়ে মানুষ তাঁর মহান প্রভুর সামনে দাঁড়িয়ে আরও কিছু ঘোষণা দেয় যা নিম্নরূপ–

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ

'হে আল্লাহ্!আপনি অতিশয় পবিত্র, আপনার জন্য যাবতীয় প্রশংসা! আপনার নাম পবিত্র, বরকতময়। আপনি মহান! আপনি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই।'

এখন চিন্তা করে দেখুন, এ কথার মাধ্যমে আমরা কী কী ঘোষণা দিয়ে থাকি। সালাতের এ পর্যায়ে এসে আমরা স্বয়ং আল্লাহ্র সম্মুখে দাঁড়িয়ে যে ঘোষণাসমূহ দিয়ে থাকি তা হলো-

(১) আল্লাহ্ অতিশয় পবিত্র।
(২) সকল প্রশংসার অধিকারী একমাত্র তিনি।
(৩) আল্লাহ্র নাম পবিত্র এবং বরকতময়
(৪) তিনিই মহান।
(৫) তিনি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই।

উপরোক্ত ঘোষণার সাথে যদি আমাদের বিশ্বাসের মিল থাকে, তবে আমাদের সালাতের স্বার্থকতা থাকতে পারে, অন্যথায় এ সালাতের কোনো মূল্য আল্লাহ্র কাছে থাকার কথা নয়। আল্লাহ্ কেন, আপনি আপনার পিতার সামনে দাঁড়িয়েও যদি তাকে জ্ঞানী, প্রজ্ঞাবান, ন্যায়ানুগ ও অনুস্মরণীয় বলে আখ্যা দেন, আর তার সাক্ষাৎ সমাপ্তির সাথে সাথেই তার আদেশ উপদেশ অমান্য করতে থাকেন এবং নিজের খেয়াল খুশিমতো চলতে থাকেন, তবে আপনি যতই এ ধরনের প্রশংসাসূচক উক্তি করেন না কেন, এ সকল উক্তি আপনার বিশ্বাসের প্রতিধ্বনি বলে স্বীকৃত হবে না। আর আপনি এ সকল কথা বলে আপনার পিতাকে যতই রাজি বা খুশি করার চেষ্টা চালান না কেন এর কোনো প্রভাব আপনার পিতার উপর পড়বে না। বরং তিনি খুব বিরক্ত হবেন। সুতরাং, স্বয়ং আল্লাহ্র সামনে সালাতে দাঁড়িয়ে যদি এমন কোনো প্রশংসা করেন, যা সালাত শেষে আপনার চলন-বলন বা আপনার কাজের দ্বারা আপনার বিশ্বাসের প্রতিধ্বনি বলে মনে হয় না, তবে সেই সালাত কীভাবে আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য হবে, আর কীভাবেইবা তার মাধ্যমে পরকালীন মুক্তি আশা করা যায়? ছানা পড়ার মাধ্যমে যে ঘোষণা দেয়া হয়, তার মর্মার্থ উপলব্ধি করে সে অনুসারে বাস্তব আমল ঢেলে সাজাতে পারলে সালাত কবুল হতে পারে। নিচে ছানার মধ্যে প্রদত্ত ঘোষণাসমূহের মর্মার্থ আলোচনা করে এর সাথে রাজনৈতিক বিশ্বাস ও বাস্তব কাজ-কর্মের সঙ্গতি বা অসঙ্গতির দিকে যৎসামান্য ইঙ্গিত দেয়া হলো-

আল্লাহ্ অতিশয় পবিত্র : আল্লাহ্র পবিত্র হওয়ার অর্থ হলো সব রকম মন্দ বৈশিষ্ট্য হতে পবিত্র হওয়া। আল্লাহ্ তাআ'লার পবিত্র সত্ত্বা কোনো প্রকার দোষ-ত্রুটি অথবা অপূর্ণতা কিংবা কোনো মন্দ বৈশিষ্ট্যের অনেক উর্ধ্বে। বরং তা এক অতি পবিত্র

সত্ত্বা, যার মন্দ হওয়ার ধারণাও করা যায় না। এখানে এ কথাটি ভালোভাবে উপলব্ধি করতে হবে যে, পবিত্রতা প্রকৃতপক্ষে সার্বভৌমত্বের প্রাথমিক অপরিহার্য বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত। যে সত্ত্বা দুষ্ট, দুশ্চরিত্র এবং বদনিয়ত পোষণকারী, যার মধ্যে মানব চরিত্রের মন্দ বৈশিষ্ট্যসমূহ বিদ্যমান এবং যার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভে অধীনস্তরা কল্যাণ লাভের প্রত্যাশী হওয়ার পরিবর্তে অকল্যাণের ভয়ে ভীত হয়ে উঠে এমন সত্ত্বা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে, এটা মানুষের স্বাভাবিক বিবেক বুদ্ধি ও স্বভাব প্রকৃতি মেনে নিতে অস্বীকার করে। এ কারণে মানুষ যাকে সার্বভৌম ক্ষমতার আধার বলে স্বীকৃতি দেয়, তার মধ্যে পবিত্রতা না থাকলেও তা আছে বলে ধরে নেয়। কারণ পবিত্রতা ছাড়া নিরঙ্কুশ ক্ষমতা অকল্পনীয়। কিন্তু এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো চূড়ান্ত ক্ষমতাধর ব্যক্তি পবিত্র নয় এবং তা হতেও পারে না। ব্যক্তিগত বাদশাহী, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা, সমাজতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি, অন্য কোনো পদ্ধতির মানবীয় সরকার যা-ই হোক না কেন কোনো অবস্থায় তার সম্পর্কে চরম পবিত্রতার ধারণা করা যেতে পারে না। -তাফহীমূল কুরআন

যারা আল্লাহ্র শাসনব্যবস্থা ব্যতীত অন্য কোনো শাসনব্যবস্থাকে গ্রহণ করে, আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব ব্যতীত জনগণ বা মানুষের সার্বভৌমত্বকে গ্রহণ করে, তারা সালাতে আল্লাহ্কে পবিত্র বলে ঘোষণা দিয়ে সালাতের বাইরে এসে মানুষকে আল্লাহ্র স্থলাভিষিক্ত করে চরম মিথ্যাচার ও মুনাফিকী করে। ফলে তার সালাত গ্রহণযোগ্য কীভাবে হতে পারে?

সকল প্রসংশার একমাত্র অধিকারী : আল্লাহ্ তাআ'লা সকল প্রশংসার একমাত্র অধিকারী হওয়ার বিষয়টি পরবর্তীতে সূরা ফাতিহায় আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ্।

আল্লাহ্র নামসমূহ পবিত্র ও বরকতময় : আমরা ছানার মধ্যে এও ঘোষণা দিয়ে থাকি যে, আল্লাহ্র নামসমূহ পবিত্র এবং বরকতময়। আল্লাহ্র নাম বলতে আল্লাহ্র গুণবাচক নামসমূহকে বুঝানো হয়েছে। আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি মহান আল্লাহ্র প্রায় ৯৯টি গুণবাচক নাম রয়েছে, যা কুরআন ও হাদীসে পাওয়া যায়। এ সকল নামসমূহের মধ্য থেকে কতিপয় নামের আলোচনাও ইতিপূর্বে করা হয়েছে। এ সকল নামসমূহকে পবিত্র বলে ঘোষণা দেওয়ার অর্থ এ সকল নামের মধ্যে কোনো প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি, মিথ্যাচারিতা বা অসঙ্গতি নেই। বরং সবদিক থেকে যথার্থ। কোনো মানুষ এ সকল নামসমূহ অনুসারে তার বিশ্বাস ও কাজকর্ম সংশোধন করে নিলে বরকত বা আল্লাহ্র অনুগ্রহ লাভ করতে পারে। আর এ সকল নামসমূহ বিশ্বাস করা এবং সে অনুসারে বাস্তব কার্যাদী কিরূপ হবে, তার

সংক্ষিপ্ত আলোচনা এ পুস্তকে ইতিমধ্যে করা হয়েছে। যারা নিজেদেরকে সে অনুসারে গড়ে নিতে প্রস্তুত হবে না, অর্থাৎ প্রতিটি নামে আল্লাহ্‌র যে গুণের বর্ণনা দেয়া হয়েছে, তার প্রতি হৃদয় মন দিয়ে অনুগত হবে না, বাস্তব কাজের দ্বারা উক্ত কার্যাদীর মহত্ব ঘোষণা করবে না, তার সালাতের এরূপ ঘোষণা কেবলমাত্র মৌখিক ঘোষণা বলে ধরা হবে। যেমন- আল্লাহ্‌র একটি নাম হলো 'রব' যার অর্থ দাঁড়ায় লালন-পালনকারী, সংরক্ষণকারী, আইনদাতা, বিধানদাতা বা যিনি কোনো কিছুকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করে লালন-পালন করে পূর্ণতায় পৌঁছিয়ে দেন। সুতরাং, যারা আল্লাহ্‌র এই নামটিকে পবিত্র ও বরকতময় বলে ঘোষণা দেবে, তারা 'রব' বলতে যে অর্থ প্রকাশ করে, সে অর্থে নিজের জীবনে অন্য কাউকে কখনো গ্রহণ করবে না। যেমন- সে আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কোনো মানুষকে আইনদাতা, বিধানদাতা বা লালন পালনকারী হিসেবে গ্রহণ করে নেবে না। যদি সে বাস্তব জীবনে কাউকে এ অর্থে গ্রহণ করে, তবে সে আল্লাহ্‌র সামনে দাঁড়িয়ে যে ঘোষণা দিয়েছে, তা দ্বারা কীরূপে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি আশা করবে? তার সালাত আল্লাহ্‌র কাছে গৃহীত হওয়ার কী কারণ থাকতে পারে?

আল্লাহ্‌ই মহান : আমরা সালাতের শুরুতে আল্লাহ্‌কে আল্লাহু আকবার বা শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা দিয়েছি, যার ব্যাখ্যা ইতিমধ্যে দেয়া হয়েছে। এখানেও পুনরায় আল্লাহ্‌কে একইভাবে মহান বলে ঘোষণা দিয়েছি। অতএব বাস্তবে আল্লাহ্‌কে এই অর্থে গ্রহণ না করা হলে সালাত পড়ে কি উপকারিতা পাওয়া যেতে পারে?

আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ বা উপাস্য নেই : আমরা নামাযে ছানার মাধ্যমে ঘোষণা দিয়ে থাকি একমাত্র আল্লাহ্‌ই আমাদের ইলাহ বা উপাস্য। তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ বা উপাস্য নেই। অর্থাৎ আমাদের জীবনের কোনো ক্ষেত্রে কাউকে ইলাহ বা উপাস্য বলে গ্রহণ করি না বা করিনি এবং কখনো করবো না। আমরা এ কথার মাধ্যমে ঠিক কী প্রতিজ্ঞা করে থাকি তা এবং উক্ত প্রতিজ্ঞা রক্ষা করি কিনা তা বুঝতে হবে। যেহেতু আমরা সালাতে ঘোষণা দিয়ে থাকি একমাত্র আল্লাহ্‌ই আমাদের ইলাহ বা উপাস্য এবং তিনি ব্যতীত কাউকেও ইলাহ বা উপাস্য হিসেবে স্বীকার করি না। তাই প্রথমে জানতে হবে ইলাহ বলতে কী বুঝায়?

অভিধানে ইলাহ্‌ শব্দটির যে অর্থ দেয়া হয়েছে তা হলো- মা'বুদ, সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিযিকদাতা, আইনদাতা, ত্রাণকর্তা। অতএব আমরা নামাযে একমাত্র আল্লাহ্‌কেই মা'বুদ, সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিযিকদাতা, ত্রাণকর্তা, আইনদাতা ইত্যাদি হিসেবে ঘোষণা দিয়ে থাকি এবং অপর কাউকেও এ বিশেষণ দিতে অস্বীকার করি। এখন যদি আমরা সালাতের বাইরে এসেও একমাত্র আল্লাহ্‌কেই আইনদাতা, পালনকর্তা, রিযিকদাতা, ত্রাণকর্তা হিসেবে গ্রহণ করি, তবে আমরা

সালাতে আমাদের প্রকৃত বিশ্বাসের ঘোষণা দিলাম। আর যদি সালাতে আল্লাহ্কে এ সকল মর্যাদা দেয়ার ঘোষণা দিয়ে বাইরে এসে আল্লাহর পরিবর্তে কোনো মানুষকে উক্ত মর্যাদা দেয়া হয় যেমন, মানুষের আইন বিধানকে সাদরে গ্রহণ করে নিয়ে মানুষকে আইনদাতার মর্যাদা দেয়, নিজের খাদ্য/বস্ত্র/বাসস্থান নিশ্চিত করার জন্য আল্লাহ্র বিধানের বিপরীতে গিয়ে মানুষের উপর নির্ভর করে মানুষকে পালনকর্তা, রিযিকদাতার মর্যাদা দেয়া, বিপদ-আপদের মুখোমুখী হয়ে আল্লাহ্র পরিবর্তে ধর্মহীন মানুষের আনুগত্য কবুল করে নিয়ে মানুষের উপর নির্ভর করে তাকে ত্রাণকর্তা হিসেবে গ্রহণ করা হয়, তবে সালাতে দাঁড়িয়ে যে ঘোষণা দেয়া হলো বা প্রতিজ্ঞা করা হলো তা প্রতারণামূলক ঘোষণা বা প্রতিজ্ঞা বলে গণ্য হবে। সুতরাং, যখন কোনো ব্যক্তি স্বয়ং আল্লাহ্র সামনে দাঁড়িয়ে সালাতের মাধ্যমে আল্লাহ্র সাথে প্রতারণামূলক ঘোষণা বা প্রতিজ্ঞা করে, তার সালাত কীভাবে আল্লাহ্র নিকট গ্রহণযোগ্য হতে পারে? যদি কেউ আল্লাহ্র বিধান প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে নিজে বিধান প্রণয়ন, নিজের বিধান প্রতিষ্ঠা এবং সংরক্ষণের জন্য রাজনীতি করেন বা কাজ করেন, চেষ্টা-সাধনা করেন, সে সালাত আদায় করলেও সালাতে দাঁড়িয়ে প্রতারণামূলক প্রতিজ্ঞা করে বিধায় তার সালাত থেকে উপকারিতা পাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। সে আল্লাহ্র সামনে দাঁড়িয়ে যে প্রতিজ্ঞা করে, সে অনুসারে সালাতের বাইরে এসেও যদি কাজ করে অর্থাৎ আল্লাহ্কেই কেবলমাত্র আইনদাতা হিসেবে গ্রহণ করে নিয়ে যে কোনো মানুষ বা মানুষের ইচ্ছাধীন রাষ্ট্রব্যবস্থার আইনকে পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করে, রিজিকের ভয়ে হক কথা বলা থেকে বিরত না থেকে, সকল অবস্থায় হক কথা বলে এবং সে মতে কাজ করে এবং কোনোরূপ বিপদের কথা চিন্তা না করে একমাত্র আল্লাহ্র দিকে অনুরক্ত হয়ে থাকে, তবে সালাতের পূর্ণ সুফল পাওয়ার আশা করা যায়।

বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম : সালাতে দাঁড়িয়ে সূরা ফাতিহা ও কুরআনের অন্যান্য সূরা শুরুর প্রাক্কালে পড়া হয় 'বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম' অর্থাৎ 'পরম করুনাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু করছি'। সালাত এবং কুরআন তিলাওয়াতের বাইরেও প্রত্যেক ভালো কাজের শুরুতে এ বাক্যটি উচ্চারণ করা হয়। এ বাক্যে আল্লাহ্র দুটি গুণ প্রথমে বর্ণনা করা হয়, তিনি অসীম দয়ালু এবং পরম করুনাময়। আর এ পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে আমাদের সকল কাজ শুরু করা হয়। রাসূল সা. বলেছেন, 'যে কাজ বিসমিল্লাহ ব্যতীত আরম্ভ করা হয়, তাতে কোনো বরকত হয় না।' অতএব আমরা মনে করতে পারি, কোনো কাজে বিসমিল্লাহ বলে শুরু করলে, তাতে বরকত পাওয়া যাবে। কিন্তু যদি আল্লাহ্ নিষিদ্ধ কোনো কাজ যেমন- মানুষ খুন করা, চুরি করা, ডাকাতি করা

ইত্যাদি আল্লাহ্‌র নামে শুরু করা হয়, তবে কি তাতে বরকত আশা করা যাবে? কখনো নয়। আল্লাহ্‌র নামে কাজ শুরু করার অর্থ হলো একমাত্র আল্লাহ্‌র মনোনীত কাজসমূহ সম্পাদন করা। যদি বিসমিল্লাহ বলে মানুষকে বুঝাতে চেষ্টা করা হয়, আল্লাহ্‌ মনোনীত কাজ করা হচ্ছে, আর বাস্তবে আল্লাহ্‌র প্রতিযোগী হয়ে বা আল্লাহ্‌র সমকক্ষ হয়ে নিজেদের ইচ্ছ-পছন্দমতো আইন আল্লাহ্‌র নামে প্রণয়ন করা হয় এবং আল্লাহ্‌র ভূমিকে বা সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করে আল্লাহ্‌র নামে মানুষের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়া হয়, তবে তার চেয়ে বড় মূর্খতা, অন্যায় ও ধোকাবাজি আর কী হতে পারে।

সূরা ফাতিহা পাঠ : সূরা ফাতিহা, কুরআনুল কারীমের প্রথম পূর্ণাঙ্গ সূরা। মানবতার মুক্তির জন্য আল্লাহ্‌ যে মহাগ্রন্থ কুরআন নাজিল করেছেন, তা শুরু করা হয়েছে এই ব্যাপক অর্থবোধক সূরাটি দ্বারা। আমরা প্রত্যহ সালাতের প্রতিটি রাকাতে এই সূরাটি পড়ে থাকি। আমরা প্রতিদিন স্বয়ং আল্লাহ্‌র সামনে দাঁড়িয়ে অসংখ্যবার এ সূরায় কী বলে থাকি, তা জানা থাকা উচিত। কেননা আমরা এর মাধ্যমে যা কিছু বলে থাকি, যদি তার বিপরীত কাজ করতে থাকি, তবে এ সকল কথা আল্লাহ্‌র সাথে বলা বা সালাত পড়ার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র কোনো সহানুভূতি পাওয়ার যৌক্তিকতা থাকবে না। সুতরাং, আমাদের জানা দরকার এ সূরায় আমরা কী বলে থাকি এবং যা বলে থাকি বাস্তবে তা করি কিনা? এ সূরার প্রথমে যে আয়াত পড়ে থাকি তা হলো-

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

'সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌ তাআ'লার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা'।

সালাতে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দেয়া হয় জগতের যা কিছু আছে বা প্রশংসা পাওয়ার মতো যা কিছু ঘটছে তার সবকিছুর জন্য প্রশংসা পাওয়ার একমাত্র অধিকারী হলেন আল্লাহ্‌। কোনো কিছুর জন্য আল্লাহ্‌ ব্যতীত কারো কোনো প্রশংসা প্রাপ্য নয় এবং একমাত্র তিনি জগতের সবকিছুর পালনকর্তা। সালাতে আল্লাহ্‌র সামনে দাঁড়িয়ে যে ঘোষণা দৈনিক অসংখ্যবার দেয়া হয়, তার সাথে সাথে আল্লাহ্‌ ব্যতীত যে কোনো মানুষ, দেব-দেবতা বা যে কোনো সত্তার শক্তি-সামর্থ, কৃতিত্বকে অস্বীকার করা হয়। প্রকৃতপক্ষে বাস্তবতার দাবিও তা-ই। কারণ যত বড়, মহৎ বা আশ্চার্যান্বিত ও দূর্ভেদ্য কঠিন কাজ হোক না কেন, তার জন্য কোনো প্রশংসা পাওয়ার অধিকার কারোর নেই এ জন্য যে, সে নিজ ক্ষমতায় কোনো কিছু করতে সমর্থ নয়। যে বিজ্ঞানী কম্পিউটার আবিষ্কার করেছেন, তিনি যে সকল উপাদানসমূহের সমন্বয় সাধন করে কম্পিউটার বানিয়েছেন, সে সকল উপাদানের

মধ্যে ঐ শক্তিটুকু তিনি দেননি, তা দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ্। তিনি যে মস্তিষ্ক খাটিয়ে সে সকল উপাদানসমূহের সমন্বয় সাধন করেছেন, সেই মস্তিষ্ক তিনি তৈরি করেননি, এমনকি তার উৎকর্ষতা বৃদ্ধিতেও তার কোনো হাত নেই। একইভাবে যে কোনো দিক থেকে চিন্তা করা হোক না কেন, দেখা যাবে কোনো কিছুর পেছনে এমন কোনো মানুষ বা সত্তার অবদান নেই যার জন্য সে নিরঙ্কুশ প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। বরং প্রতিটি বিষয়ের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ্র অসীম দয়া ও মহিমা, যার জন্য সকল প্রশংসা তাঁর দিকে আবর্তিত হয়। একইভাবে এ জগতের কোনো কিছুর লালন-পালন করার ক্ষমতা আল্লাহ্ ব্যতীত কারো নেই। এ সত্য কথাটি সালাতে আল্লাহ্র সামনে দাঁড়িয়ে যদি ঘোষণা দেয়া হয় এবং সালাতের বাইরে এসে তার বিপরীত ঘোষণা দেয়া হয় বা এমন কাজ করা হয়, যে কাজ বলে দেয় সেই প্রশংসা আল্লাহ্র নয়, বরং কোনো মানুষের বা আল্লাহ্র সাথে কোনো মানুষও উক্ত প্রশংসার অংশীদার তবে উক্ত সালাতের মর্যাদা আল্লাহর কাছে কী হতে পারে। আপনি যদি বিশ্বাস করেন সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্র প্রাপ্য, তবে এর অর্থ দাঁড়ায় আপনার ব্যক্তিগত, জাতীয়, সামাজিক ভাগ্যের উত্থান-পতন একমাত্র আল্লাহ্র হাতে। অতএব আপনি তখন একমাত্র আল্লাহ্র মুখাপেক্ষী হয়ে পরবেন। এ ক্ষেত্রে কারো ক্ষমতা বা দক্ষতা যাচাই করা আপনার কাজ হবে না, বরং আপনি যেহেতু আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীল, সেহেতু আপনি একমাত্র আল্লাহ্র নির্দেশ অনুসরণ করবেন। যে সকল ব্যক্তি বা দল একমাত্র আল্লাহ্র আইন অনুসারে দেশ পরিচালনা করবে আপনি কেবল তাদের সাথে থাকবেন। তাদেরকে সমর্থন করার ক্ষেত্রে আপনার বিচারের মাপকাঠি একটিই হবে- সে কতোটুকু আল্লাহ্র অনুগত। তাকে ক্ষমতায় বসিয়ে দিলে আপনার দেশ ও শাসনব্যবস্থা আল্লাহ্র ইচ্ছায় কতোটুকু পরিচালিত হবে? আপনি যখন এমন কাউকে আপনার শাসনব্যবস্থা পরিচালনার জন্য দায়িত্ব অর্পণ করলেন, যিনি আল্লাহ্র ইচ্ছার পরিবর্তে নিজের ইচ্ছায় রাষ্ট্র পরিচালনা করে, তখন আপনি তার ব্যক্তিগত দক্ষতা ও সামর্থের উপর নির্ভর করলেন। আপনি মনে করলেন ভালো বা মন্দ করার সামর্থ তার আছে। আপনি তাকে শক্তিধর মনে করলেন এবং তার শক্তি বা সামর্থের স্বীকৃতি স্বরূপ তাকে আপনার ভাগ্যের পরিবর্তনের জন্য বসিয়ে দিলেন। ফলে আপনি প্রকারান্তরে আল্লাহ্র পরিবর্তে মানুষের প্রশংসায় লিপ্ত হয়ে পড়লেন। অতএব যারা বিশ্বাস করে সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্র জন্য, আল্লাহ্ তাঁর ও জগতের সবকিছুর এককভাবে পালনকর্তা, তারা কখনো এটা মনে করতে পারে না, আল্লাহ্র নিয়মের বিপরীতে চলা কোনো ব্যক্তি দেশে শান্তি, সমৃদ্ধি বৃদ্ধিতে সমর্থ বা অমুক বস্তুর এমন কোনো ক্ষমতা আছে, যার দ্বারা কেউ উপকৃত হতে

পারে। বরং সে এতোটুকু বিশ্বাস করবে যে, একমাত্র আল্লাহ্ মানুষের শান্তি-সমৃদ্ধি উন্নত করতে পারেন। আর তাই একমাত্র আল্লাহ্র ইচ্ছায় সবকিছু পরিচালিত হওয়া উচিত। যারা নিজেরা কোনো কিছুর জন্য কোনো কৃতিত্ব দাবি করার পরিবর্তে একমাত্র আল্লাহ্র ইচ্ছায় পরিচালিত হয় এবং নিজেদেরকে নিঃস্ব মনে করে কোনো মহৎ কাজের জন্য একমাত্র আল্লাহ্র প্রশংসা করে এবং আল্লাহ্র উপর নির্ভর করে, তাদের সহযোগী হয়ে থাকবে। এর ব্যতিক্রম ক্ষেত্রে বুঝা যায় সেই ব্যক্তিটি সালাতে আল্লাহ্কে সকল প্রশংসা পাওয়ার অধিকারী বলে ঘোষণা দিলেও অন্তরে ব্যতিক্রম বিশ্বাস লালন করে। এমতাবস্থায়, তার সালাত আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ কী থাকতে পারে?

আমরা অতঃপর বলে থাকি-

الرَّحْمـنِ الرَّحِيمِ

অর্থাৎ, যিনি নিতান্ত মেহেরবান ও দয়ালু।

সূরা ফাতিহার এই দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ্র গুণ ও দয়ার প্রসঙ্গ বর্ণনা করা হয়েছে। উভয় শব্দ গুণের আধিক্যবোধক বিশেষণ। যাতে আল্লাহ্র দয়ার অসাধারণত্ব বুঝায়। এ স্থলে এ গুণের উল্লেখ সম্ভবত এজন্য যে, আল্লাহ্ তাআ'লা যে সমগ্র সৃষ্টিজগতের লালন-পালন, ভরণ-পোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং গ্রহণ করেছেন, এতে তাঁর নিজস্ব কোনো প্রয়োজন নেই বা অন্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েও নয়; বরং তাঁর রহমত বা দয়ার তাকীদে করেছেন। যদি সমগ্র সৃষ্টির অস্তিত্বও না থাকে, তাতেও তাঁর কোনো লাভ-ক্ষতি নেই, আর যদি সমগ্র সৃষ্টি অবাধ্যও হয়ে যায়, তবে তাতেও তাঁর কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই। -মারেফুল কুরআন

সূরা ফাতিহার তৃতীয় আয়াতে আমরা সালাতে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্কে বলে থাকি-

مَـالِكِ يَوْمِ الدِّينِ

'যিনি বিচার দিনের মালিক'

অর্থাৎ, আল্লাহ্ বিচার দিনের একমাত্র মালিক। এ কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ। এ আয়াতের মর্মার্থ এবং আমরা কী করছি পক্ষান্তরে আয়াতের মর্মার্থ অনুসারে আমাদের কী করা উচিত, তা বুঝে নেয়া জরুরি।

'মালিকি' এর অর্থ কোনো বস্তুর উপর এমন অধিকার থাকা, যাকে ব্যবহার, রদবদল, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সবকিছু করার সকল অধিকার থাকবে।دِّينِ অর্থ প্রতিদান দেয়া। مَـالِكِ يَوْمِ الدِّينِ এর শাব্দিক অর্থ প্রতিদান দিবসের মালিক বা অধিপতি। অর্থাৎ, প্রতিদান দিবসের অধিকার ও আধিপত্য কোনো বস্তুর উপরে হবে তার কোনো বর্ণনা দেয়া হয়নি। তাফসীরে কাশশাফে বলা হয়েছে যে, এতে

'আম' বা অর্থের ব্যাপকতার প্রতি ইশারা করা হয়েছে। অর্থাৎ, প্রতিদান দিবসে সকল সৃষ্টিরাজি ও সকল বিষয় আল্লাহ্ তায়ালার অধিকারে থাকবে। -মা'রেফুল কুরআন

'তিনি প্রতিদান দিবসের মালিক' -বাক্যটি আখিরাত বিশ্বাসের কথা বলে দেয়। কেননা আখিরাত বিশ্বাস মানুষের জীবনে সুদূর প্রসারী ফলাফল নির্ণয় করে। 'মালিক' পূর্ণ বিজয় ও মালিকানার অর্থে ব্যবহৃত হয়, 'ইয়াওমিদ্দীন' অর্থ প্রতিদানের দিন।

মুহাম্মদ সা. এর আগমনের পূর্বে এমন বহুলোক বর্তমান ছিল, যারা এক মাবুদের উপর বিশ্বাস করতো এবং তিনি যে সমগ্র কায়েনাতের স্রষ্টা তাও তারা মানতো, কিন্তু তারা প্রতিদানের দিবসে বিশ্বাস করতো না। তাই কুরআন এদের ব্যাপারে বলছে, 'যদি তুমি এদের জিজ্ঞেস করো যে, আসমান জমীন কে বানিয়েছেন, তাহলে তারা বলবে আল্লাহ্ তা'আলা বানিয়েছেন।

কুরআন এদের ব্যাপারে আরো বলছে, তারা এ ব্যাপারটিতে আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেছে যে, তাদের কাছে তাদের মধ্য থেকে একজন লোক এসেছে, যে তাদের ভয় দেখাচ্ছে। অতএব কাফেররা বলছে, এতো ভারি আশ্চার্যের কথা। যখন আমরা মরে যাবো, মাটি হয়ে যাবো তখন আমরা আবার জীবিত হয়ে যাব কীভাবে?

প্রতিদান দিবসে বিশ্বাস স্থাপন ইসলামী আকীদার এমন একটি মৌলিক বিশ্বাস, যার মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি আখেরাতের জগত পর্যন্ত বুলন্দ হয়ে যায়। তখন সে আর শুধু বৈষয়িক প্রয়োজনসমূহের গোলাম হয়ে বসে থাকে না, বরং সে নিজে এ প্রয়োজনসমূহের উপর বিজয়লাভে সমর্থ হয় এবং এই দুনিয়ার সংক্ষিপ্ত জীবনে নিজের চেষ্টা সাধনার বিনিময় ও ফলাফলের চিন্তায় লেগে থাকার বদলে আল্লাহ্ তাআলার উপর পুরোপুরি ভরসা ও বিশ্বাস স্থাপন করে যে, তিনি দুনিয়া ও আখিরাতের যেখানে চাইবেন, তার কর্মের ফলাফল দান করবেন। আর এই বিশ্বাস একবার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে মানুষ নিজের ইচ্ছা ও আগ্রহের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যায় এবং দুনিয়াবী পরিমাপক যন্ত্র ও চিন্তা ছেড়ে দিয়ে মহান আসমানী মূল্যবোধের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে, যা সত্যিকার অর্থে একটি মর্যাদার ব্যাপার।

যতক্ষণ পর্যন্ত এই প্রতিদান দিবসের উপর মানুষের বিশ্বাস পূর্ণাঙ্গ ও অটুট না হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তার অন্তরে এই সত্যটি প্রতিষ্ঠিত না হবে যে, দুনিয়ার প্রতিফলের উপর প্রতিদানকার্য সমাপ্ত হয়ে যায় না, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতিটি ব্যক্তি এ কথাটি জেনে না নেবে যে, এই বৈষয়িক দুনিয়া ছাড়াও আরেকটি জীবন আছে, যার জন্য তার চেষ্টা সংগ্রাম করা দরকার এবং তাকে সত্য ও কল্যাণের জন্য ত্যাগ

ও স্বার্থপরতার উর্ধ্বে উঠে কাজ করতে হবে, যেন আখিরাতের কল্যাণ সে লাভ করতে পারে, ততক্ষণ পর্যন্ত মানবতা আল্লাহ্ তাআলার প্রদর্শিত 'সীরাতুল মুস্তাকিমের' পথে ধাবিত হতে পারে না। আখিরাতের উপর বিশ্বাসস্থাপনকারী আর আখিরাতে অবিশ্বাসী ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে দুটি স্বতন্ত্র সৃষ্টি। তাদের চিন্তাধারা, তাদের চরিত্র, তাদের কর্মধারা, তাদের জীবন প্রণালীতে কোনো অবস্থায় কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। এদের উভয়ের মাঝে দুনিয়াতেও কোনো সামঞ্জস্য নেই ও আখিরাতে এদের প্রতিদান একই ধরনের হবে না। -(ফি যিলালিল কুরআন)

যে ব্যক্তি বিচার দিবসে বিশ্বাসী হবে, তার চলনে-বলনে, কাজ-কর্মে সে বিশ্বাসের ছাপ পরিলক্ষিত হবে। সে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে নিজের ইচ্ছা আগ্রহ ত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহ্ মনোনীত পথে পরিচালিত হবে। আর যে ব্যক্তি অন্তরে বিচার দিবস বিশ্বাস করে না, কেবল তার পক্ষে সম্ভব ইসলামী জীবন বিধানের প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন করে নিজের বা আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কারো ইচ্ছা বা আইন বিধান মতে পরিচালিত হওয়া। অতএব কোনো মানুষের কাজ-কর্ম যদি বলে দেয় সে বিচার দিবসে বিশ্বাসী নয়, তবে সে যদি দৈনিক এক হাজার বারও সালাতে আল্লাহ্র সামনে দাঁড়িয়ে এ আয়াতটি আবৃত্তি করতে থাকে, তবে তা আল্লাহ্র কাছে একটি বারের জন্যও গ্রহণযোগ্য হবে কিনা, তা বুঝতে পারা খুব কঠিন কিছু নয়।

আমরা সালাতে দাঁড়িয়ে অত:পর আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে যা বলি তা হলো-

يَّاكَ نَعْبُدُ و إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

'আমরা তোমারই বন্দেগী করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই।'

সূরা ফাতিহার এ আয়াতের মাধ্যমে আমরা আল্লাহ্কে কী বলে থাকি এবং আমরা তা করি কিনা, নাকি আল্লাহ্র সামনে দাঁড়িয়ে মিথ্যা কথা বলছি তা পর্যালোচনা করে দেখতে হবে।

আরবী ভাষায় 'ইবাদত' শব্দটি তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

(ক) পূজা উপাসনা করা

(খ) আনুগত্য ও আদেশানুবর্তিতা এবং

(গ) দাসত্ব ও গোলামী।

এখানে একই সময় এই তিনটি অর্থেই ইহা ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আমরা তোমারই পূজারী, তোমারই অনুগত ও আদেশানুবর্তী এবং দাস ও গোলাম। তোমার সাথে আমাদের যে কেবলমাত্র এটুকু সম্পর্ক আছে, তা-ই নয়, বরং প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আমাদের এই সম্পর্ক ও সম্বন্ধ একমাত্র তোমার সাথে, অপর

কারো সাথে আদৌ নয়। এই তিনটি দিকের কোনো একটি দিক দিয়েও অন্য কেউ আমাদের মাবুদ নয়, এই সকল দিক দিয়ে একমাত্র তুমি আমাদের মাবুদ, পূজা উপাসনার, আনুগত্য ও দাসত্ব পাওয়ার তুমিই যোগ্য ও অধিকারী।

-তাফহীমূল কুরআন

এটি এক বিশ্বাসের অংশ, যা এই সূরায় বর্ণিত আগের অংশসমূহের অপরিহার্য পরিণাম। এই বাক্যটি দুনিয়ার সবধরনের গোলামী থেকে পূর্ণ স্বাধীনতা এবং মানুষের সার্বিক ইবাদতের রাস্তাসমূহকে আলাদা আলাদা করে মানবতার পরিপূর্ণ আযাদীর ঘোষণা দেয় যে, আজ মানুষ আর কারো অধীন নয়। অন্ধ বিশ্বাস থেকে যে স্বাধীন, পঁচা দুর্গন্ধময় ব্যবস্থাপনার বন্দিদশা থেকে স্বাধীন, আজ সে স্বাধীন যাবতীয় সামাজিক খোদাহীন নিয়ম-নীতির বন্ধন থেকে। এখন সে শুধু আল্লাহ্‌র গোলামী করে এবং শুধু আল্লাহ্‌র সাহায্য চায়। এখন আর মানবতাকে মানুষের তৈরি করা বিধি-বিধান, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান এবং ব্যক্তি বিশেষের আনুগত্যের প্রয়োজন নেই। এখন মানুষের অন্ধ বিশ্বাসের পূজা করারও কোনো দরকার নেই।-ফী যিলালিল কুরআন

সালাতে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌কে বলা হয় আমরা মানুষের তৈরি করা নিয়ম-নীতি মানি না, আমরা কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র আদেশ নিয়ম-নীতির অনুসরণ করে থাকি। কিন্তু বাস্তবে যদি বিষয়টা এমন হয় যে, সালাতে প্রতিনিয়ত একই কথা বলা হয় ঠিকই কিন্তু বাস্তব জীবনে এসে এমন একটি রাষ্ট্রের আনুগত্য সন্তুষ্ট চিত্তে করা হয়, যার সংবিধান, আইন-কানুন কতিপয় মানুষ নিজের বুদ্ধি-বিবেচনার উপর নির্ভর করে তৈরি করেছে বা এমন কোনো দলের অন্তর্ভুক্ত থাকে বা আনুগত্য করে, যে দল এই মানব রচিত আইনকে লালন-পালন করে এবং প্রয়োজনে আরও নতুন আইন নিজেদের ইচ্ছা-পছন্দমতো তৈরি করে রাষ্ট্র পরিচালনায় ইচ্ছুক, তবে কি নামাজে আল্লাহ্‌কে যা বলা হয়েছে তা সত্য বলে পরিগণিত হবে? কখনো নয়, বাস্তবে যা করা হচ্ছে না, আল্লাহ্‌র সামনে দাঁড়িয়ে তা করা হচ্ছে বললে তা মিথ্যা বলা হবে। সুতরাং, যে সালাতে দাঁড়িয়ে মিথ্যা কথা বলা হয়, সে সালাতের শুভ ফল কি আশা করা যায়?

এই আয়াতের দ্বিতীয় অংশে আমরা বলেছি 'আমরা একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।'

অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! কেবল ইবাদতের দিক দিয়েই তোমার সাথে আমাদের সম্পর্ক নয়, বরং সাহায্য প্রার্থনার সম্পর্কও একমাত্র তোমারই সাথে। আমরা নিঃসন্দেহে জানি ও বিশ্বাস করি যে, সমগ্র বিশ্বলোকের রব্ব তুমিই। সমগ্র শক্তি ক্ষমতা তোমারই, সমগ্র নিয়ামত দ্রব্য-সামগ্রির তুমিই একমাত্র মালিক। এজন্যই আমাদের প্রয়োজনের ব্যাপারে আমরা সর্বতোভাবে কেবল তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করি, কেবল তোমারই সাহায্যের উপর ভরসা রাখি, তোমারই সামনে আমাদের প্রার্থনার হাত প্রসারিত হয়। এই জন্যই আমাদের এই আবেদন নিয়ে একমাত্র তোমার দরবারে আমরা উপস্থিত হয়েছি। -তাফহীমূল কুরআন

এখন কেউ সালাতে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রতিটি বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দেয়, আর বাস্তবে নিজের প্রয়োজনটুকু পূরণের জন্য (ইসলামী হুকুমাত কায়েমের পরিপন্থী হওয়া সত্ত্বেও) রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলাম বিদ্বেষী কোনো ধনাঢ্য রাষ্ট্রের কাছে এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে কোনো ক্ষমতাধর, বিত্তশালী ইসলাম বিদ্বেষী ব্যক্তির কাছে সাহায্যপ্রার্থী হয়ে নিজের জন্য ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের পথকে সংকুচিত করে ফেলে, তবে কি তা সালাতে দাঁড়িয়ে দেয়া প্রতিশ্রুতির পরিপন্থী হবে না?

অতঃপর আমরা সালাতে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে বলি-

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

'আমাদের সরল সঠিক পথ দেখাও।'

আমরা আমাদের জরা-জীর্ণতা, অদক্ষতা, সীমাবদ্ধ জ্ঞানের কারণে নিজের পক্ষে সহজ ও সঠিক পথ রচনার অক্ষমতাকে আল্লাহ্র কাছে প্রকাশ করে সেই পথটি আমাদেরকে বলে দেয়ার জন্য আবেদন করি। আসলেও কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় নিজের জন্য একটি সঠিক পথ তৈরি করা। কারণ মানুষ ভবিষ্যত সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সে ভবিষ্যত সম্পর্কে কিছু ধারণা করতে পারে মাত্র, যার অধিকাংশ ভবিষ্যতে ভ্রান্ত বলে বিবেচিত হতে পারে। আর এ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে একটি সঠিক কর্মপন্থা স্থির করা বা চলার একটি পথ রচনা করা মোটেও সম্ভব নয়। অপরদিকে তিনটি কালের সবকিছু আল্লাহ্র পূর্ণ জানা আছে, আর তাই কোনো পথে চললে মানুষ সফলতার শীর্ষে পৌঁছে যাবে তা কেবল

তিনিই জানেন। আর তাই তাঁর কাছে আমাদের আবেদন তিনিই যেন আমাদেরকে সঠিক পথটি বলে দেন। এ পথের ব্যাপ্তি কোনো সীমাবদ্ধ বিষয়ে নয়। এ পথের ব্যাপ্তি একটি মানুষের দোলনা হতে কবর পর্যন্ত। একটি মানুষের জীবনের প্রতিটি দিক, প্রতিটি বিষয় ও প্রতিটি পদক্ষেপ কীভাবে হবে, এ পথের মধ্যে তার একটি সুনিপুণ নির্দেশনা থাকবে। একজন মানুষ সাধারণ বুদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ার পর এ পথে পা রাখলে এবং এই সোজা পথ হতে এদিক সেদিক ছুটাছুটি না করে একই পথ ধরে কবর পর্যন্ত পৌঁছে গেলে, সে ইহজগত এবং পরজগতের সর্বত্র সফলতা অর্জন করতে পারলো। আমরা সালাতে দাঁড়িয়ে এমন একটি পরিপূর্ণ পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করার সাথে সাথে আল্লাহ্ আমাদেরকে পরবর্তী আয়াতে সেই আকাঙ্খিত পথটির সন্ধান দিয়ে দিলেন। আমাদের এই প্রার্থনা যদি অন্তরের অন্তঃস্থল হতে এসে থাকে তবে সেই পথের সন্ধান পাওয়ার পর অন্য কোনো পথের তালাশ করা/খোঁজ করার কথা নয়। আমরা সেই পথের সন্ধান পাওয়ার পরও যদি ভিন্ন কোনো পথের সন্ধান করি তবে প্রতীয়মান হবে আমাদের সেই চাওয়া আন্তরিকতাপূর্ণ ও বিশ্বাস সমৃদ্ধ ছিল না। এখন আমরা দৃষ্টি দেব, আল্লাহ্ আমাদেরকে কোন পথ দেখিয়েছেন তার দিকে। পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে–

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ ۷ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّآلِّيْنَ ۧ ۷

‘তাঁদের পথ, যাদের উপর তুমি অনুগ্রহ করেছো। তাদের পথ নয় যাদের উপর তুমি অভিশাপ দিয়েছো এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে।’

অতএব, আমাদের জন্য সরল ও সঠিক পথ হলো সেই পথ, যে পথে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ প্রাপ্তগণ চলেছেন। এ পথে চললে আমাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী সাফল্য। আর ধ্বংসের পথ হলো সেটি, যে পথে আল্লাহ্‌র অভিশাপ প্রাপ্তরা চলেছে এবং পথভ্রষ্ট হয়েছে। আমাদেরকে জানতে হবে, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ প্রাপ্ত কারা এবং আমরা তাঁদের পথে চলছি কিনা, নাকি অভিশপ্ত, ভ্রান্তদের পথ অনুসরণ করে তাদের মতো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছি। কারা অনুগ্রহ প্রাপ্ত এবং কারা অভিশপ্ত তাদেরকে চেনা এবং অনুগ্রহ প্রাপ্তদের পথ অনুসরণ করা, অভিশপ্তদের ও পথভ্রষ্টদের পথ পরিত্যাগ করতে পারার মধ্যে রয়েছে সফলতা। বিপরীত ক্ষেত্রে রয়েছে নিশ্চিত

ব্যর্থতা। তাই এ বিষয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন। কারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ প্রাপ্ত, তা আমরা কুরআনুল কারীম হতেও জানতে পারি। আল্লাহ্ বলেন–

وَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَ الشُّهَدَآءِ وَ الصّٰلِحِيْنَ ۚ وَ حَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ۝٦٩

'যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, সে সেই সব লোকের সঙ্গী হবে যাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা নিয়ামত দান করেছেন, তাঁরা হচ্ছেন আম্বিয়া, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিগণ, আর তাদের সান্নিধ্যই হলো উত্তম।' -সূরা আন নিসা: ৬৯

তাফসীরে ইবনে কাসীরে সূরা ফাতিহার উপরোক্ত আয়াত সম্পর্কে বলা হয়েছে 'আমাদেরকে সরল পথ দেখাও–যাদেরকে বিশেষ দানে বিভূষিত করেছ, সেই নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ ও অন্য নেককারগণের পথ–তাঁরাই হিদায়াতপ্রাপ্ত, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অনুগত এবং আল্লাহ্ তাআলার বিধি-নিষেধ পালনকারী, যারা অভিশপ্ত তাদের পথে নয়। অভিশপ্ত কারা? যারা সত্যকে জেনে বুঝে এবং চিনেও তা প্রত্যাখ্যান করেছে, তারাই অভিশপ্ত। সত্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা নয়, বরং সত্যের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা হচ্ছে তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। কারা পথভ্রষ্ট? যারা অজ্ঞতার কারণে সত্যভ্রষ্ট ও সত্য হতে বিচ্যুত তারাই পথভ্রষ্ট। সত্য বিদ্বেষ নয়, বরং সত্যের প্রতি অনীহা হচ্ছে তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

সুতরাং, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ প্রাপ্ত বান্দাহগণ হলেন নবী-রাসূলগণ, সিদ্দীক, শহীদ, সালেহীনগণ আর অভিশপ্ত হলো, যারা জেনে বুঝে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল সা. এর বিরুদ্ধাচরণ করেছে আর যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সা. এর ব্যাপারে অনীহা প্রদর্শনের কারণে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সা. কে পরিপূর্ণরূপে না চেনার কারণে ভিন্ন পথে পরিচালিত হয়ে ভ্রান্ততায় ডুবে ছিল। এখন তাদেরকে এবং তাদের পথকে ভালো করে চিনে নিয়ে সে মতে নিজের অবস্থা জেনে নিতে হবে যে, নিজেরা আসলে কোন পথে আছে?

নবী ও রাসূল

নবী-রাসূল হলেন তাঁরা, যারা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হয়ে মানুষের হিদায়াতের জন্য মানুষের কাছে আল্লাহ্‌র বাণী পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁরা আল্লাহ্‌কে অধিক চেনেন ও জানেন। ফলে তাঁরা আল্লাহ্‌র অধিক আনুগত্য করেছেন এবং তাঁরাই হলেন আল্লাহ্‌র সবচেয়ে বেশি অনুগ্রহ প্রাপ্ত এবং নিকটতম।

সিদ্দীক এর সংজ্ঞা

দ্বিতীয় স্তর হলো সিদ্দিকীনের। আর সিদ্দীক হলেন সে সমস্ত লোক যারা, মারেফাত বা আল্লাহ্ তা'আলার পরিচয় লাভের ক্ষেত্রে নবীগণের কাছাকাছি। এর উদাহরণ হলো এই যে, কোনো লোক যেন কোনো বস্তুকে দূর থেকে অবলোকন করছেন। আলী রা. এর নিকট কোনো এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন যে, আপনি কি আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখেছেন? তিনি বলেছিলেন,'আমি এমন কিছুর ইবাদত করতে পারি না, যা আমি দেখিনি।' অত:পর আরো বলেন, 'আল্লাহ্কে মানুষ স্বচক্ষে দেখেনি সত্য, কিন্তু মানুষের অন্তর ঈমানের আলোকে তাঁকে উপলব্ধি করে নেয়।' -মা'রেফুল কুরআন

আল্লাহ্র দরবারে মকবুল লোকদের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তর হলো নবীগণের। অত:পর নবীগণের উম্মতের মধ্যে যারা সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী, তাঁরা হলেন সিদ্দীক। যাদের মধ্যে রুহানী কামালিয়াত ও পরিপূর্ণতা রয়েছে, সাধারণ ভাষায় তাঁদেরকে আউলিয়া বলা হয়। আর যারা দ্বীনের প্রয়োজনে স্বীয় জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করেছেন, তাঁদেরকে বলা হয় শহীদ। আর সালেহীন হচ্ছেন যাঁরা ওয়াজিব মুস্তাহাব প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে শরীয়তের পুরোপুরি অনুসরণ ও আমলকারী।

-মা'রেফুল কুরআন

বিষয়টিকে আরও সহজ করে উপস্থাপনের জন্য আমরা আল্লাহ্র এ সকল অনুগ্রহ প্রাপ্ত বান্দাহ্গণের বাস্তব কার্যাদী সংক্ষেপে আলোচনা করবো। পাশাপাশি অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্টদের মধ্য থেকে কয়েক জনের কৃতকর্ম আলোচনা করবো।

আল্লাহ্র সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ প্রাপ্ত বান্দাহ হলেন আমাদের পথপ্রদর্শক, আমাদের আদর্শ, আল্লাহ্র প্রিয় হাবীব মুহাম্মদ মুস্তফা সা.। মানবতার মুক্তির এই মহান দূত যে পথে চালিত হয়েছেন এবং আমাদেরকে যে পথ দেখিয়ে গেছেন সে পথই হলো আমাদের মুক্তির পথ। মানবতার এ মহান দূত তাঁর নবুওয়াতী জিন্দেগীর ২৩টি বছর সীমাহীন পরিশ্রমের মাধ্যমে দুনিয়া থেকে মানব রচিত সকল বিধি-বিধান, সামাজিক রীতি-নীতি, কুসংস্কারাচ্ছন্ন আচার-অনুষ্ঠানের পরিণাম সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার মাধ্যমে একমাত্র আল্লাহ্র দ্বীন প্রতিষ্ঠা করে দেখিয়ে গেছেন। এ কাজ করতে গিয়ে তিনি শারীরিক নির্যাতন সহ্য করেছেন, মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করেছেন, অবরুদ্ধ থেকেছেন, অভূক্ত থেকেছেন, প্রিয় মাতৃভূমি ত্যাগ করেছেন। সুতরাং, আমরা যারা সালাতে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্র কাছে একটি সরল পথের আবেদন করছি, তাদের এই আবেদন যদি আন্তরিকতাপূর্ণ হয়ে থাকে, তবে তিনি আল্লাহ্র হাবীব প্রদর্শিত পথে পরিচালিত হয়ে তাঁর জন্মভূমি তথা পৃথিবী হতে মানব রচিত সকল মতবাদ, সামাজিক রীতি-নীতির পরিবর্তনের

মাধ্যমে আল্লাহ্‌র রাজ কায়েমে সচেষ্ট হবেন। আর যিনি এ কাজটি করতে আগ্রহী হবেন না, বুঝতে হবে তার সেই আবেদনটি ছিল নেহায়েত আনুষ্ঠানিকতাপূর্ণ। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ প্রাপ্ত বান্দাহদের আরও একজন হলেন আবূ বকর সিদ্দীক রা.। রাসূল সা. যে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করে রেখে গিয়েছিলেন, সেই রাষ্ট্রব্যবস্থাকে তিনি সমগ্র শক্তি সামর্থ ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে সংরক্ষণ করেছিলেন। তাঁর জীবদ্দশায় ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় আল্লাহ্‌র আইনের পরিপন্থী একটি বিধানকেও তিনি বরদাশত করেননি। তিনি তাঁর রাষ্ট্রব্যবস্থায় এমন কাউকেও মুসলমান মনে করেননি, যে আল্লাহ্‌র কোনো একটি বিধান পালনেও অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে। আবূ বকর সিদ্দীক রা. এর খিলাফতের সময়ে মুসলমানদের একটি দল, যারা সালাত আদায় করতো, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে সা. স্বীকার করতো, রোযা রাখতো, কেবল যাকাত দিতে অস্বীকার করে; আবূ বকর রা. এ দলটির বিরুদ্ধে দৃপ্ত ভাষায় ঘোষণা করেন, আল্লাহ্‌র শপথ রাসূল সা. এর জীবনে যারা যাকাত দিতো, আজ যদি কেউ তার উট বাধার একটি রশিও দিতে অস্বীকার করে, তবে তার বিরুদ্ধে আমি অস্ত্র ধারণ করবো। রাসূল সা. এর সকল সাহাবী এই ঘোষণার সাথে একাত্মতা পোষণ করে ঘোষণা করলেন যে, যারা যাকাত দেবে না, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা অপরিহার্য। আর এ পথই হলো সরল ও সঠিক পথ। সুতরাং, সালাত আদায়কারী ব্যক্তিটি যদি আন্তরিকতার সাথে এই পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে আবেদন করে থাকেন, তবে যে দেশে বিবাহ আর মিরাস বন্টনের কতিপয় আইন সীমাবদ্ধ গন্ডীতে প্রতিষ্ঠিত থাকা ব্যতীত সবদিক থেকেই আল্লাহ্‌র সকল আইন উপেক্ষিত, সেই দেশে আল্লাহ্‌র আইন বাস্তবায়নের জন্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ না করে নীরবে আল্লাহ্‌দ্রোহী আইনসমূহ মেনে নিতে পারে না।

একই পথ ধরে ওমর ফারুক রা., ওসমান রা., আলী রা. ইসলামী জীবন-বিধান পরিপূর্ণরূপে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত রেখে আল্লাহ্‌র আইনের সংরক্ষণ করে গেছেন। সুতরাং, আমরা যদি তাদের অনুসৃত এ পথে না চলি, তবে বুঝতে হবে এ পথে চলার কোনো আকাঙ্খা আমাদের ছিল না এবং আদৌ নেই। সালাতে যে আবেদন করেছি, তা মোটেও আন্তরিকতাপূর্ণ নয়। সুতরাং, যা আমরা আসলে চাই না, আল্লাহ্‌র সামনে দাঁড়িয়ে তা চাই বলে ঘোষণা দেয়া আল্লাহ্‌রই সামনে মিথ্যাচারীতার নামান্তর।

আমরা যাদের পথে চলা হতে আল্লাহ্‌র কাছে পরিত্রাণ বা নিষ্কৃতি চেয়েছি, তাদের পথ হলো অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্টদের পথ। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলো ফেরাউন, নমরুদ, আবূ জাহেল, উৎবা, শাইবা প্রমূখ আর দল বা গোষ্ঠীগতভাবে ইয়াহুদী এবং নাসারা। এখন আমরা তাদের কৃতকর্মসমূহ

আলোচনা করবো এবং তাদের কাজের সাথে আমাদের কাজের কোনো সাদৃশ্য আছে কি নেই, তা দেখার জন্য ফেরাউনের পরিচয় এবং ফেরাউন ও তার সাঙ্গ পাঙ্গদের কার্যকলাপ আলোচনা করবো।

ফেরাউন প্রাচীন মিশরের রাজাদের উপাধি; যেমন- রোমক রাজাদের উপাধি ছিল 'কায়সার' এবং পারস্যের রাজাদের উপাধি ছিল 'কিসরা'-Encyclopedia of Islam

ফেরাউনের নাম সম্পর্কে বহু বিতর্ক দেখা যায়। মূসা আ. যার হাতে লালিত পালিত হন এবং ইসরাইলীগণ যার হাতে নির্যাতিত হয়েছিল এবং যার দাসত্ব নিড়ে আবদ্ধ ছিল, তার নাম ছিল Ramses-II। মূসা আ. যখন মাদয়ানে বাস করতেন তখন এই ফেরাউন মৃত্যুবরণ করে এবং তার পুত্র Merneptah মিশরের রাজপদে অধিষ্ঠিত হয়। এরই রাজত্বকালে মূসা আ. তার নিকট রাসূলরূপে আগমন করেন এবং এই ফেরাউনই পানিতে নিমজ্জিত হয়। কুরআনে এবং বাইবেলে এই দুই Fharaoh এর মধ্যে কারো নাম উল্লেখিত নেই। তবে বাইবেলে Remses এবং Pithom নামক দুইটি নগর Fharaoh এর আদেশে ও নির্যাতিত ইসরাইলীদের কায়িক পরিশ্রমে নির্মিত হয়েছিল, এই কথাটি উল্লেখ রয়েছে। বাইবেলের ভাষ্যকারগণের এবং মিশরবিদ (Egyptologist) পন্ডিতগণের মতামত বিশ্লেষণ করে আধুনিক যুগের গবেষকগণ এটাই স্থির করেছেন যে, মূসা ও হারুন আ. এর সাথে সম্পর্কিত এই দুই ফেরাউন হলো Ramses-II এবং তৎপুত্র ও উত্তরাধিকারী Merneptah।
-Encyclopedia of Islam

মিশরীয় ফিরাউন রাজাদের কৃতকর্মের দিকে দৃষ্টিপাত করলে তাদের অত্যাচার অবিচার আর হৃদয় বিদারক কাজ-কর্মের বর্ণনা দেখে তাদের অভিশপ্ত হওয়ার যৌক্তিকতা অনুধাবন করা যায়। ফেরাউন রাজাদের কাছে রাজ্য ক্ষমতা এতোটা মূখ্য ছিল যে, তারা এই রাজ্য ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করে রাখার জন্য হত্যা, সান্ত্রাস, নির্যাতনের চরম কঠোরতা প্রদর্শনেও সামান্যতম দ্বিধা করতো না। কথিত আছে, কোনো ব্যক্তি ফেরাউনের কাছে ভবিষ্যতবাণী করেছিল যে, ইসরাঈল বংশে এমন এক ছেলের জন্ম হবে, যার হাতে তোমার রাজ্যের পতন ঘটবে। এজন্য ফেরাউন ইসরাঈলীদের নবজাতক পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করতো। কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে–

وَ اِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَ يَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ؕ

'আর (স্মরণ করো) সেই সময়ের কথা, যখন আমি তোমাদেরকে মুক্তি দান করেছি ফেরাউনের লোকদের কবল থেকে যারা তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি দিতো; তোমাদের পুত্র সন্তানদেরকে জবাই করতো এবং তোমাদের স্ত্রীদেরকে অব্যাহতি দিতো।' -সূরা বাক্বারা: আয়াত ৪৯

ফেরাউন তার রাজত্বকে রক্ষা করার জন্যই এই একনায়কত্ব, স্বৈরতন্ত্র চালিয়েছিল। ফেরাউনী সাম্রাজ্যের পতন বলতে সম্ভবত: কেবল ব্যক্তি রাজার পতন না বুঝিয়ে ফেরাউনের পরিচালিত নীতির পরিবর্তনের মাধ্যমে ভিন্ন নীতি বা আল্লাহ্র নীতিকে প্রতিষ্ঠাই বুঝানো হয়েছে। কেননা আল্লাহ্ মূসা আ. কে ফিরাউনের নিকট এই বলে পাঠাননি যে, তুমি রাজ সিংহাসন ছেড়ে তা আমাকে দিয়ে দাও, বরং আল্লাহ্ ফেরাউনের হিদায়েতের জন্যই মূসা আ.কে তার নিকট পাঠিয়েছিলেন। আল্লাহ্ মূসা আ. কে বলেছিলেন

اِذْهَبَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ۝۴۳ فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى ۝۴۴

'তোমরা উভয়ে ফিরাউনের কাছে যাও। সে খুব উদ্ধত হয়ে গেছে। অত:পর তোমরা তাকে নম্র কথা বলো, হয়তো সে চিন্তা ভাবনা করবে অথবা ভীত হবে।' -সূরা ত্বোয়া-হা: আয়াত ৪৩-৪৪

মূসা আ. ফেরাউনকে আল্লাহ্র দ্বীন গ্রহণ করে নেয়ার, সৎপথে চলার আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং সৎপথে চলমান ব্যক্তিদের জন্য শান্তির বার্তা প্রদান করেছিলেন। মূসা আ. ও ফিরাউনের মধ্যকার একমাত্র বিরোধই ছিল 'রব্ব' নিয়ে। মূসা আ. আল্লাহ্র ইচ্ছায় চেয়েছিলেন, ফিরাউন একমাত্র আল্লাহ্কেই 'রব্ব' হিসেবে গ্রহণ করে নিক। কিন্তু ফিরাউন আল্লাহ্কে রব্ব হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে জনগণের সামনে নিজেকে 'রব্ব' হিসেবে উপস্থাপন করেছিল। যেমন- কুরআনুল কারীমে আছে–

اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ۝۱۷ . فَقُلْ هَلْ لَّكَ اِلٰٓى اَنْ تَزَكّٰى ۝۱۸ . وَ اَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى ۝۱۹ . فَاَرٰىهُ الْاٰيَةَ الْكُبْرٰى ۝۲۰ . فَكَذَّبَ وَعَصٰى ۝۲۱ . ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعٰى ۝۲۲ . فَحَشَرَ فَنَادٰى ۝۲۳ . فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى ۝۲۴

'ফিরাউনের নিকট যাও, সে সীমালঙ্ঘনকারী হয়ে গেছে এবং তাকে জিজ্ঞেস করো: তুমি কি পবিত্রতা অবলম্বন করতে প্রস্তুত? এবং আমি কি তোমাকে তোমার রবের পথ দেখাবো, যেন (উহার ফলে) তুমি তাকে ভয় করতে থাকো? পরে মূসা (ফিরাউনের নিকট গিয়ে) তাকে বড় নিদর্শন দেখালেন। কিন্তু সে অবিশ্বাস ও অমান্য করলো। পরে চালবাজি করার মতলবে পেছনে ফিরে গেল এবং

লোকদেরকে একত্রিত করে তাদেরকে সম্বোধন করলো এবং বললো: আমি তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ রব্ব।' –সূরা আন্ নাযিয়াত: আয়াত ১৮-২৪

মূসা আ. ফিরাউনের কাছে আল্লাহ্কে রব্ব হিসেবে উপস্থাপন করে আহ্বান জানিয়েছিলেন আল্লাহ্কে রব্ব হিসেবে গ্রহণ করে নিতে। তিনি চেয়েছিলেন ফিরাউন মহান আল্লাহ্কে রব্ব হিসেবে গ্রহণ করে সকল পাপ কালিমা অপরাধ হতে দূরে সরে এসে পরিচ্ছন্ন-পবিত্র হয়ে যাক। কিন্তু ফিরাউন আল্লাহ্কে রব্ব হিসেবে গ্রহণ করার পরিবর্তে জনগণের সামনে নিজেকে রব্ব হিসেবে উপস্থাপন করে। যদি মূসা আ. ফিরাউনের এ কথায় বাধার সৃষ্টি না করতেন বা তার এ দাবিকে মেনে নিতেন তবে ফিরাউন মূসা আ. এর বিরোধিতায় লিপ্ত হতো না। আবার ফিরাউনও যদি আল্লাহ্কে রব্ব হিসেবে গ্রহণ করে নিতো, তবেও এদের মধ্যকার বিরোধ মীমাংসিত হয়ে যেতো। এখন এই ছোট্ট শব্দটি কী অর্থ প্রকাশ করে, যার মানা বা অমান্য করার ফলে এই প্রচণ্ড বিরোধের উদ্ভব হলো। কেন ফিরাউনের এ দাবির কারণে সে পথভ্রষ্ট ও অভিশপ্ত হয়ে গেল? আর কেন মূসা আ. আল্লাহ্র অনুগ্রহপ্রাপ্ত, সন্তুষ্টি অর্জনকারী হয়ে গেলেন? এ বিষয়টি বুঝার জন্য আমাদের জানতে হবে ফিরাউন রব্ব বলতে কী বুঝেছিল এবং মূসা আ. ও এ শব্দটি কোন অর্থে ব্যবহার করেছিলেন। আমাদের সমাজে প্রচলিত ধারণা মতে ফিরাউন রব্ব বলতে আল্লাহ্কে আমরা যতটি দিক থেকে, যে অর্থে গ্রহণ করে থাকি, তাই দাবি করেছিল। অর্থাৎ, সে দাবি করেছিল সে পৃথিবীর স্রষ্টা, মানুষের স্রষ্টা এবং সবকিছুর মালিক। মূলত: বিষয়টি তা নয়। ফিরাউন রব্ব বলতে নিজেকে মানুষ, পৃথিবী ও বিশ্ব জগতের স্রষ্টা অর্থে ব্যবহার করেনি এবং মূসা আ. ও এই অর্থ এখানে গ্রহণ করেননি। বরং উভয়ের কাছেই এর অর্থ ছিল উপাস্য, বিধানদাতা, আইনদাতা, শাসক, প্রশাসক, মানুষ ও জমির নিরঙ্কুশ মালিক ইত্যাদি অর্থে। ফিরাউন যে নিজেকে স্রষ্টা বা ঐশ্বরিক অর্থে নিজেকে রব্ব হিসেবে ঘোষণা করেনি, তার কতিপয় যথার্থ প্রমাণ রয়েছে। যেমন- প্রথমত: ফিরাউন কোনো ব্যক্তির নাম নয়। এটি হলো প্রাচীন মিশরের রাজাদের উপাধী। যার অর্থ হলো 'সূর্যের সন্তান'। ঐতিহাসিক ও আধুনিক গবেষকদের মতে মূসা আ. লালিত-পালিত হয়েছিলেন এক ফিরাউনের তত্ত্বাবধানে আর নীলনদে ডুবে মরেছিল অন্য ফিরাউন। সুতরাং, সেই সমাজের জনগণের সামনেই এই ফিরাউনদের জন্ম ও মৃত্যু নামের মানবীয় চিরন্তন বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রতিভাত ছিল। অতএব তাদের জন্যও নিজেকে বিশ্ব জাহানের স্রষ্টা দাবি করার সুযোগ ছিল না এবং তারাও তা করেনি। (সমার্থক : তাফহীমুল কুরআন, সূরা আন নাযিয়াত, টিকা-১১)

দ্বিতীয়ত: মূসা আ. যখন আল্লাহ্‌কে রব্ব হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিলেন, তখন ফিরাউন সন্দেহাতীতভাবে তার অস্বীকার না করে, সন্দেহযুক্ত ঘোষণা দিয়েছিল। যেমন–

وَ قَالَ فِرْعَوْنُ يٰۤاَيُّهَا الْمَلَاُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِيْ١ۚ فَاَوْقِدْ لِيْ يٰهَامٰنُ عَلَى الطِّيْنِ فَاجْعَلْ لِّيْ صَرْحًا لَّعَلِّيْۤ اَطَّلِعُ اِلٰۤى اِلٰهِ مُوْسٰى١ۙ وَ اِنِّيْ لَاَظُنُّهٗ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ٣٨

‘ফিরাউন বললো, হে পরিষদবর্গ, আমি জানি না যে, আমি ব্যতীত তোমাদের কোনো উপাস্য আছে। হে হামান, তুমি ইট পোড়াও, অত:পর আমার জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ করো, যাতে আমি মূসার উপাস্যকে উঁকি মেরে দেখতে পারি। আমারতো ধারণা এই যে, সে একজন মিথ্যাবাদী।’ –সূরা ক্বাছাছ: আয়াত-৩৮

উপরোক্ত আয়াতে দেখা যায়, ফিরাউন যদিও বিদ্রুপাত্মকভাবে মূসা আ. এর উপাস্যকে দেখতে বলে অস্বীকার করেছিল, তথাপিও সে দ্ব্যর্থহীনভাবে মূসা আ. কর্তৃক দাবিকৃত উপাস্যকে অস্বীকার করতে পারেনি। সে যদি জনতার কাছে নিজেকে স্রষ্টা বলে দাবি করতো, তবে তার এ দাবির মধ্যে এ ধরনের সন্দেহ সংশয়যুক্ত থাকতো না। অন্যত্র দেখা যায় যে, মূসা আ. আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত হওয়ার বিষয়ে ফিরাউন মূসা আ. এর কাছ থেকে প্রমাণ উপস্থাপনের জন্য বলেছিল।

وَ قَالَ مُوْسٰى يٰفِرْعَوْنُ اِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَۙ١٠٤ حَقِيْقٌ عَلٰۤى اَنْ لَّاۤ اَقُوْلَ عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ١ؕ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ١ؕ ١٠٥ قَالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِاٰيَةٍ فَاْتِ بِهَاۤ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ١٠٦

‘মূসা আ. বললো, হে ফিরাউন! আমি বিশ্ব প্রতিপালকের প্রেরিত রাসূল, আমি সত্যায়ন করছি, আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে সত্য ছাড়া বলবো না। আমি তোমাদের কাছে এনেছি তোমাদের প্রতিপালকের স্পষ্ট প্রমাণ। সুতরাং, বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়কে আমার সাথে যেতে দাও। ফিরাউন বললো, যদি তুমি কোনো নিদর্শন এনে থাকো, সত্যবাদী হলে তা হাজির করো।’ –সূরা আরাফ : ১০৪ -১০৬

ফিরাউনের উপরোক্ত দাবি হতে প্রমাণিত হয়, সে নিজেকে মা’বুদ ও বিশ্বের স্রষ্টা বলে দাবি করেনি। কেননা সে স্রষ্টা হলে এ ধরনের প্রমাণ দাবি করা নেহায়েতই অযৌক্তিক।

তৃতীয়ত: ফিরাউন নিজেও দেব-দেবীর উপাসক ছিল। তা কুরআনুল কারীম হতেও জানা যায়। যেমন–

وَ قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَذَرُ مُوْسٰى وَ قَوْمَهٗ لِيُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ وَ يَذَرَكَ وَ اٰلِهَتَكَ ؕ قَالَ سَنُقَتِّلُ اَبْنَآءَهُمْ وَ نَسْتَحْيٖ نِسَآءَهُمْ ۚ وَ اِنَّا فَوْقَهُمْ قٰهِرُوْنَ ١٢٧

'ফিরাউনের সম্প্রদায়ের সর্দাররা (ফিরাউনকে) বললো, তুমি কি এমনি ছেড়ে দেবে মূসা ও তার সম্প্রদায়কে, দেশময় হৈ চৈ করার জন্য এবং তোমাকে এবং তোমার দেব-দেবীদেরকে বাতিল করে দেয়ার জন্য। সে (ফিরাউন) বললো, আমি এখনই হত্যা করবো তাদের পুত্র সন্তানদেরকে আর জীবিত রাখবো মেয়েদেরকে। বস্তুত: আমরা তাদের উপর প্রবল।' -সূরা আল-আরাফ: আয়াত **১২৭**

উপরোক্ত আয়াত হতে দেখা যায়, জনৈক ফিরাউন সমর্থক সর্দার ফিরাউনকে এই বলে সতর্ক করেছিল যে, মূসা আ.কে অবাধে আল্লাহ্‌র প্রভুত্বের বিষয়ে প্রচারণা চালাতে দিলে ফিরাউন ও ফিরাউনের দেব-দেবীরা বাতিল হয়ে যাবে। আর ফিরাউন উক্ত ব্যক্তির কথার যৌক্তিকতা অনুধাবন করে নিজের ও নিজের দেবতাদের স্বীকৃতি খতম হওয়ার ভয়ে শংকিত হয়ে, হত্যার মতো জঘন্য পন্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সুতরাং, ফিরাউন নিজেও দেব-দেবীর উপাসক ছিল। অতএব ফিরাউন রব্ব শব্দটি স্রষ্টা বা ঈশ্বর অর্থে প্রকাশ করেনি।

এখানে 'রব্ব' শব্দটি উপাসক বা আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। ফিরাউন মনে করতো যারাই রাজা বা ফিরাউন হবে, তারা সে দেশের সার্বভৌমত্বের মালিক। আর এটাই চিরাচরিত সত্য যে, মালিকের নিয়ম-নীতিতে তার সবকিছু চালিত হয়। সকল আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী একমাত্র ফিরাউন হবে। সে ব্যতীত কেউ আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী নয়, সে ব্যতীত কেউ উপাস্যও নেই। অপরদিকে মূসা আ. এর দাওয়াত ছিল মহান আল্লাহ্‌ই হলেন রব্ব। মূসা আ. ফিরাউনকে আহ্বান জানিয়েছিলেন, সে যেন আল্লাহ্‌কে রব্ব হিসেবে গ্রহণ করে নেয়। কেননা দেশের সার্বভৌমত্বের মালিক একমাত্র আল্লাহ্‌। সুতরাং, এ দেশ ও দেশের জনগণ একমাত্র আল্লাহ্‌র নিয়মানুসারে চালিত হবে। আল্লাহ্‌ ছাড়া কারো আনুগত্য পাওয়ার অধিকার নেই। সুতরাং, আল্লাহ্‌কে রব্ব হিসেবে গ্রহণ করার অর্থ হলো ফিরাউনের সকল কানুন বাতিল হয়ে যাওয়া এবং সেখানে আল্লাহ্‌র কানুন প্রতিষ্ঠা লাভ করা। আর ফিরাউন যখনই দেখলো আল্লাহ্‌কে রব্ব হিসেবে গ্রহণ করার সাথে সাথে তার সকল আইন অচল হয়ে যাবে এবং তাকে ও তার জনগণকে আল্লাহ্‌ কর্তৃক প্রদত্ত আইন তথা মূসা আ. কর্তৃক প্রাপ্ত বিধানমতে পরিচালিত হতে হবে, তখনই সে আল্লাহ্‌কে রব্ব হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করে নিজেকে রব্ব বা আদেশকর্তা, বিধানদাতা, নীতি নির্ধারক, উপাস্য বা সার্বভৌমের মালিক দাবি করেছে। আর তাই সে অভিশপ্ত হয়েছিল।

রব্ব বলতে স্রষ্টা না বুঝিয়ে যে আদেশকর্তা, বিধানদাতা, নীতি নির্ধারক বুঝানো হয়েছে তার একটি নমুনা কুরআনের অপর একটি আয়াত হতেও প্রতিভাত হয়;

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَ رُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ۚ وَ مَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوْٓا اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ سُبْحٰنَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۳۱

তারা তাদের পন্ডিত ও সংসার-বিরাগীদিগকে তাদের রব্ব রূপে গ্রহণ করেছে আল্লাহ ব্যতীত এবং মরিয়মের পুত্রকেও। অথচ তারা আদিষ্ট ছিল একমাত্র মাবুদের ইবাদতের জন্য। তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, তারা তাঁর শরীক সাব্যস্ত করে, তার থেকে তিনি পবিত্র। -সূরা আত-তাওবাহ-৩১

এখানেও পন্ডিত, পাদ্রিদেরকে স্রষ্টা মনে করা হয়নি, বরং পন্ডিত পাদ্রিদের স্বেচ্ছাচারী আদেশ নিষেধ পালন করার প্রবণতাকে নির্দেশ করে তার প্রতিবাদ ও নিন্দা করা হয়েছে এবং পন্ডিত-পাদ্রীদের স্বেচ্ছাচারী আদেশ নিষেধ পরিপালনকে তাদের ইবাদত করা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তিরমিযিতে একটি হাদীস আছে, আদী বিন হাতেম (রা:) থেকে বর্ণিত: একদা আমি নবী সা. এর কাছে এলাম। তখন আমার ঘাড়ে সোনার ক্রুশ ছিল। তা দেখে তিনি বললেন, 'হে আদী! এই প্রতিমা তোমার নিকট থেকে খুলে ফেলো।' শুনলাম তিনি সূরা তাওবার এই আয়াত পাঠ করলেন,

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَ رُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ

তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পন্ডিত-পুরোহিতদেরকে রব্ব বানিয়ে নিয়েছে-
-সূরা আত-তাওবাহ: ৩১

আমি নবী সা. এর মুখে উক্ত আয়াত শুনে আরজ করলাম যে, ইয়াহুদী-নাসারারা তো নিজেদের আলেমদের কখনো ইবাদত করেনি, তাহলে এটা কেন বলা হয়েছে যে, তারা তাদেরকে 'রব্ব' বানিয়ে নিয়েছে? তিনি সা. বললেন, 'এ কথা ঠিক যে, তারা তাদের ইবাদত করেনি। কিন্তু এটা তো সঠিক যে, তাদের আলেমরা যা হালাল (বৈধ বা আইনসিদ্ধ) করেছে, তাকে তারা হালাল এবং যা হারাম (অবৈধ বা নিষিদ্ধ) করেছে,তাকে তারা হারাম বলে মেনে নিয়েছে। আর এটাই হলো তাদের ইবাদত করা।' (তিরমিযী ৩০৯৫)

সুতরাং, আজকেও যদি কেউ আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে কোনো দেশ তথা বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের মালিক 'জনগণ' বা 'জনগণের সরকার' বা 'জনগণের প্রতিনিধি' বলে ঘোষণা দেয় এবং সার্বভৌমত্বের মালিক হিসেবে এ দেশ

পরিচালনার জন্য নিজেরাই আইন প্রণয়ন করে নেয়, ফিরাউনের সাথে তাদের পরিপূর্ণ সাদৃশ্য বিদ্যমান থাকবে। তারা জনগণকে সার্বভৌমত্বের মালিক বলে ঘোষণা দিয়ে নিজেরা জনগণের প্রতিনিধি সেজে প্রকারান্তরে নিজেরা সার্বভৌমত্বের মালিক হয়ে বসে যায় এবং নিজেরা আল্লাহ্‌র আইন অমান্য করে নিজেদের ইচ্ছা-পছন্দমতো আইন প্রণয়ন করে, সে আইন মেনে চলতে বা তাদের আনুগত্য করতে বাধ্য করে প্রকারন্তরে জনগণের উপাস্য বা রব্ব দাবি করে থাকে। তারা সালাত, রোযা, হজ্জের মতো কতিপয় বাহ্যিক ইবাদতের অনুশীলন করা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব, আনুগত্যকে রাষ্ট্রীয়ভাবে অস্বীকার করার কারণে ফিরাউনের উত্তরসূরীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। তারা আল্লাহ্‌র আইনকে অমান্য করে নিজেরা আইন রচনা করে সে আইন মানতে জনগণকে বাধ্য করে ফিরাউনের মতোই নিজেকে জনগণের একমাত্র উপাস্য বলে ঘোষণা দেয়। যারা এরূপ অনৈসলামিক সরকারের সহযোগী তারা ফিরাউনের সহযোগীদের সম-স্তরের মানুষ হিসেবে গণ্য হওয়ার যোগ্য এবং সমর্থকরা ফিরাউনের সমর্থকদের সম-মর্যাদা পাওয়া স্বাভাবিক। এখন আমাদের বিবেচনা করতে হবে আমাদের কাজ-কর্মের দ্বারা আসলে ফিরাউনের সাথে কোনো সাদৃশ্য রক্ষা করছি কিনা। যদি আমাদের অজান্তে ফিরাউনের সাথে আমাদের সাদৃশ্য সৃষ্টি হয়ে থাকে, তবে তাৎক্ষণিকভাবে নিজেদেরকে সংশোধন করে অভিশপ্তদের পথ পরিহার করতে হবে। আমরা যদি তা না করি, তবে বুঝতে হবে সালাতে দাঁড়িয়ে অভিশপ্তদের পথ হতে রক্ষা করার জন্য যে প্রার্থনা করা হয়েছিল, তা মোটেও আন্তরিকতাপূর্ণ ছিল না। ফলে তাওহীদের আক্বীদা হতে দূরে থাকার কারণে সালাত গ্রহণযোগ্য না হওয়া স্বাভাবিক। আল্লাহ্‌ ভালো জানেন।

রাসূল সা. এর সময়ের কতিপয় অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট হলো কুখ্যাত আবূ জাহেল, আবূ লাহাব, উৎবা, শাইবা প্রমূখ খোদাদ্রোহী ব্যক্তিবর্গ। আমরা সালাতে দাঁড়িয়ে মহান আল্লাহ্‌র কাছে এ সকল অভিশপ্ত মনুষ্য শয়তানদের পথ হতেও বিরত থাকার আবেদন করে থাকি। আমাদের আবেদন কতটা যথার্থ তা আমাদের ঐকান্তিক চেষ্টা-সাধনা ও কর্মতৎপরতা এবং বাস্তব পেরেশানীতে প্রতিফলিত হবে। আমরা যদি এ সকল মনুষ্য শয়তানদের কৃতকর্ম ও অভিশপ্ত হওয়ার কারণ পর্যালোচনা করে তাদের উক্ত কাজসমূহের সাথে আমাদের কাজের মিল খুঁজে পাই, তবে বুঝা যাবে, আমাদের সালাতে মহান প্রভুর নিকট পেশ করা আবেদন ছিল অন্ত:সারশুন্য। আর যদি আমাদের কাজকর্ম এই সাক্ষ্য বহন করে, আমাদের

সত্ত্বা কোনোভাবেই তাদের নীতি ও কর্মপন্থা গ্রহণ করে নিতে প্রস্তুত নয় অর্থাৎ তারা যে কাজের কারণে অভিশপ্ত হয়েছিল, আমরা যদি সে কাজগুলো থেকে যেকোন পরিস্থিতিতেই বিরত থাকি, তবে বুঝা যাবে আমাদের মৌখিক আবেদনের সাথে আকাঙ্খার একটি যোগসূত্র রয়েছে এবং এর ফলে আমাদের সালাতসমূহও অর্থবহ হবে।

তাদের কর্মকাণ্ডের সাথে আমাদের কাজকর্ম ও আচার-আচরণের ঐচ্ছিক বা অনৈচ্ছিক কোনো সাদৃশ্য আছে কি নেই, তা বুঝার জন্য তারা কোন্ কাজ করার কারণে অভিশপ্ত হয়েছে এবং কেনইবা এ সকল কাজ করেছে, তা বুঝতে হবে। মুহাম্মদ সা. যে সমাজে আল্লাহ্র দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন, সে সমাজ হতে আল্লাহ্র দ্বীন প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। সমাজের সমাজপতি ও তাদের জনগণ মহান আল্লাহ্র উপাসনা ত্যাগ করে নিজেরা বিভিন্ন আকৃতি ও নামের মূর্তি তৈরি করে জ্ঞানশুন্য পাগলের মতো এ সকল মূর্তির পদতলে নিজেদের মাথানত করে পূজা-তর্পনাদী করতো। আর ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন পরিচালনার মতো যথার্থ কোনো নিয়ম বা ঐশী বিধি-নিষেধ অক্ষত অবস্থায় বিদ্যমান না থাকায় পৈত্রিকসূত্রে প্রাপ্ত ভ্রান্ত নিয়ম-নীতি এবং সমাজের সর্দারদের খেয়াল-খুশিমতো তৈরি করা নিয়মের অনুসরণ করা হতো । ফলে সমাজ সুদ, লুণ্ঠন, যিনা, হত্যা ও সকল প্রকার ঘৃন্য কর্মকাণ্ড দ্বারা কলুষিত হয়ে পরেছিল। এ অবস্থায় মহান আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূল মুহাম্মদ সা. ঐ সমাজে ঘোষণা করে দিলেন–

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌرَّسُوْلُ اللهِ

'একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ সা. আল্লাহ্র রাসূল।'

এ ঘোষণার দাবি হলো ঐ সমাজে আল্লাহ্র উপাসনা ছাড়া আর কারোর উপাসনা চলবে না, আল্লাহ্র আইন, আদেশ-নিষেধ ছাড়া আর যত আইন, আদেশ-নিষেধ আছে সব বাতিল। একমাত্র মুহাম্মদ সা. কেই কেবল অনুসরণ করা যাবে। রাসূল সা. ছাড়া অপর কোনো ব্যক্তি, বাপ-দাদা, সাহেব-সর্দার, সমাজপতি কারো অনুসরণ কল্যাণকর নয়। এ সকল কাফির সর্দাররা বুঝতে পারছিল যে, রাসূল সা. এর সত্যের এ দাওয়াতের নিশ্চিত ফলাফল ছিল সমাজের মানুষ সত্যকে গ্রহণ করে নেবে, ফলে সমাজ হতে মূর্তিপূজা-অর্চনা, বাপ-দাদা, সাহেব-সর্দারদের ভ্রান্ত নীতি অপসারিত হবে। ফলে গোত্রপতিদের দীর্ঘকালের প্রভাব-প্রতিপত্তি চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এ আশংকায় জাহেলী সমাজের গোত্রপতি আবূ জাহেল, আবূ লাহাব, উৎবা, শাইবা প্রমূখ অভিশপ্ত মনুষ্য শয়তানরা আল্লাহ্র দ্বীনের দাওয়াতের কণ্ঠরোধ করার নীলনকশা প্রণয়ন ও তার

বাস্তবায়নে মরিয়া হয়ে পরেছিল। তারা আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠায় বাধাদানের জন্য তাদের জীবন মরণ ও স্বর্বস্ব এ কারণে ব্যয় করেছিল যে, সমাজ হতে তাদের অন্যায় প্রভাব-প্রতিপত্তি ও কল্পিত মানসম্মানের বিলুপ্তি ঘটবে।

অতএব বর্তমান সমাজব্যবস্থায়ও কালেমার দাওয়াতের অর্থ হবে, আল্লাহ্‌র আইন ব্যতীত উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ও নিজেদের তৈরি করা নিয়ম-নীতি চিরতরে পরিত্যাগ করে তার স্থলে একমাত্র আল্লাহ্‌র আদেশ জীবনের সর্বক্ষেত্রে অনুসরণ করা। সমাজ হতে মানব রচিত সকল মতবাদ, আইন-কানুন, নিয়ম-নীতি, চিরতরে উচ্ছেদ করতে হবে-অমান্য করতে হবে এবং তদস্থলে একমাত্র আল্লাহ্‌র কানুন প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সমাজে আল্লাহ্‌র বিধান প্রতিষ্ঠার কারণে স্বাভাবিক কারণে বিদ্যমান আইন ও তাদের প্রস্তুতকারক ও লালন-পালনকারী ও শাসকদের প্রভাব-প্রতিপত্তি সীমিত হয়ে পরবে। যারা আল্লাহ্‌র আইন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নিজেরা মানব রচিত মতবাদ ভিত্তিক রাজনীতি পরিচালনা করে, অংশগ্রহণ করে ও সমর্থন করে আল্লাহ্‌র আইন প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করবে, তাদের কাজকর্ম সেই সকল অভিশপ্ত আবূ জাহল, আবূ লাহাব, উৎবা, শাইবা প্রমূখদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে। সুতরাং, কেউ যদি বাস্তবে এ সকল কাজ করে, আর সালাতে এ পথ হতে আল্লাহ্‌র কাছে রেহাই চায় বা বাঁচিয়ে রাখার আবেদন করে, তবে তাই প্রমাণিত হয় যে, সালাতে সে যে আবেদন করেছে, তা মোটেও তার আকাঙ্খার বহি:প্রকাশ নয়। অতএব এ ধরনের সালাতের গ্রহণযোগ্যতা কোথায়?

সালাতে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র কাছে উপরোক্ত আবেদনসমূহ পেশ করার পর আমরা বলে থাকি 'আমীন' অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে আমরা বলি 'আমাদের দোয়া কবুল করুন।' যেক্ষেত্রে সালাত জামাতে পড়ি, সেক্ষেত্রে ইমাম সাহেব সকলের পক্ষ থেকে আল্লাহ্‌র কাছে উপরোক্ত আবেদন পেশ করেন এবং মুক্তাদীগণ ইমাম সাহেবের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে 'আমীন' বলে আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া কবুলের আবেদন জানান। দোয়া কবুলের জন্য এ আবেদন হৃদয় হতে নি:সৃত হয়েছে কিনা তা সালাতের বাইরে মানুষের কর্মকাণ্ড দ্বারাই প্রতীয়মান হয়।

সূরা ফাতিহা শেষ করে আমরা কুরআনুল কারীমের আরও কিছু আয়াত তিলাওয়াত করি। বিশেষ করে রমজান মাসে তারাবিহ সালাতে সমগ্র কুরআনপাক তিলাওয়াত করে থাকি। সালাতে সূরা ফাতিহা ও তৎসঙ্গে কুরআনুল কারীমের কিছু আয়াত পাঠ করে আমরা রুকুর অবস্থায় যাই। আমরা সালাতের শুরুতে যেভাবে 'আল্লাহু আকবার' বলে আল্লাহ্‌র নিরঙ্কুশ শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দিয়েছিলাম, রুকুতে যাওয়ার সময়েও আমরা একইভাবে 'আল্লাহু আকবার' বলে থাকি।

রুকু ও সিজদার তাসবিহ

রুকুতে গিয়ে আমরা আল্লাহ্‌র সামনে নিজেদের মাথা নত করে দিয়ে আত্মসমর্পণ করে বলে থাকি–

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ

অর্থাৎ, অতি পবিত্র আমার রব্ব।

আমরা এ কথার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র ব্যাপারে দুটি বিশেষণের স্বীকৃতি দিয়ে থাকি।

প্রথমত : আল্লাহ্ আমাদের 'রব্ব'।

দ্বিতীয়ত : তিনি অতিশয় পবিত্র।

'রব্ব' গুণবাচক শব্দটির ব্যাখ্যা এই বইয়ে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে এবং পবিত্র হওয়ার আলোচনাও সালাতের ছানার আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে।

আমরা মহান আল্লাহ্‌র সামনে মাথা নত করে আল্লাহ্‌কে পবিত্র ও রব্ব হিসেবে ঘোষণা দিয়ে, سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলে দন্ডায়মান হই। যার অর্থ হলো 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গুণগান করলো, তার কথা আল্লাহ্ শুনতে পেয়েছেন।' এ কথাটির তাৎপর্য অতিশয় ব্যাপক। আপনি ইতিপূর্বে সালাতে দাঁড়িয়ে যা কিছু বলেছেন, এ কথাটির মাধ্যমে সে বিষয়ে স্বয়ং আল্লাহ্‌কে সাক্ষী বা শ্রবণকারী বলে স্বীকৃতি দিলেন। আমরা যদি বিশ্বাস করি, আমরা আল্লাহ্ সম্পর্কে যা বলেছি, তা আল্লাহ্ শুনেছেন, তবে আল্লাহ্‌কে সালাতের মধ্যে পালনকর্তা, রিজিকদাতা, বিধানদাতা, নিজের মালিক, প্রভু, সর্বশ্রেষ্ঠ ইত্যাদি ঘোষণা দিয়ে বাস্তব জীবনে এসে কোনো মানুষকে বিধানদাতা, মালিক, প্রভু বা সর্বশ্রেষ্ঠ বলে গ্রহণ করা কখনো সম্ভব নয়। আমরা এ বাক্যটি দ্বারা তাই বলে থাকি যে, আমরা সালাতে দাঁড়িয়ে এ পর্যন্ত যা ঘোষণা দিয়েছি, তা আল্লাহ্ শুনেছেন, আমরা কখনো আমাদের এ কথাসমূহের ব্যতিক্রম করবো না।

মেহেরবান আল্লাহ্ সালাতে আমাদেরকে দাঁড় করিয়ে আমাদের কর্তব্যসমূহ যথাযথভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এবং তা যথাযথভাবে পালন করার অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন। আর এও জানিয়ে দিয়েছেন যে, আমরা যে অঙ্গীকার করেছি, তা আল্লাহ্ স্বয়ং শুনেছেন। সুতরাং, এর ব্যতিক্রম আচরণ করা হলে পরিনাম কী হবে, তা সহজে অনুধাবনযোগ্য।

আমরা অতঃপর পুনরায় 'আল্লাহু আকবার' বলে পূর্বের ন্যায় আবারও আল্লাহ্‌কে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা দিয়ে সমগ্র দেহ মন আল্লাহ্‌র কাছে সমর্পন করে দিয়ে মাথা, কপাল আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে লুটিয়ে দিয়ে সিজদায় বলি–

سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى

অর্থাৎ, আমি মহান সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করছি।

আমরা সালাতে আল্লাহ্‌কে সিজদা করে সিজদার মধ্যে যা বলে থাকি, বাস্তব জীবনে কি আমরা তা করি? না এর ঠিক বিপরীত কাজ করি? আমরা যদি বাস্তব জীবনে মানুষের কাছে বলি যে; একমাত্র আল্লাহ্‌ ব্যতীত আমাদের কোনো প্রভু নেই, কেননা তিনিই আমাদের স্রষ্টা, আমাদের মালিক। অতএব আমরা একমাত্র তাঁরই গোলামী করবো, একমাত্র তাঁরই আদেশ মেনে চলব, একমাত্র তিনিই নিরঙ্কুশ জ্ঞানের অধিকারী, অতএব তিনিই জানেন কিসে শান্তি আসতে পারে আর কিসে রয়েছে অশান্তি, কিসে সমৃদ্ধি রয়েছে আর কিসে রয়েছে দুর্ভোগ, অতএব একমাত্র তাঁরই বিধান অনুসরণ করলেই শান্তি, শৃঙ্খলা, সমৃদ্ধি ও সম্মান অর্জিত হবে, আমরা একমাত্র তাঁরই হুকুম পালন করবো, একমাত্র তাঁর আইন-বিধান ছাড়া কোনো আইন মানি না, মানব না। কোনো আইন-বিধান শান্তি, শৃঙ্খলা, সমৃদ্ধি আনয়নে সক্ষম নয়, তবে আমরা বাস্তব জীবনে এসে মহান আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব, মহানত্ব, পবিত্রতা বর্ণনা করলাম এবং সালাতে দাঁড়িয়ে যা বললাম তা স্বার্থক হলো। আর যদি এমন হয় যে, কোনো নেতা বা দল আল্লাহ্‌র আইনের পরিবর্তে নিজেরা আইন-কানুন তৈরি করে বা অন্য কোনো মানুষের তৈরি করা আইন-বিধান দ্বারা দেশ পরিচালনার জন্য তাকে বা তার দলকে নির্বাচিত করার জন্য মানুষকে আহ্বান জানালো, আর আপনি বলতে শুরু করলেন (আল্লাহ্‌র আইন নয়) উক্ত নেতা বা দলকে নির্বাচিত করলে দেশে শান্তি, শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হবে, সমৃদ্ধি অর্জিত হবে এবং মানবতা মুক্তি পাবে, তবে আপনি বাস্তবে কার শ্রেষ্ঠত্ব, মহাত্ব ও প্রশংসা বর্ণনা করলেন? বিষয়টি গভীরভাবে বিবেচনা করে দেখবেন।

তাশাহুদ

আমরা এ সকল স্বীকৃতি, দায়িত্ব-কর্তব্য স্মরণ, আল্লাহ্‌র কাছে আবেদন-নিবেদন করে এ পর্যায়ে এসে সালাতের একটি রাকাত সমাপ্ত করি। এভাবে দু'তিন বা চার রাকাত সালাত শেষ করার পর আমরা সালাত হতে অব্যাহতি নেয়ার প্রাক্কালে গোলামের মতো আল্লহ্‌র সামনে হাঁটু গেড়ে হাত দুটি হাটুর উপর বিছিয়ে দিয়ে বিনয়ের সাথে বলে থাকি–

التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة لله وبركاته، السلام علينا و على عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده و رسوله.

অর্থাৎ, –'সমস্ত শ্রদ্ধা, ভক্তি, সালাত ও ইবাদত একমাত্র আল্লাহ্‌রই জন্য। হে নবী সা. আপনার প্রতি সালাম, আপনার উপর আল্লাহ্‌র রহমত এবং অনুগ্রহ বর্ষিত হোক। আমাদের ও আল্লাহ্‌র নেক বান্দাহদের উপর আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হোক। আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো প্রভু ও মাবুদ নেই। আমি আরও স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সা. আল্লাহ্ তায়ালার বান্দাহ ও রাসূল।'

আপনি এর মাধ্যমে যা বলেন তা হলো-

(১) সমস্ত শ্রদ্ধা, ভক্তি, সালাত ও ইবাদত একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য। আল্লাহ্‌র প্রতি ভক্তি প্রকাশে প্রতিবন্ধক হয় এরূপ কোনো শ্রদ্ধা আপনি কারো প্রতি জ্ঞাপন করেন না। কেউ আল্লাহ্‌র আইন ব্যতীত বা নির্দেশ পালনের পরিবর্তে তার বা অপর কোনো মানুষের নির্দেশ মেনে চলার আহ্বান জানালে আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনের প্রতিবন্ধক কোনো আহ্বানে সাড়া দেওয়ার পরিবর্তে আপনি নির্ভয়ে প্রতিরোধমূখী ভূমিকা পালন করেন। কারণ আল্লাহ্‌র নির্দেশ না মানলে মূলত: আল্লাহ্‌র প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয় না। আপনি যে তার প্রতি শ্রদ্ধাসহ সালাত পড়েন, তা কেবল এজন্য পড়েন যে, তা আল্লাহ্‌র নির্দেশ। সামাজিক সম্মান, মানুষের শ্রদ্ধা, সামাজিক স্বীকৃতি, পারিবারিক সন্তুষ্টি এর কোনোটি অর্জন করার জন্য আপনি সালাত পড়েন না। আপনি একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদত করেন অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালন করেন বা আল্লাহ্ মনোনীত ইসলামের অনুসরণ করেন।

(২) আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মদ সা. এর প্রতি সর্বাধিক ভালোবাসা পোষণ করেন। আর তাই সর্বপ্রথম আপনার মনে আল্লাহ্‌র রাসূলের শান্তি, তাঁর প্রতি আল্লাহ্‌র রহমত ও অনুগ্রহ বর্ষণের ব্যাকুলতা তৈরি হয়। আপনি আপনার প্রভু আল্লাহ্‌র কাছে তার আবেদন করেন। আপনি কোনো মানুষকে তাঁর অপেক্ষা অধিক বা তাঁর সমান করে ভালোবাসেন না। অতএব আপনি একমাত্র তাঁর অনুসারী।

(৩) আপনি একমাত্র আল্লাহ্‌র দয়া ও রহমতের প্রত্যাশী। তাই আপনার উপর এবং আল্লাহ্‌র নেক বান্দাহদের উপর আল্লাহ্‌র রহমত ও শান্তি বর্ষণের জন্য আকুল আবেদন পেশ করেন। আপনি আল্লাহ্ ব্যতীত কারোর মুখাপেক্ষীতাকে গ্রহণ করে নিতে সামান্যতম প্রস্তুত নন।

(৪) আপনি আরো স্বাক্ষ্য দিয়ে থাকেন আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো প্রভু, মা'বুদ, উপাস্য, আনুগত্য প্রাপ্য কেউ নেই। আপনি একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত কারো আদেশ-নির্দেশ, আইন-কানুন, ভয়-ভীতি, আনুগত্য, প্রভুত্ব, প্রভাব-প্রতিপত্তি, কোনো অবস্থাতে মেনে নিতে রাজি নন। আপনি দুনিয়ার কারো শক্তির প্রতি মাথা নত করে দিতে প্রস্তুত নন। আপনি আল্লাহ্ ব্যতীত যে কোনো শক্তি, নেতা, দল বা মানুষের তৈরি করা আইন, প্রভুত্ব , আনুগত্যকে দৃঢ়তার সাথে অস্বীকার করেন।

(৫) আপনি আরও স্বাক্ষ্য দিয়ে থাকেন যে, মুহাম্মদ সা. আল্লাহ্ তা'আলার বান্দাহ্ ও রাসূল। অর্থাৎ, মুহাম্মদ সা. ই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পাঠানো একমাত্র অনুসরণযোগ্য আদর্শ। রাসূল হলেন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মানুষের কাছে সংবাদ বাহক। সুতরাং, মুহাম্মদ সা. কে আল্লাহ্র রাসূল হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার সাথে সাথে তাঁর আনীত বিধানের অনুসারী হয়ে যান। অতএব তারপর রাসূল সা. ব্যতীত অপর কাউকেও অনুসরণ করার কোনো অধিকার আপনার নেই। পৃথিবীর কোনো নেতাকে আদর্শ বলে গ্রহণ করার সুযোগ আপনার জন্য খোলা নেই। কোনো নেতা আপনাকে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের দিকে আহ্বান করলে তা যেমন- পরিত্যাজ্য তেমনি দেশ ভিত্তিক জাতীয়তাবাদের দিকে আহ্বান করে দেশের মালিক হিসেবে মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করার আহ্বানও প্রত্যাখ্যাত। অতএব আপনি পৃথিবীর সকল নেতার নের্তৃত্ব, মতবাদীদের তথাকথিত মতবাদ বা থিওরী চূড়ান্তভাবে প্রত্যাখ্যান করে একমাত্র মুহাম্মদ সা. প্রদর্শিত পথে পরিচালিত হবেন এবং তাঁকে কেবল অনুসরণযোগ্য আদর্শ হিসেবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে গ্রহণ করে নেবেন। কিন্তু আপনি যদি কার্যত: এমন কারো হাতে আপনার এবং আপনার দেশের শাসন ক্ষমতা ও পরিচালনার ভার অর্পণ করেন, যে ব্যক্তি বা দল রাসূল সা. কে অনুসরণ করে শাসনব্যবস্থা ও দেশ পরিচালনা করে না, তবে কি আপনি বলতে পারেন যে, আপনি রাসূল সা. কে নি:শর্তভাবে পরিপূর্ণ অনুসরণ করছেন?

দরূদ শরীফ

অত:পর আপনি বলেন :

اَللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد

'হে আল্লাহ্! মুহাম্মদ সা. এবং মুহাম্মদ সা. এর সন্তানদের উপর আপনার রহমত নাযিল করুন, যেমন- আপনি ইব্রাহীম আ. এবং ইব্রাহীম আ. এর

সন্তানদের উপর আপনার রহমত নাযিল করেছেন। নিশ্চয় আপনি প্রশংসনীয় ও মহা-সম্মানিত। হে আল্লাহ্! মুহাম্মদ সা. এবং মুহাম্মদ সা. এর সন্তানদের উপর আপনার বরকত নাযিল করুন যেমন- আপনি ইব্রাহীম আ. এবং ইব্রাহীম আ. এর সন্তানদের উপর নাযিল করেছেন। নিশ্চয় আপনি প্রশংসনীয় মহা-সম্মানিত।'

এখানে আপনি আপনার ভালোবাসার সবটুকু রাসূল সা. এর জন্য উজার করে দিয়ে রাসূল সা. এবং তাঁর পরিবারের জন্য দোয়া করেন। রাসূল সা. এর প্রতি ভালোবাসা সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে আপনি রাসূল সা. এর জন্য দোয়ার পাশাপাশি ইব্রাহীম আ. কে স্মরণ করেন।

অতঃপর আপনি আপনার হীনতা, দীনতা, নি:স্বতা ও অসহায়তা স্মরণ করে মহান আল্লাহ্র কাছে নিবেদন করে থাকেন–

اللّٰهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا، وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

'হে আল্লাহ্! আমি বহু গুণাহ্র কাজ করে আত্মার উপর জুলুম করেছি এবং আপনি ব্যতীত গুণাহ্ মাফ করার আর কেউ নেই। অতএব আপনার পক্ষ হতে আমার গুণাহ্সমূহ মাফ করে দিন এবং আমার উপর আপনার রহমত নাযিল করুন। নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল এবং দয়াময়।'

আপনি সালাত শেষ করার পূর্বে আল্লাহ্র কাছে নিজের অপরাধ স্বীকার করে এই অপরাধসমূহের জন্য আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাইলেন এবং স্বীকার করলেন আল্লাহ্ ব্যতীত ক্ষমা করার যোগ্য কেউই নেই। অত:পর রহমতের আবেদন জানালেন। এখন সালাত শেষ করে যদি পুনরায় আল্লাহ্র আদেশ তথা ইসলামী বিধি-বিধান অমান্য করে পুনরায় গুণাহ-এ লিপ্ত হয়ে যান তবে আপনার এ ক্ষমা চাওয়া এবং রহমতের আবেদনের ফলাফল পাওয়া কি উচিত?

আপনি সালাতে উপরোক্ত প্রতিশ্রুতিসমূহ আল্লাহ্র কাছে দিয়ে সালাত পূর্ণ করেন এবং সালাত পূর্ণ করার পর ডান ও বা দিকের ফেরেশতা ও সবকিছুর জন্য আল্লাহ্র শান্তি এবং রহমত বর্ষণের দোয়া করে সালাত হতে অবসর হয়ে যান।

এখন শুধু একটি বিষয় চিন্তা করুন, আমরা ইসলামের পাঁচটি ভিত্তির অন্যতম প্রধান ভিত্তি সালাতে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্র সামনে যা কিছু বলেছি, তা আমাদের বাস্তব কার্যাদীর সাথে কতোটুকু সঙ্গতিপূর্ণ এবং আমাদের কী করা উচিত। আমরা মূলত: কী করছি এবং কী করা উচিত এ সম্পর্কে, অর্থাৎ সালাতে আমরা যে ঘোষণাসমূহ দিয়ে থাকি, তা প্রচলিত রাজনীতির সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ার বিষয়টি পরবর্তীতে আরও বিস্তারিত আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ্।

সিয়াম

ইসলামের পাঁচটি ভিত্তির অন্যতম ভিত্তি হলো সিয়াম পালন বা রমজানের রোযা রাখা। আল্লাহ্ কুরআনুল কারীমে বলেছেন-

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَۙ١٨٣

'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেরূপ ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা পরহেযগারী অর্জন করতে পার।' -সূরা বাক্বারা: আয়াত ১৮৩

আল্লাহ্ তাঁর বান্দাহদের জন্য সিয়াম পালন করাকে ফরয হিসেবে স্থির করেছেন, আর এটি এজন্য করেছেন, যাতে তাঁর বান্দাহরা পরহেযগারী বা তাকওয়া অর্জন করতে পারে। সিয়াম সাধনা একজন মানুষকে সুবহে সাদিকের পূর্ব থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ে ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করে খাদ্য গ্রহণ থেকে এবং প্রচণ্ড পিপাসার্ত হওয়া সত্ত্বেও একটু পানি পান থেকে এ বিশ্বাস বিরত রাখতে পারে যে, তাকে আল্লাহ্ দেখছেন। সুতরাং যারা রোযা রাখেন, তাঁরা অবশ্যই আল্লাহ্র দৃষ্টিকে ফাঁকি দেয়ার অসম্ভবতা সম্পর্কে বিশ্বাস রাখেন এবং একমাত্র আল্লাহ্র আনুগত্য করার জন্যই রোযা রাখেন। এভাবে দীর্ঘ একটি মাস যে কারো প্রভাবের উর্ধ্বে থেকে পানাহারের কষ্ট সহ্য করে একমাত্র আল্লাহ্র হুকুম পালন করার কারণে আল্লাহ্র আনুগত্য করার অভ্যাস মানুষের মধ্যে গড়ে উঠে। কিন্তু যদি কেউ আল্লাহ্র আনুগত্য করার এ ট্রেনিং-এ অংশগ্রহণ করা সত্ত্বেও আল্লাহ্র আনুগত্যের পরিবর্তে মানুষের আনুগত্য শুরু করে, তবে বুঝতে হবে, তার মধ্যে রোযার কোনো প্রভাবই পড়েনি। কেননা রাসূল সা. বলেছেন–

'(রোযা থেকেও) কেউ যদি মিথ্যা কথা বলা ও তদনুযায়ী কাজ করা পরিত্যাগ না করে, তবে তার শুধু খাদ্য ও পানীয় পরিত্যাগ করায় (রোযা রাখায়) আল্লাহ্র কোনো প্রয়োজন নেই।'-বুখারী

এ হাদীসে কেবল মিথ্যা কথা ও উক্ত কথার ভিত্তিতে বদ আমলের চর্চার কথা বলা হলেও এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, রোযার মাধ্যমে আল্লাহ্ মানুষের আমল আখলাকে যে পরিবর্তন আনতে চেয়েছেন, রোযা যদি মানুষের মধ্যে সেইরূপ কোনো পরিবর্তন না আনতে পারে তবে এ রোযা রাখার কারণে রোযাদার প্রকৃত কল্যাণ হতে বঞ্চিত হবে। সুতরাং, যারা আল্লাহ্র আনুগত্য পরিত্যাগ করে বাস্তব জীবনে মানুষের তৈরি করা আইন শ্রদ্ধাসহ পরিপালন করে, সংরক্ষণ করে এবং নিজেরা আইন প্রণয়ন করে ও এ সকল কাজ সমর্থন করে, তারা রোযা রাখা

সত্ত্বেও তাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করার অভ্যাস বা প্রবণতা গড়ে উঠেনি। ফলে তারা রোযার কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা অধিক।

হজ্জ

ইসলামের পাঁচটি ভিত্তির মধ্যে অন্যতম হলো হজ্জ। হজ্জের নিয়ম-নীতি, পদ্ধতি, শিক্ষা, গুরুত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে স্বতন্ত্র গুরুত্বপূর্ণ বহু পুস্তক রচিত হয়েছে। আমি এ বিষয়ে আলোচনা খুব বেশি দীর্ঘ না করে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সাথে হজ্জের যে সম্পর্ক রয়েছে কেবল সেই অংশটুকু নিয়ে আলোচনা করবো। মুহাম্মদ সা. এ দুনিয়ার জীবনের শেষ দিকে এসে হজ্জ পালন করে উম্মতের জন্য হজ্জের একটি মডেল রেখে গেছেন। আমরা রাসূল সা. এর হজ্জ অনুসারে হজ্জ পালন করে থাকি। আমাদের সামনে হজ্জের যে মডেল রয়েছে বা রাসূল সা. যে হজ্জ পালন করে গেছেন, অনুরূপ একটি হজ্জ একজন মুসলমানকে দুনিয়ার জমিনে আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য যথার্থ কর্মী হিসেবে গড়ে নেয়ার জন্য যথেষ্ট। এমন একটি হজ্জ একজন মুসলমানকে দুনিয়ার সকল কুফরী শক্তির মূলোৎপাটন করে আল্লাহ্‌র দ্বীন কায়েমে জীবনের সর্বশক্তি নিয়োগে উদ্বুদ্ধ করে। মহানবী সা. যে হজ্জ পালন করেছিলেন এবং আজকের দুনিয়ার যত মানুষ হজ্জ পালন করছে, সেই হজ্জের ক্রিয়াকর্ম আমাদের মুসলমান জাতির পিতা ইব্রাহীম আ. এর ত্যাগ, সাধনা, ও তেজদীপ্ত ঈমানী পরীক্ষা সমৃদ্ধ ঘটনা বিজড়িত। হজ্জের ক্রিয়াকর্ম আমাদের সামনে ইব্রাহীম আ. এর আদর্শ শিক্ষা দেয়, আমাদের জীবনকে দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য ত্যাগ ও সাধনায় সমৃদ্ধ করে নেয়ার প্রেরণা যোগায়। আল্লাহ্‌র জন্য জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ নি:র্দ্বিধায় ত্যাগ করতে উদ্বুদ্ধ করে। যদি কোনো ব্যক্তি হজ্জ পরিপালন করে, অথচ ইব্রাহীম আ. এর আদর্শের প্রতি তার শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, অনুকরণের একাগ্রতা, আগ্রহ ও অনুপ্রেরণার সৃষ্টি না হয় তবে সে হজ্জ উক্ত হাজ্বীর জীবনে কতোটুকু প্রভাব ফেলতে সক্ষম হলো, তা সহজেই অনুমেয়।

হজ্জের ফরয বা রুকন তিনটি:

১. ইহরাম বাঁধা
২. উকূফে আরাফাহ্ এবং
৩. তাওয়াফে যিয়ারাত

হজ্জের কাজ শুরু হয় ইহরাম বাঁধার মাধ্যমে, আর নিয়তসহ তালবিয়া উচ্চারণ করে ইহরাম সম্পন্ন করা হয় এবং হজ্জের পুরো সময়টা ধারাবাহিকভাবে তালবিয়া উচ্চস্বরে উচ্চারণ করা হয়। হজ্জের দ্বিতীয় রুকন, উকূফে আরাফাহ্‌র প্রধান আকর্ষণ হলো হজ্জের খুতবাহ। তালবিয়ায় যে শব্দ উচ্চারণ করা হয় তার মধ্যে

একটি রাজনৈতিক দর্শন রয়েছে। একই ভাবে রাসূল সা. এর হজ্জের খুতবা বা বিদায় হজ্জের ভাষণেও রয়েছে সর্বকালের মুসলিমদের জন্য রাজনৈতিক পথনির্দেশ। আমরা প্রথমত তালবিয়া থেকে এবং অত:পর বিদায় হজ্জের ভাষণ হতে মুসলিমদের রাজনৈতিক দর্শন খুজে নিতে চেষ্টা করবো।

তালবিয়া

তালবিয়াতে আমরা উচ্চস্বরে উচ্চারণ করে থকি;

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ

'আমি হাযির, হে আল্লাহ্, আমি হাযির। আপনার কোন শরীক নেই, আমি হাযির। নিশ্চয় যাবতীয় প্রশংসা ও নিয়ামত আপনার এবং রাজত্বও, আপনার কোন শরীক নেই।'

তালবিয়া হলো হাজীর মুখে উচ্চস্বরে উচ্চারিত তাওহীদের আত্মিক ঘোষণা। এর মধ্যে চার বার বলা হয় 'আমি হাযির'। প্রথমে বলা হয়, লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, (আমি হাযির, হে আল্লাহ্, আমি হাযির) যার মাধ্যমে হাজী আল্লাহ্র নির্দেশে সাড়া দিয়ে আল্লাহ্র সামনে পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে। অত:পর আরো জোড়ালো ভাবে বলা হয়, 'লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক'। এ অংশ নির্দেশ করে, হাজী কেবল হাযির হয়েছে এমন নয়, বরং এই উপস্থিতি ও আত্মসমর্পণ একমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে, একমাত্র আল্লাহ্র সামনে। এই উপস্থিতি ও আত্মসমর্পণের মধ্যে যশ-খ্যাতি, ভ্রমণ সুখ, অন্য কারো সন্তুষ্টি, এর কোন কিছুই সংযুক্ত নয়। অর্থাৎ হাজীর দেহ-মন, সমগ্র সত্তা একমাত্র আল্লাহ্র সামনে আত্মসমর্পণ করেছে।

হাজীর দেহ-মন, সমগ্র সত্তা একমাত্র আল্লাহ্র সামনে আত্মসমর্পণ করার পর হাজী এ অবস্থায় তিনটি শব্দ দ্বারা একটি কঠিন ও ব্যাপক অর্থবোধক ঘোষণা দিয়ে থাকেন স্বয়ং আল্লাহ্র সামনে; ইন্নাল-হামদা, ওয়ান-নিয়'মাতা, লাকা ওয়াল-মুলক।

শব্দ তিনটি নিয়ে একটু চিন্তা করলে অনুভূতিতে আসবে;

ইন্নাল-হামদা, নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতা আল্লাহ্রই। তখনই কারো বা কোন কিছুর প্রশংসা করা হয় যখন তিনি বা তাঁর উক্ত কাজ পছন্দসই হয় এবং তখনই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়, যখন কারো অবদানে কেউ উপকৃত হয়। আল্লাহ্র সমগ্র সৃষ্টি অতিশয় নিখুত এবং অমরা তার দ্বারা উপকৃত হচ্ছি। যেমন আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহ্ সুবিন্যস্ত করেছেন, পৃথিবীটাকে সকল উপকরণে

সমৃদ্ধ করে আমাদের জন্য আবাস উপযোগী করেছেন এবং আমরা আল্লাহ্‌র এ সকল সৃষ্টি হতে প্রতিনিয়ত উপকৃত হচ্ছি। আল্লাহ্ আমাদের জীবন পরিচালনার জন্য হিদায়াত বা জীবন বিধান দিয়েছেন, যার মাধ্যমে আমাদের অধিকার সুরক্ষিত রাখতে পারি এবং পরকালীন মুক্তি অর্জন করতে পারি। আল্লাহ্‌র এ বিধানে কোন ত্রুটি নেই বিধায় প্রশংসাযোগ্য এবং এ বিধান আমাদের দুনিয়ার জীবন সহজ করেছে এবং পরকালীন মুক্তির পথ দেখায় বিধায় আমরা আল্লাহ্‌র নিকট কৃতজ্ঞ।

ওয়ান-নিয়'মাতা, নিশ্চয়ই সকল নিয়ামত আল্লাহ্‌র। পৃথিবীতে অক্সিজেন সরবরাহ, আলো-বাতাস, রোদ-বৃষ্টি, খাদ্য-পানীয়, আমাদের শারীরিক সুস্থতা, কর্মক্ষমতা, চোখের দৃষ্টি, বুদ্ধি-জ্ঞান, হজ্জের সফরের প্রয়োজনীয় উপকরণ- এ সব কিছুই আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিয়ামত, যা আল্লাহ্ আমাদেরকে কারো সাহায্য ছাড়াই দিয়ে থাকেন।

লাকা ওয়াল-মুলক, নিশ্চয়ই সমস্ত সার্বভৌমত্ব আপনার। শুধুমাত্র আপনার নিয়ামতই নয়, বরং শক্তি, হুকুম, রাজ্য, সার্বভৌমত্ব, আধিপত্য সবকিছুই আপনার। এই দেশ, এই পৃথিবী এবং তার সমস্ত শক্তি এবং পৃথিবী, সমুদ্র ও আকাশে থাকা প্রাণী; মানুষ, জিন এবং ফেরেশতাগণ এবং সকল ঐশ্বর্যসহ বাতাস, বৃষ্টি, আলো এবং অন্ধকার, চাঁদ, সূর্য, তারা, কৃষ্ণগহ্বর, ছায়াপথ, সবকিছুর উপর আপনার পূর্ণ, পরম নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষমতা আছে, হে আল্লাহ!

এই তিনটি ঘোষণা দেয়ার পর তালবিয়াতে সর্বশেষ যে শব্দটি উচ্চারণ করে চুড়ান্ত প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় তা হলো;

লা শারীকা লাক- আপনার কোন অংশীদার নেই।

এখানে এসে চুড়ান্তভাবে বলা হয় আল্লাহ্‌র প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতার ক্ষেত্রে, নিয়ামত দেয়ার ক্ষেত্রে এবং মুলক এর সার্বভোমত্বে আল্লাহ্‌র সাথে অংশিদার কেউ নেই। হাজী এখানে এ তিনটি বিষয়ের উপর একমাত্র আল্লাহ্‌র একচ্ছত্র আধিপত্য স্বীকার করে নেয়, আর এ তিনটি বিষয়ের উপর আল্লাহ্ ছাড়া সকল ব্যক্তি বা পক্ষের অংশিদারিত্ব, প্রভাব-প্রতিপত্তি অস্বীকার করে।

এখন আমরা তালবিয়ার এই ঘোষণার সাথে প্রচলিত রাজনীতির সম্পর্ক বুঝার চেষ্টা করবো।

প্রচলিত রাজনীতিতে দেশের সার্বভৌমত্ব, আইন বা বিধি-বিধান প্রণয়নের ক্ষমতা, দেশ পরিচালনার নীতি, নেতার যোগ্যতা, আর্থিক নীতি প্রণয়ন এবং প্রয়োগ এর ক্ষমতা কার নিকট ন্যস্ত থাকে?

নিশ্চয় বলবেন জনগণ এবং তা প্রয়োগ করেন জনপ্রতিনিধি।

এখন আসুন, আল্লাহ্ কী দেশ পরিচালনার বিষয়ে, আইন বা বিধি বিধান প্রণয়ন, নেতার যোগ্যতা, আর্থিক নীতি তথা সার্বিক ভাবে কোন নির্দেশনা দিয়েছেন?

যদি একই সাথে আল্লাহ্‌র বিধান থাকে এবং দেশের জনগণের প্রতিনিধিগণও বিকল্প বিধান প্রণয়ন করেন, আর আপনি যদি গণপ্রতিনিধিদেরটাই গ্রহণ করেন, তবে সত্যি করে বলেনতো আপনি প্রশংসাটা কার করলেন?

আপনি যদি জীবন-জিবিকা, সুযোগ সুবিধার কথা চিন্তা করে নিজেকে প্রচলিত ধর্মহীন নিয়মের কাছে ন্যস্ত করেন, তাহলে নিয়ামতের বিষয়ে কার মুখাপেক্ষি হলেন? আপনি কি অন্য করো নিয়ামত দেয়ার ক্ষমতাকে অস্বীকার করতে পারলেন?

একটু আগে তালবিয়াতে বলা হলো নিশ্চয়ই সমস্ত সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌র। সার্বভৌমত্ব যদি আল্লাহ্‌র হয়, তবে দেশ চলবে কার নিয়মে? নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নিয়মে। প্রচলিত রাজনীতিতে কি আল্লাহ্‌র নিয়মে দেশ চালানোর দাবীকে স্বীকার করা হয়?

আপনার দেশে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র বিধান পরিপালন করা যায়, যেমন পারিবারিক আইন, উত্তরাধিকার, সালাত-সিয়াম সাধনার স্বাধীনতা, ব্যক্তিগতভাবে যাকাত পরিশোধ ইত্যাদি। এতে আপনি সন্তুষ্ট। কিন্তু আপনি যে বললেন, এই মালিকানা তথা পরিচালনার নীতিতে কোন অংশিদারিত্ব নাই!

প্রকৃত বিষয় হলো, হজ্জে তালবিয়াতে যে ঘোষণা দেওয়া হয়, ধর্মহীন বা সেক্যুলার রাজনীতির সমর্থক হলে প্রকারন্তরে উক্ত ঘোষণার সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ করা হয়।

বিদায় হজ্জের ভাষণে রাজনৈতিক নির্দেশনা

বিদায় হজ্জের এক অনন্য আকর্ষণ ছিল সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ট নেতা, মানবতার মুক্তিদূত মুহাম্মদ সা. এর মুখ নি:সৃত ঐতিহাসিক ভাষণ। আমরা যারা হজ্জ পালনে ব্রত হই, তাদের সামনে স্বাভাবিক কারণে আমাদের পথ প্রদর্শক মহামানব সা. এর পালনকৃত বিদায় হজ্জের প্রতিচ্ছবি ভেসে উঠে। আর বিদায় হজ্জে আল্লাহ্‌র রাসূল সা. উপস্থিত এবং অনুপস্থিত অর্থাৎ উক্ত হজ্জে অংশগ্রহণকারী এবং কেয়ামত অবধি আনাগত সকল মানুষের জন্য রেখে গেছেন সেই শ্বাসত ভাষণ। যারা আল্লাহ্‌ প্রেমে মত্ত হয়ে হজ্জ পালনে অংশ নেন, সেই ভাষণ তাদের মনকে আন্দোলিত না করে পারে না। যারা হজ্জ পালন করছেন তাঁরা রাসূল সা. এর বিদায় হজ্জের ভাষণটি একবার হৃদয় দিয়ে অনুভব ও বিবেক দিয়ে মূল্যায়ন করে কর্মপন্থা কী হওয়া উচিত তা চিন্তা করে দেখতে হবে। রাসূল সা. বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছিলেন-

- ‘হে লোক সকল, আমার কথা শোনো, আমি জানিনা, এবারের পর তোমাদের সাথে এই জায়গায় আর মিলিত হতে পারবো কিনা।’

- 'তোমাদের রক্ত এবং ধন-সম্পদ পরস্পরের জন্য আজকের দিন, বর্তমান মাস এবং বর্তমান শহরের মতই নিষিদ্ধ। শোনো, জাহিলিয়াতের সময়ের সবকিছু আমার পদতলে পিষ্ট করা হয়েছে। জাহেলিয়াতের খুনও খতম করা হয়েছে। আমাদের মধ্যকার যে প্রথম রক্ত আমি শেষ করছি তা হচ্ছে, রবিয়া ইবনে হারেসের পুত্রের রক্ত, এই শিশু বনী সাদ গোত্রে দুধ পান করছিল, সেই সময়ে হুযাইল গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করে। জাহেলী যুগের সুদ খতম করে দেয়া হয়েছে। আমাদের মধ্যকার প্রথম যে সুদ আমি খতম করছি, তা হচ্ছে আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের সুদ। এখন থেকে সকল প্রকার সুদ শেষ করে দেয়া হলো।'
- 'তোমাদের নিকট আমি এমন জিনিস রেখে যাচ্ছি যে, যদি তোমরা তা দৃঢ়ভাবে ধারণ করে থাকো, তবে এরপর কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। সেই জিনিস হচ্ছে আল্লাহ্‌র কিতাব। হে লোক সকল মনে রেখো আমার পরে কোনো নবী নেই। তোমাদের পরে কোনো উম্মত নেই।'
- 'নাক কাটা কাল হাবশী গোলামকেও যদি তোমাদের নেতা নির্বাচিত করা হয় এবং সে তোমাদেরকে কুরআন অনুযায়ী পরিচালনা করে, তবে তোমরা তাঁর কথা মেনে চলো এবং তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে নিও।'

রাসূল সা. উপস্থিত জনমণ্ডলীকে লক্ষ্য করে বললেন,

- 'যারা এ সভায় উপস্থিত আছ তাঁরা অনুপস্থিত লোকদেরকে সকল কথা শুনিয়ে দিও।'

রাসূল সা. এর উপরোক্ত ভাষণ সাধারণ কোনো পরামর্শ মূলক উপদেশ ছিল না। এ ভাষণ এক চূড়ান্ত বিপ্লবের নির্দেশনা। স্বল্প পরিসরে এ ভাষণের আলোচনা সম্ভব নয়। তবে এ সকল নির্দেশনাসমূহ আমাদের কী দায়িত্ব কর্তব্য বর্তিয়ে দেয়, তার প্রতি সামান্য ইঙ্গিত না করলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

(ক) মহানবী সা. এ ভাষণের মাধ্যমে চিরতরে জাহিলিয়াতের সকল নিয়ম-নীতি বাতিল ঘোষণা করেন। তিনি জাহিলিয়াতের সুদ ব্যবস্থাকেও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। অতএব যে ব্যক্তিটি হজ্জ পালন করবেন তাঁর মধ্যে রাসূল সা. এর ভাষণের এ অংশের প্রভাব না পড়ার কথা নয়, যদি তিনি যথার্থই হজ্জ পালন করে থাকেন। জাহিলিয়াতের যুগের মানুষেরা মেহেরবান আল্লাহ্‌কে ভুলে গিয়ে মুর্তিপূজায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিল, তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশের পরওয়া না করে গোত্রপতিদের নিয়ম-নীতিকে গ্রহণ করে নিয়েছিল। সুদ, মদ্যপান, হত্যা, লুণ্ঠন ছিল তাদের জন্য গৌরবময় ঘটনা। তারা নিজেদের এবং নিজেদের গোত্রপতিদের তৈরি করা নিয়ম-কানুনকে নিজেদের কর্মনীতি হিসেবে গ্রহণ করতো। অতএব কোনো ব্যক্তি হজ্জ পরিপালন করার পর কোনোভাবে ব্যক্তি পূজা, মূর্তি পূজা তথা

রাষ্ট্র প্রধান বা কোনো প্রয়াত নেতার ছবির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে আধুনিক সংস্করণের পূজা করতে পারে না। সে পারে না গোত্রপতি তথা কোনো নেতার নিজস্ব ভাবধারায় তৈরি করা নিয়ম-নীতি অনুসারে পরিচালিত হতে। যদি কোনো ব্যক্তি হজ্জ করার পরও এহেন নীতি গ্রহণ করেন তবে তার হজ্জের স্বার্থকতা কতোটুকু তা তিনিই বিচার করুন। রাসূল সা. বিদায় হজ্জের ভাষণে সুদকে চিরতরে বাতিল করে দিয়েছেন। অতএব যারা ব্যাংকিং ব্যবসার নামে সুদের ব্যবসায় জড়িত রয়েছেন বা নিজেদের ব্যবসায়িক বা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে সুদ দানের বিনিময়ে ঋন গ্রহণ করে সুদ প্রদানে লিপ্ত রয়েছেন, তারা প্রকারান্তরে রাসূল সা. এর এই ভাষণের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করছেন (নাউজুবিল্লাহ)। অতএব যে ব্যক্তি রাসূল সা. এর বিদায় হজ্জের ভাষণের প্রতি বাস্তবত: সামান্যতম সম্মান প্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলো না, তারা হজ্জের ব্যাপারে কতোটুকু আন্তরিক তা আপনারা অনুমান করুন। আর যে সরকার বা রাষ্ট্র সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে বা প্রচলিত রেখেছে তারাইবা কতোটুকু সম্মান প্রদর্শন করছে? অতএব হজ্জের প্রতি উক্ত রাষ্ট্র বা সরকারের কতোটুকু শ্রদ্ধা বিদ্যমান রয়েছে?

রাসূল সা. বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছেন,

'আমি তোমাদের নিকট এমন এক জিনিস রেখে যাচ্ছি যে, যদি তোমরা তা দৃঢ়ভাবে ধারণ করে থাকো তবে এরপর কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। সেই জিনিস হচ্ছে আল্লাহ্‌র কিতাব।' যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ও তাঁর রাসূল সা. এর মুহাব্বত এবং নির্দেশ মনে করে হজ্জ পালন করে থাকেন, তবে রাসূল সা. এর উপদেশের বাস্তবায়ন তার জীবনে পরিলক্ষিত হবে। সেই ব্যক্তিটি তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে কুরআনের অনুসরণ এবং বাস্তবায়নে সংকল্পবদ্ধ না হয়ে পারে না। সে চাইবে তার জীবনের প্রতিটি কাজ কুরআন অনুমোদিত পন্থায় হোক। তার দেশের অর্থব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থাসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে কুরআনের পরিপূর্ণ অনুসরণ চলতে থাকুক। যদি কোনো ব্যক্তি হজ্জ সম্পাদনের পরও নিজের জীবনের কিছু অংশ কুরআন ও সুন্নাহ মুতাবিক এবং বাকী অংশ নিজের ইচ্ছা-পছন্দ বা মানব রচিত মতবাদের ভিত্তিতে চালিত করে, অথবা এমন কাউকেও অনুসরণ বা সহযোগিতা করে, যে আল্লাহ্‌র কুরআন ব্যতীত অন্য কোনো নিয়মে ফায়সালা গ্রহণ করে বা অন্য কোনো নিয়ম-নীতি, মতবাদে দেশ পরিচালনা করে, তবে তার মধ্যে সেই হজ্জের প্রভাব পরেনি বলে মনে করতে হবে। অতএব হজ্জ আমাদেরকে শিক্ষা দেয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে অর্থাৎ ব্যক্তিগত, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক, শিক্ষা, চিকিৎসা সর্বক্ষেত্রে কুরআনকে আঁকড়ে ধরতে অর্থাৎ কুরআন অনুসারে চালিত হতে।

রাসূল সা. বিদায় হজ্জের ভাষণে আরও বলেছেন–

- 'নাককাটা কাল হাবশী গোলামকেও যদি তোমাদের নেতা নির্বাচিত করা হয় এবং সে তোমাদেরকে কুরআন অনুযায়ী পরিচালনা করে তবে তোমরা তার কথা মেনে চলো এবং তার আনুগত্য স্বীকার করে নিও।'

রাসূল সা. এর এ ভাষণে রাষ্ট্রনায়ক বা নেতার যোগ্যতার মাপকাঠি হিসেবে কুরআন অনুসারে পরিচালনা করাকে নির্ধারণ করেছেন। অতএব যে ব্যক্তি রাসূল সা. এর হজ্জের এ ভাষণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে, সে সন্তুষ্টচিত্তে এমন কারো আনুগত্য করতে পারে না, যে কুরআন অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালনা করে না। যদি কোনো ব্যক্তি রাসূল সা. এর এ নির্দেশ অমান্য করে অন্য কোনো মানদণ্ডের ভিত্তিতে নেতা নির্বাচিত করে বা তার আনুগত্য করে, বুঝতে হবে তার মধ্যে রাসূল সা. এর এ ভাষণ, তথা হজ্জের কোনো প্রভাবই পড়েনি। অতএব হজ্জ আমাদেরকে এমন শাসকের শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের শিক্ষা দেয়, যিনি একমাত্র কুরআন অনুসারে আমাদেরকে তথা রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। আমাদের জীবনে যদি এ শিক্ষার বাস্তব চিত্র পরিলক্ষিত না হয়, তবে বুঝতে হবে হজ্জ হতে আমরা কোনো কল্যাণ লাভ করতে সক্ষম হইনি।

রাসূল সা. উপস্থিত জনমণ্ডলীকে বলেছিলেন,

- 'যারা এ সভায় উপস্থিত আছ তারা অনুপস্থিত লোকদেরকে এ সকল কথা শুনিয়ে দিও।'

রাসূল সা. এর উপরোক্ত নির্দেশ হতেও তাঁর এ ভাষণের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। এ ভাষণটি প্রতিটি মানুষের জন্যই জানা অপরিহার্য বিধায় রাসূল সা. নির্দেশ দিয়েছিলেন, যারা শুনেছে তারা না শোনা লোকদেরকে যেন এ মর্মস্পর্শী মহাবাণী শুনিয়ে দেন। রাসূল সা. এর এ বাণী আমাদেরকে দ্বীনের দাওয়াতের শিক্ষা দেয়। হজ্জ করার পরও দাওয়াতে দ্বীনের অভ্যাস গড়ে না উঠার প্রবণতা নির্দেশ করে উক্ত হাজীর মধ্যে এ ভাষণ তথা হজ্জ এর সুফল পূর্ণাংশে কার্যকর হয়নি।

হজ্জের শিক্ষা বা নির্দেশনা প্রকৃত পক্ষে সেক্যুলার বা ধর্মহীন রাজনীতির সাথে পরিপূর্ণ সাংঘর্ষিক। কোনো ব্যক্তি হজ্জের পরিপালন করার পরও সেক্যুলার রাজনীতির সাথে জড়িত থাকার অর্থ হলো উক্ত রাজনীতিবিদ হয়তো হজ্জের শিক্ষা ও উদ্দেশ্য বুঝতে সক্ষম হননি অথবা ইবাদতের নামে তামাশা করেছেন। আতএব সেক্যুলার রাজনীতির সাথে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও হজ্জ করে নিজেকে আল্লাহ্‌র অনুগত মুসলিম মনে করার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।

ইসলামের আলোকে বাংলাদেশের রাজনীতি

ইসলাম ও মুসলমান হওয়ার বিষয়ে এ পর্যন্ত আলোচিত ছকটিকে সামনে রেখে এখন আমরা বাংলাদেশে প্রচলিত রাজনীতির বিষয়ে আলোচনা করবো। আমাদের দেশে প্রধানত: দুটি ধারার রাজনীতি প্রচলিত রয়েছে। তার একটি হলো ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজনীতি, অপরটি হলো ধর্মহীন পাশ্চাত্য ধাঁচের রাজনীতি। পাশ্চাত্য ধাঁচের রাজনীতি আবার দুটি ধারায় পরিচিত, যার একটি ডানপন্থী ও অপরটি বামপন্থী। আমরা এ পুস্তকে ইসলামী রাজনীতির বিষয়ে পরে আসছি, তার পূর্বে প্রচলিত ধর্মহীন রাজনীতিসমূহের আলোচনা করতে চাই।

ইতিহাস থেকে দেখা যায়, সূদীর্ঘকাল হতে ধর্মহীন রাজনীতির ধারক, বাহক কর্তৃক এ দেশ শাসিত হয়ে আসছে। আর এ সকল রাজনৈতিক দলসমূহের প্রতিষ্ঠাতা, নেতা-কর্মী প্রায় সকলে মুসলমানের ঔরসে জন্মগ্রহণ করার সুবাদে মুসলমান হিসেবে পরিচিত হওয়ায় এ দলগুলো যে, ইসলাম বিপক্ষদল তথা আল্লাহ্‌দ্রোহী, সে ধারণা আমাদের জনসাধারণের বিবেচনায় আসছে না। আমাদের দেশ অতীতে ও বর্তমানে যে সকল দল দ্বারা শাসিত হচ্ছে, তাদের আদর্শ-নীতি-বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করলে মূল বিষয়টি বুঝা সহজ হবে। আমাদের দেশে অসংখ্য রাজনৈতিক দল রয়েছে, যার অনেকগুলোর নাম নিশানাও অনেকের জানা নেই। এ সকল দলসমূহের ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ ও নীতি থাকা সত্ত্বেও কতিপয় বিষয়ে তারা এক ও অভিন্ন এবং এ অভিন্ন বিষয়সমূহের কারণে ইসলামের ঠিক বিপরীত মেরুতে অবস্থিত। যার কারণে একজন মুসলমান এ সকল দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর আর মুসলমানের অন্তর্ভুক্ত থাকে কিনা, তাই আলোচ্য বিষয়। এ সকল দলের গঠনতন্ত্র, মেনোফেষ্টো, ঘোষণাপত্র, রাজনৈতিক আদর্শ, অতীত ও বর্তমানের শাসন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করলে এ সকল দলের যে স্বত:স্বিদ্ধ বৈশিষ্ট্য, আদর্শ, নীতি-কর্মপদ্ধতি ও বিশ্বাসগুলো দেখা যায়, তা মোটামুটি নিম্নরূপ:

১. বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের একক মালিক বাংলাদেশের জনগণ তথা আল্লাহ্‌ সৃষ্ট মানুষ।

২. এ দেশ পরিচালনা, শাসন করা, আইন প্রণয়ন ও সর্ববিষয়ে নিরঙ্কুশ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য এ দেশের জনগণ প্রতিনিধি নির্বাচন করবে এবং সেই সুবাদে যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হবে।

৩. প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে উক্ত প্রতিনিধির বৈশিষ্ট্য কী হবে, তা দেশের জনসাধারণ নির্ধারণ করবে।

৪. দেশের জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি কর্তৃক প্রবর্তিত ও অনুমোদিত বিধি-বিধান দ্বারা দেশের বিচারকার্য পরিচালিত হবে এবং তারা হলো আইন প্রণয়নের ও প্রয়োগ পদ্ধতি নির্ধারণের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। দেশের জনসাধারণ নিরবিচ্ছিন্নভাবে তাদের আইন পরিপালনের মাধ্যমে এ সকল নেতাদের আনুগত্য করতে বাধ্য।

৫. দেশভিত্তিক বা ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে দেশের ঐক্য বজায় থাকবে।

৬. দলের প্রতিষ্ঠাতাগণকে দলের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হয় এবং দেশের শান্তি ও উন্নয়নের জন্য উক্ত নেতার আদর্শ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করা হয়।

৭. দেশের রাষ্ট্র প্রধান দেশের সংসদ তথা মানুষ কর্তৃক তৈরি করা আইন অনুযায়ী নীতিমালা গ্রহণ করবেন এবং সরকার প্রধান জনগণের প্রতিনিধি তথা মানুষ কর্তৃক প্রণীত আইন ও নিয়ম-নীতি অনুসারে দেশ পরিচালনা করবেন এবং সকল বিষয়ে জনগণ তথা জনগণের প্রতিনিধির কাছে জবাব দিতে দায়বদ্ধ থাকবেন।

৮. শিক্ষানীতি প্রণয়নে ইসলামী শিক্ষাকে গৌন এবং বৈষয়িক শিক্ষাকে মূখ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

৯. দলের প্রতিষ্ঠাতার প্রতি সর্বাধিক শ্রদ্ধা ও আনুগত্য প্রকাশ করা হয়।

১০. দলের প্রতিষ্ঠাতা কর্তৃক দল গঠনকালে প্রণীত নীতিকে দলের অনুসরযোগ্য আদর্শ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

উপরোক্ত বিষয়সমূহ যে আলোচ্য দলসমূহের আদর্শ, বিশ্বাস, নীতি ও বৈশিষ্ট্য তা সচেতন ব্যক্তিমাত্র অবহিত। কিন্তু এ বিষয়গুলোর পরিণতি ইসলামী দৃষ্টিকোণ হতে কতবেশি বিপজ্জনক, তা অনেকেরই বিবেচনায় নেয়া হয়নি। আমরা এ পর্যায়ে উপরোক্ত বিষয়সমূহের বাস্তব মর্মার্থ, প্রকৃত প্রয়োগ এবং ইসলামী দিক থেকে অপরিহার্য পরিণতি ইত্যাদি বিষয়সমূহ ক্রমান্বয়ে আলোচনা করবো ইন শা আল্লাহ্।

বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বঃ বাংলাদেশের রাজনৈতিক উপরোক্ত দলসমূহ ঘোষণা দিয়ে থাকেন বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের একচ্ছত্র অধিপতি বাংলাদেশের জনগণ। সুতরাং, বাংলাদেশের জনগণ দেশের ভালো-মন্দ স্থির করবে। দেশের যে কোনো বিষয়ে এ দেশের জনসাধারণের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। তাদের এ ধারণানুসারে জনসাধারণ তাদের পক্ষে সবকিছু স্থির করার জন্য প্রতিনিধি নির্বাচিত করবেন। আর এ প্রতিনিধিগণ পাঁচটি বছর বা নির্ধারিত মেয়াদে জনসাধারণের পক্ষে দেশের জন্য যা কিছু ভালো মনে করবেন, তা স্থির করবেন এবং জনগণের দেয়া ক্ষমতা

বলে মালিকানার অধিকার ভোগ করবেন। মূলত: এ বিষয়টি সঠিক নয় এবং প্রত্যক্ষভাবে খোদাদ্রোহিতা এবং একটি কুফরী মতবাদ। কারণ-

প্রথমত: জনসাধারণ এ দেশের সার্বভৌমত্বের মালিক হওয়া বাস্তব ধারণা নয়। কেননা সার্বভৌম মালিকানা তাকে বলে যখন কোনো বস্তুর উপর অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের নিরঙ্কুশ মালিকানা থাকে। এ অর্থে আমরা যারা বাংলাদেশের অধিবাসী তাদের পক্ষে এ দেশের মালিক হওয়া সম্ভব নয়। আমরা এ দেশে জন্ম গ্রহণ করেছি মাত্র। এতে আমাদের কোনো অবদান ছিল না। আবার এক সময় চলেও যেতে হবে পরপারে। যখন আমাদের অস্তিত্বটুকুও থাকবে না। আমরা এ দেশ, দেশের সম্পদ প্রকৃত মালিক (আল্লাহ্) থেকে ক্রয় করেও নেইনি, আবার আমাদের পূর্ববর্তীরাও তা প্রকৃত মালিক থেকে ক্রয় করে নেয়নি, অথবা তৈরিও করেনি। সুতরাং, যার উপর আমাদের বা আমাদের পূর্ববর্তীদের ক্রয়সূত্রে বা সৃষ্টি করার মাধ্যমে মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়নি, আমরা কীভাবে তার সার্বভৌমত্বের মালিক হবো? যেহেতু এ দেশ, এ ভূমি এবং এর সকল সম্পদ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ্, সেহেতু এ জমির নিরঙ্কুশ মালিকানা তাঁরই। সুতরাং, জনসাধারণের পক্ষ হতে এ দেশের সার্বভৌমত্বের দাবি করা বাস্তবসম্মত নয়।

দ্বিতীয়ত: রাজনৈতিক দলসমূহ এ ধরনের ঘোষণা দেয়া সত্ত্বেও জনসাধারণ কখনো মালিকানা ভোগ করতে পারে না এবং জনসাধারণের ইচ্ছানুসারে সবকিছু হয়ও না। নেতৃবৃন্দ এ ধরনের ঘোষণা দিয়ে, প্রথমত: এ দেশের জনগণের মালিকানা প্রতিষ্ঠার কথা বলে, অতঃপর একটি নির্বাচনের মাধ্যমে নিজেদেরকে জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। অতঃপর জনগণের ইচ্ছা-অনিচ্ছার দিকে না তাকিয়ে নিজেদের পছন্দমতো সবকাজ সম্পন্ন করে এটাকে জনগণের ইচ্ছার উপর চাপিয়ে দিয়ে ও জনগণের ইচ্ছা বলে ঘোষণা দিয়ে মূলত: নিজেদের মালিকানা প্রতিষ্ঠা করে। সুতরাং, জনগণ কখনো দেশের মালিকানা লাভ করতে বা ভোগ করতে পারে না। এ কারণে তাদের এ ঘোষণাও নিজেদের মালিকানা প্রতিষ্ঠার একটি কৌশল ছাড়া আর কিছু নয়।

তৃতীয়ত: এ ঘোষণাটি একটি খোদাদ্রোহিতা ও কুফরী মতবাদ। কেননা, আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন–

اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ۝٤ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا وَ رَبُّ الْمَشَارِقِ ۝٥

'তোমাদের প্রকৃত মা'বুদ মাত্র একজনই- যিনি পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবী ও আকাশের মধ্যে যা কিছু আছে, তাদের সবার মালিক এবং সমস্ত উদয়স্থলের মালিক'-সূরা সাফ্ফাত: আয়াত ৪-৫

وَ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا ؕ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ١٧

'আল্লাহ্ তো আকাশসমূহের এবং এ দুয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছুর মালিক। তিনি যা চান সৃষ্টি করেন। আল্লাহ্ সবকিছুর উপর শক্তিমান

-সূরা মায়েদাহ: আয়াত ১৭

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّ لَا نَصِيْرٍ ١٠٧

তুমি কি জানো না যে, আকাশসমূহ ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহ্রই? এবং আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের আর কোনো অবিভাবক ও সাহায্যকারী নেই।

-সূরাআল-বাক্বারা: ১০৭

মহান আল্লাহ্র এ ঘোষণাটি সকল সন্দেহ-সংশয়ের উর্ধ্বে এবং পরিপূর্ণ ন্যায় ভিত্তিক। কেননা, আল্লাহ্ই পৃথিবী, পৃথিবীর সবকিছু, সমগ্র বিশ্ব জগত সৃষ্টি করেছেন। যে মানুষেরা আজ ভূমির সার্বভৌমত্বের দাবি করছে, তাদেরকেও আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন। অতএব সৃষ্টিগত কারণে তিনি এ দেশ, দেশের সম্পদ ও সবকিছুর মালিক। তিনি এ মালিকানা কারো কাছে হস্তান্তর করেননি এবং নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাও দেননি। তিনি সর্বাবস্থায় মালিক আছেন ও থাকবেন। সুতরাং, আল্লাহ্ যে বস্তুর মালিক এবং তিনি বর্তমানেও মানুষকে তার একচ্ছত্র মালিকানার কথা জানিয়ে দিচ্ছেন, সেখানে আল্লাহ্র সৃষ্ট জীব হয়ে যে সকল মানুষ আল্লাহ্র মালিকানা অস্বীকার করে, জনগণকে তথা নিজেদেরকে সেই বস্তুর মালিক বলে ঘোষণা দেয়, তারা কি আল্লাহ্ দ্রোহীতায় লিপ্ত নয়? তাদের এ কাজটি কি কুফরী নয়? আজকে যারা এ সকল দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃত্বের পদ গ্রহণ করছে, ঐ দলকে সমর্থন দানের মাধ্যমে এ ধরনের আল্লাহ্ দ্রোহীতায় লিপ্ত হওয়ার সুযোগ দিচ্ছে, তারা কি কখনো ভেবে দেখেছে, তারা কি করছে? তাদের পরিণতি কী হবে? মুসলমান তো হলো আল্লাহ্র অনুগত বান্দাহর নাম। আল্লাহ্ দ্রোহীতায় লিপ্ত থাকার পর কি কেউ নিজেকে মুসলমান দাবি করতে পারে? সুতরাং, এ সকল ধর্মহীন রাজনীতিতে অংশগ্রহণের পূর্বে অবশ্যই তাদেরকে এ সকল বিষয়সমূহ গভীরভাবে ভেবে দেখা অত্যাবশ্যক।

উল্লেখ্য, দেশের সার্বভৌমত্বের মালিকানা সংক্রান্ত বিষয়ে তাদের ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে অনেকে মনে করেন যে, এ ঘোষণা দ্বারা আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার বা চ্যালেঞ্জ করা হয়নি। এ দিয়ে কেবল এতোটুকু বুঝানো হয়েছে যে,

বাংলাদেশের মাটিতে অন্য কোনো দেশের কোনো নাগরিক বা রাষ্ট্রের কোনো মালিকানা বা অংশীদারিত্ব নেই। প্রকৃত বিষয় হলো সার্বভৌমত্বের উক্ত ঘোষণাটি অত্যধিক ব্যাপক। আর উপরোক্ত ব্যাখ্যাটি উক্ত ঘোষণার একটি অংশবিশেষ এবং ব্যাখ্যা সঠিক হলে এ ঘোষণার সাথে কারো মতের বিরোধ থাকার কথা নয়। কিন্তু আপত্তিটি হলো, এ ঘোষণার মাধ্যমে যখন আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করা হলো। তাদের মৌখিক ব্যাখ্যা সঠিক ধরা হলে উক্ত মতামতটি সঠিক কিন্তু তাদের উক্ত ঘোষণা পরবর্তী কার্যক্রম হতে বুঝা যায়, এ ঘোষণাটি সকল শক্তির পাশাপাশি আল্লাহ্‌র মালিকানার প্রতিও একটি চ্যালেঞ্জ। কেননা উক্ত ঘোষণাদানকারীরা যদি বিশ্বাস করতেন এ দেশের মালিক আল্লাহ্, তবে আল্লাহ্ ভিন্ন অপর কারো হুকুম কার্যকর করার স্পর্ধা দেখাতেন না। যেমন- আপনি আপনার মালিকানাধীন একটি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব অপর কোনো ব্যক্তির হাতে অর্পণ করলেন এবং পরিচালনার জন্য সুস্পষ্ট নীতি ও বিধি প্রণয়ন করে দিলেন। এক সময় ঐ ব্যক্তি ঘোষণা দিল এই প্রতিষ্ঠানের একচ্ছত্র অধিকারী সে নিজে এবং সে আপনার বিধি-বিধান ও নীতি রহিত করে নিজের তৈরি করা বিধি-বিধান ও নীতি দ্বারা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা শুরু করলো। এখন ঐ ব্যক্তি যদি আপনাকে বা আপনার পক্ষে কৈফিয়ৎ তলবকারী অপর কাউকেও বলে যে, 'আমি একচ্ছত্র অধিকারী বলতে প্রকৃত মালিকের মালিকানাকে অস্বীকার করিনি, বরং আমি পরিচালনার ক্ষেত্রে ক্ষমতাপ্রাপ্ত বলে ঘোষণা দিয়েছি এবং পরিচালনায় আমি ছাড়া আর কেউ ক্ষমতাপ্রাপ্ত নয়, তা বুঝাতে চেয়েছি' তখন আপনি কি তার এ বক্তব্যে সন্তুষ্ট হতে পারবেন? যেখানে সে আপনার সকল বিধি-নিষেধ অমান্য করে নিজের সিদ্ধান্ত কার্যকর করেছে। এখন চিন্তা করে দেখুন, যেখানে দেশের সার্বভৌমত্বের মালিক বাংলাদেশের জনগণ, ঘোষণা দেয়ার পর আল্লাহ্‌র সুস্পষ্ট বিধান থাকা সত্ত্বেও জনগণ তথা জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারা রচিত ও মনোনীত আইন দ্বারা দেশ পরিচালনা করা হচ্ছে, এরপরও কি আল্লাহ্‌র মালিকানাকে চ্যালেঞ্জ করা হয়নি? অথচ আল্লাহ্ বলেছেন;

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَ اَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَ لِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ۴۱

আমি যদি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করি, তাহলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে, সৎকাজের নির্দেশ দেবে ও অসৎ কাজ হতে নিষেধ করবে, আর সকল কাজের পরিনাম আল্লাহরই। -সূরা আল হজ্জ: ৪১

আইন প্রণয়ন ও শাসন ক্ষমতা : এ সকল রাজনৈতিক দলসমূহের ধারণা ও বিশ্বাসমতে দেশ, দেশের জনগণ কীভাবে পরিচালিত হবে, তা দেশের জনগণ স্থির করবে। যেহেতু দেশের সকল মানুষের সংখ্যাধিক্যের কারণে এ কাজে অংশগ্রহণ সম্ভব নয়, সেহেতু তাদের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি তথা সংসদ সদস্যগণ কর্তৃকই সকল আইন প্রণয়ন করা হয় এবং ঐ সরকার জনগণের নিরঙ্কুশ শাসনকর্তা হিসেবে ভূমিকা পালন করে। রাজনৈতিক দলসমূহের এই কার্য ও বিশ্বাস মুসলমান হওয়ার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কলেমা পাঠ করা ও ইসলাম অনুসরণের সিদ্ধান্ত নেয়া সত্ত্বেও এ জাতীয় কাজ ও ঘোষণা দিয়ে ইসলাম হতে বের হয়ে যায় এবং মুসলমানিত্বের অবসান ঘটে। এ ভয়াবহ বিষয়টি অনুধাবনের জন্য আমাদেরকে আইন প্রণয়ন ও জীবন ধারনের বিষয়ে ইসলামী নিয়ম-নীতি বুঝে নেয়া জরুরি। এ বিষয়ে যদিও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে, তথাপিও সংক্ষেপে আলোচনা দরকার মনে করছি। আলোচ্য দলসমূহের বিশ্বাস মতে জনগণই দেশের একচ্ছত্র অধিপতি, অতএব জনগণ তথা প্রতিনিধিগণই আইন প্রণয়নের একমাত্র অধিকারী এবং শাসন কতৃত্বও গণপ্রতিনিধিদেরই। অপরদিকে আল্লাহ্‌র ঘোষণানুসারে একমাত্র আল্লাহ্‌ই হলেন, এ দেশ তথা পৃথিবীর একচ্ছত্র মালিক। অতএব তাঁর আইনে দেশ চলবে এবং তাঁর প্রতিনিধি (খলিফা) কর্তৃক আল্লাহ্‌র পক্ষে আল্লাহ্‌র আইন দ্বারা দেশ শাসন করবে। আল্লাহ্ কালামে হাকীমে ঘোষণা করেন-

وَ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَ مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَ لَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ ؕ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّ مِنْهَاجًا ؕ

'তারপর হে মুহাম্মদ! তোমার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছি, যা সত্য নিয়ে এসেছে এবং আল কিতাবের থেকে তার সামনে যা কিছু বর্তমান আছে তার সত্যতা প্রমাণকারী ও তার সংরক্ষক। কাজেই তুমি আল্লাহ্‌র নাযিল করা আইন অনুযায়ী লোকদের বিভিন্ন বিষয়ে ফায়সালা করো এবং যে সত্য তোমার কাছে এসেছে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না। তোমাদের প্রত্যেকের জন্য একটি শরীয়ত ও একটি কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করে রেখেছি...।' –সূরা মায়েদাহ্: আয়াত ৪৮

وَ اَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَ لَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ وَ احْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْۢ بَعْضِ مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّصِيْبَهُمْ

بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ ؕ وَ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ ۴۹ ۔ اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ ؕ وَ مَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ۵۰

'কাজেই হে মুহাম্মদ! তুমি আল্লাহ্‌র নাযিল করা আইন অনুযায়ী তাদের যাবতীয় বিষয়ের ফায়সালা করো এবং তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না। সাবধান হয়ে যাও, এরা যেন, তোমাকে ফিত্‌নার মধ্যে নিক্ষেপ করে, সেই হিদায়াত থেকে সামান্যতমও বিচ্যুত করতে না পারে, যা আল্লাহ্‌ তোমার প্রতি নাযিল করেছেন। যদি এরা এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে জেনে রাখো, আল্লাহ্‌ এদের কোনো কোনো গুণাহের কারণে তাদেরকে বিপদে ফেলার সিদ্ধান্ত করে ফেলেছেন। আর যথার্থ তাদের অধিকাংশ ফাসিক (যদি এরা আল্লাহ্‌র আইন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়) তাহলে কি এরা আবার সেই জাহিলিয়াতের ফায়সালা চায়? অথচ যারা আল্লাহ্‌র প্রতি দৃঢ় প্রত্যয়ের অধিকারী তাদের দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র চাইতে ভালো ফায়সালাকারী আর কেউ নেই।'

–সূরা আল মায়েদাহ্‌: আয়াত ৪৯ -৫০

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ اُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ

'হে ঈমানদারগণ! আনুগত্য করো আল্লাহ্‌র, আনুগত্য করো রাসূলের এবং সেই সব লোকেরও যারা তোমাদের সামগ্রিক দায়িত্ব সম্পন্ন। অত:পর তোমাদের মধ্যে যদি কোনো ব্যাপারে মতবৈষম্যের সৃষ্টি হয়, তবে উহাকে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও; যদি তোমরা আল্লাহ্‌ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার হয়ে থাকো।' -সূরা আন্‌ নিসা: আয়াত ৫৯

উপরোক্ত আয়াতসমূহ হতে আমরা যে অনুসিদ্ধান্তে আসতে পারি, তা হলো:

- আইন দেয়ার একমাত্র অধিকারী আল্লাহ্‌।
- একমাত্র আল্লাহ্‌র আইন মেনে নেয়ার মাধ্যমে আনুগত্য করলেই মুসলমান হওয়া যায়, অন্যথায় সে মুসলমান হিসেবে গণ্য হবে না।
- আইন স্থির করা যেহেতু একমাত্র আল্লাহ্‌র রবুবিয়াতের বৈশিষ্ট্য, সেহেতু কেউ আল্লাহ্‌র আইনের অনুসরণের পরিবর্তে নিজেরা আইন তৈরি করলে মূলত: রবুবিয়াতের দাবিদার হয়ে কাফের ও খোদাদ্রোহী হয়ে যায়।
- যেহেতু একমাত্র আল্লাহ্‌র আইন মানার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র আনুগত্য কবুল করে নিয়ে মুসলমান হতে হয়, সেহেতু কেউ স্বেচ্ছায় আল্লাহ্‌র আইন মানার

পরিবর্তে ঐ সকল আইন প্রণেতাদের আইন মেনে নিয়ে তাদের আনুগত্য করার কারণে এবং তাদেরকে সমর্থন দিয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতাদানের কারণে ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করে।

- রাসূল সা. এর আনুগত্য করলে প্রকারান্তরে আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করা হয়।

এখন কথা হলো বাংলাদেশের রাজনীতিবিদরা কী করছেন? এবং তাদেরকে সমর্থন দিয়ে আমরা সাধারণ জনগণ কী করছি? এ সকল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অবস্থান কোথায় গিয়ে পৌঁছাচ্ছে এবং আমরাই বা কী পরিণতির শিকার হচ্ছি? ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। আল্লাহ্ বলেন–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ؕ

'আজ আমি তোমাদের আনুগত্যের বিধান পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জীবন বিধান হিসেবে মনোনীত করলাম।' –সূরা মায়েদা: আয়াত ৩

অতএব জীবনের এমন কোনো ক্ষেত্র নেই, এমন কোনো সমস্যা নেই, যার সমাধান ইসলাম দিতে সক্ষম নয়। কুরআন, সুন্নাহ্, ইজমা, কিয়াস, শরীয়তের এ চারটি উৎসের যে কোনোটি হতে আমরা আমাদের জীবন-বিধান খুঁজে নিতে পারি। কিন্তু এ সকল সেক্যুলার রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ সংসদে বসে আল্লাহ্‌র আইনের প্রতি সামান্যতম শ্রদ্ধাবোধ না রেখে নিজেদের ইচ্ছে-পছন্দমতো, জনগণের জন্য আইন প্রণয়ন করছেন এবং জনগণকে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ঐ সকল মানব রচিত আইনের আনুগত্য করতে বাধ্য করছেন। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র আইনের পরিবর্তে ব্রিটিশদের তৈরি করা আইন বহাল রাখছেন। যেখানে আল্লাহ্ সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি আমাদের জন্য একটি পরিপূর্ণ জীবন-বিধান দিয়েছেন এবং একে আমাদের একমাত্র জীবন বিধান হিসেবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সেখানে আমরা কোন্ বিশ্বাস ও স্পর্ধার বলে তাঁর বিধানকে পরিত্যাগ করে ব্রিটিশদের আইন ও নিজেদের আইনকে জীবন বিধান হিসেবে মেনে নিতে পারি? এটা কি প্রমাণ করে না যে, এ সকল আইন প্রণেতাগণ মনে করেন আল্লাহ্‌র আইন অচল বা তাদের তৈরি করা আইন অপেক্ষা অনুত্তম (নাউযুবিল্লাহ্)। যদি তারা এ ধারণার ভিত্তিতে আইন রচনা ও প্রয়োগ করেন, তবে আল্লাহ্‌র সাথে তদপেক্ষা বড় আর কোন ধৃষ্টতা দেখানো যেতে পারে? এরপর আল্লাহ্‌র উপর তাদের ঈমান থাকার দাবি কতোটুকু বাস্তবসম্মত? আল্লাহ্‌র একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা থাকা এবং কেবলমাত্র ঐ জীবন ব্যবস্থা অনুসরণের কঠোর নির্দেশ থাকার পরও যারা আল্লাহ্‌র আইনের অনুসরণ না করে, উহা পরিত্যাগ করে নিজেরা আইন প্রণয়ন ও তা প্রয়োগের

ধৃষ্টতা দেখায়, তারা প্রত্যক্ষভাবে খোদাদ্রোহিতায় লিপ্ত। তারা মোটেও ঈমানদার নয়। সুতরাং, আজকে এ সকল ধর্মহীন রাজনৈতিক দলসমূহের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করা, তাদেরকে সহযোগিতা করা, সমর্থন করা আমাদের পরকালীন জীবনের জন্য কতবড় ঝুঁকিবহুল তা বিবেচনার সময় এখনই।

জনপ্রতিনিধি মনোনয়নে নেতার বিবেচ্য যোগ্যতা : বাংলাদেশের প্রচলিত ধারার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নীতি অনুসারে দেশের জনগণ যেহেতু দেশের নিরঙ্কুশ মালিক, সেহেতু তারাই নির্ধারন করবেন, কে কোন বৈশিষ্ট্যের কারণে নেতৃত্বে আসার যোগ্য। এ লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলসমূহ তাদের ধ্যান-ধারণানুসারে যাদেরকে যোগ্য মনে করেন, তাদেরকেই সেই পদের জন্য মনোনীত করে জনগণকে আহ্বান জানান তাদের মনোনীত প্রার্থীকে নির্বাচিত করতে। এ সকল সেক্যুলার রাজনৈতিক দলসমূহ যোগ্যতা হিসেবে যা বিবেচনা করেন তা হলো–

প্রথমত: দলের প্রতি ও দলের শীর্ষ নেতার প্রতি আনুগত্য।

দ্বিতীয়ত: দলের আদর্শের প্রতি আস্থা।

তৃতীয়ত: তাকে মনোনীত করলে নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা কতোটুকু অর্থাৎ তার আর্থিক প্রাচুর্য, স্থানীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি ইত্যাদি।

চতুর্থত: দলের জন্য তার ত্যাগ বা ভূমিকা কতোবেশি গুরুত্বপূর্ণ।

যেহেতু আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য এ সকল দলের কাছে কোনো বিবেচ্য বিষয় নয়, সেহেতু উক্ত নেতার খোদাভীতি, ইসলামী জ্ঞান, তাক্ওয়া, আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য করার প্রবণতা মোটেও বিবেচনা করা হয় না এবং এ সকল দলের শীর্ষ নেতাদের মধ্যেও এর কোনোটি খুঁজে পাওয়া খুবই দুষ্কর। অথচ ইসলামী দৃষ্টিকোণ হতে দেশের বা রাষ্ট্রের নেতা হলো আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতিনিধি। সুতরাং, তাদের যে অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য থাকা অত্যাবশ্যক, তা হলো-

প্রথমত: আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ইচ্ছামতো দেশ পরিচালনার মতো যথার্থ ইসলামী জ্ঞান।

দ্বিতীয়ত: ব্যক্তিগত জীবনে ইসলাম চর্চায় যত্নশীলতা, প্রচণ্ড রকমের খোদাভীতি বা তাক্ওয়া ও আমানতদারীতা।

তৃতীয়ত: ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার মতো দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞা।

সুতরাং, নেতৃত্ব নির্বাচনে এ সকল দলের নীতি ইসলামের সাথে চরমভাবে সাংঘর্ষিক। অতএব কোনো মুসলমানের জন্য এ সকল সেক্যুলার রাজনৈতিক দলসমূহের মনোনীত প্রতিনিধিদেরকে নির্বাচিত করা কতোবেশি অন্যায় ও ধ্বংসাত্মক তা বিবেচনা করা প্রতিটি মুসলমানের জন্য খুবই জরুরি। আল্লাহ্ভীতি

ছাড়া কখনোই সৎ নেতৃত্ব তৈরি হতে পারে না। আর সৎ নেতৃত্ব ছাড়া সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় শান্তি এক আশাতীত বিষয়।

দেশের বিচার ব্যবস্থা : বিচার ব্যবস্থার জন্য দুটি বিষয় মূখ্য। একটি বিচার করার বিধি-বিধান অপরটি বিচারক। পূর্বে বহুবার আলোচিত হয়েছে দেশে বিদ্যমান রাজনৈতিক দলসমূহের বিশ্বাস মতে, যেহেতু দেশের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র এ দেশের জনগণ, সেহেতু এ দেশের জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা প্রণীত ও অনুমোদিত আইন দ্বারাই বিচারকার্য পরিচালনা করা হয়। বিচারকের যোগ্যতা কী হবে তাও এ সকল প্রতিনিধি কর্তৃক প্রণীত ও অনুমোদিত বিধি দ্বারাই নির্ধারিত হয়। সেমতে বাংলাদেশে বর্তমানে নেতৃবৃন্দ বহু নতুন নতুন আইন নিজেদের ইচ্ছা-পছন্দমতো তৈরি করছেন। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে অন্যান্যের তৈরি করা আইনকে বিচার কার্য পরিচালনার জন্য মনোনীত করছেন ও অনুমোদন দিচ্ছেন। যেমন-ফৌজদারী বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে অধিকাংশই বৃটিশদের তৈরি করা আইন মনোনীত ও অনুমোদন করা হয়েছে। অর্থাৎ তারা বিচারকার্য পরিচালনার জন্য যেখানে যে আইন যথার্থ বলে মনে করেছেন, সেখানে সেই আইন বহাল রেখেছেন এবং যে আইনকে ঐ ক্ষেত্রে অযোগ্য মনে করছেন সেই আইনকে মনোনয়ন দেননি। যেমন- বিবাহ ও মিরাস বন্টনের ক্ষেত্রে ইসলামী আইনকে যথার্থ মনে করা হয়েছে এবং অপরাপর সকল ক্ষেত্রে ইসলামী আইনকে তারা অচল মনে করেছে । আর তাই সে সকল ক্ষেত্রে ইসলামী আইন প্রয়োগের পরিবর্তে বিজাতীয় (বৃটিশ) দের আইন ধার করে প্রয়োগ করছে। যেখানে প্রয়োজন মনে করছে নিজেরাও আইন তৈরি করে নিয়েছে। বর্তমানে একটি গোষ্ঠী নারী পুরুষ সমতার কথা বলে মিরাস বন্টনের আইনেও পরিবর্তন করে আল্লাহ্‌র আইনকে পরিত্যাগ করার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। অথচ আইন দেয়ার একচ্ছত্র অধিকার একমাত্র আল্লাহ্‌র। যারা আল্লাহ্‌র এ কাজ নিজের হাতে তুলে নেয়, তারা মুসলমানিত্বের দাবি পূরণ করে না। যারা আইন প্রণয়ন করে, তারা সাধারণত: জনগণের আনুগত্য দাবি করে, যেখানে একমাত্র আল্লাহ্‌ই আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী। সুতরাং, এ সকল আইন প্রণেতারা আল্লাহ্‌র অবাধ্য। আর যারা আল্লহ্‌র এ সকল অবাধ্যদের প্রণীত ও অনুমোদিত অনৈসলামিক আইন দ্বারা বিচার করে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌ কালামে হাকীমে বলেছেন–

وَ مَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ۴۴

'আল্লাহ্‌র নাযিল করা আইন অনুযায়ী যারা ফায়সালা করে না, তারাই কাফির।'

-সূরা মায়েদাহ: আয়াত ৪৪

وَ مَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ۴۵

'আর যারা আল্লাহ্‌র নাযিল করা আইন অনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই জালিম।' -সূরা মায়েদাহ: আয়াত ৪৫

وَ مَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ۴۷

'আর যারা আল্লাহ্‌র নাযিল করা বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই ফাসিক।' -সূরা মায়েদাহ: আয়াত ৪৭

অথচ এ দেশে উত্তরাধিকার আইন এবং পারিবারিক আইন ছাড়া আল্লাহ্‌র আইন সম্পূর্ণ অচল। কেননা দেশের নিয়োজিত বিচারক ছাড়া আর কারোরই বিচার করার অধিকার নেই। আর সরকার বিচারক নিয়োগ করার ক্ষেত্রে ইসলামী আইনশাস্ত্রে তার কোনো যোগ্যতা ও দক্ষতা আছে কিনা, তা দেখারও প্রয়োজনবোধ করে না। কারণ উক্ত বিচারককে ঐ সকল অনৈসলামিক দল কর্তৃক গঠিত সরকারের তৈরি করা বিধি-বিধান দ্বারাই বিচার করতে হয়। সুতরাং, উক্ত বিচারকের এ সকল মানব রচিত আইন দ্বারা বিচার করার যোগ্যতা থাকাকেই যথেষ্ট মনে করা হয়। অতএব আজ বিচারের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র আইন ও ইসলামী বিধানমতে যোগ্য বিচারক-দুটিই উপেক্ষিত এবং সে স্থলে মানব রচিত আইন ও এ প্রচলিত আইনে বিচার করার যোগ্য বিচারকরাই প্রতিষ্ঠিত। যে সকল ব্যক্তিবর্গ এ সকল রাজনৈতিক দলের মূল নেতৃত্বে থেকে খোদাদ্রোহী কাজের আঞ্জাম দিচ্ছেন, তারা প্রত্যক্ষভাবে খোদাদ্রোহী এবং যারা তাদেরকে বিভিন্ন পর্যায় থেকে সহযোগিতা করছেন তারা খোদাদ্রোহীদের সহযোগী। একজন মুসলমানের বৈশিষ্ট্য হলো, সে সর্বদাই আল্লাহ্‌র আনুগত্যে ব্যাপৃত থাকবে। সে কখনোই খোদাদ্রোহীদের সহযোগিতা করতে পারে না। সুতরাং, এখনই সময় এ সকল রাজনৈতিক দলসমূহ সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞানার্জন ও নিজের মুসলমানিত্ব রক্ষা করে পরকালীন মুক্তি নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি : জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি কী হবে, তা নিয়েও ইসলামের সাথে এ সকল দলসমূহের বিরাট দ্বন্দ্ব রয়েছে। আমাদের দেশের একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের ঐক্যের ভিত্তি হলো ভাষা, যা আমাদের দেশের ভৌগলিক নিরাপত্তা ও ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে হুমকি স্বরূপ। আমরা ৫২ এর ভাষা আন্দোলন করে বাংলা ভাষাকে জাতীয় ভাষার মর্যাদা দিতে সক্ষম হয়েছি, তা আমাদের এক বিরাট প্রাপ্তি। কারণ, বাংলা আমাদের জন্য আল্লাহর দেয়া ভাষা। কিন্তু ঐক্যের ভিত্তি যদি ভাষা হয়, তবে আমরা কি চিন্তা করেছি যে, আমাদের ভৌগলিক

সীমানার বাইরেও যে বাংলাভাষী মানুষ রয়েছে, তাদের সাথেও ঐক্য হয়ে যায়। অথচ ভৌগলিক কারণে তাদের কাছ থেকে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ কি আমরা আদৌ আশা করতে পারি? এপার বাংলা ওপার বাংলার অজুহাতে দুই দেশের একত্রীকরণ যদি ঐ বাঙ্গালীরা দাবি করে, তবে কি তা আমাদের দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য কখনো কল্যাণ বয়ে আনতে পারে? অপরদিকে আমাদের দেশের ভিতরেও উপজাতিদের ভাষা বাংলা নয়। ফলে তারা কি আপনার সাথে বিরুদ্ধাচরণ করবে না? অপরদিকে আমাদের সব থেকে বড় পরিচয় হলো আমরা মুসলমান। যদি আমরা বাংলা ভাষার ভিত্তিতে ঐক্য তৈরি করি আর এর বাইরের ভাষার লোকদেরকে এই দলের বাইরে রাখি তবে রাসূল সা. এর ভাষাতো বাংলা ছিল না। এখন রাসূল সা. এর সাথে কিসের ভিত্তিতে ঐক্য স্থাপিত হবে? রাসূল সা. এর দলভুক্ত না হয়ে কি নিজেকে মুসলমান দাবি করা যায়? আশা করা যায় পরকালীন মুক্তি?

অপর একটি বৃহৎ দলের ঐক্যের ভিত্তি হলো ভৌগলিক জাতীয়তাবাদ। তথাপিও এটি আমাদের দেশের নিরাপত্তার জন্য ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ অপেক্ষা কম ক্ষতিকর–যদিও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হতে কল্যাণময় নয়। বরং ইসলাম ও ঈমানের পরিপন্থী। অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশের ভৌগলিক অখণ্ডতা রক্ষা করা এবং দেশের স্বাতন্ত্রতা/স্বাধীনতা রক্ষা করা আমাদের অস্তিত্ব ও ঈমানের সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু এই একমাত্র ভৌগলিক সীমার মধ্যে অবস্থানকারীদেরকে ঐক্যভুক্ত করা একজন মুসলমানের জন্য কখনোই কল্যাণকর নয়। ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ভিত্তিতেই মুসলমানের মধ্যে ঐক্য হতে পারে না। কারণ এতে একজন মুসলমান অপর মুসলমান হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যদিও বড়ই দু:খজনক যে, পৃথিবীর প্রায় সব কয়টি দেশই আজ ভৌগলিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। অথচ রাসূল সা. বলেছেন–

'যে জাতীয়তাবাদের দিকে মানুষকে আহ্বান করে, জাতীয়তাবাদের জন্য যুদ্ধ করে, জাতীয়তাবাদের জন্য মৃত্যুবরণ করে, সে আমার দলভুক্ত নয়।'

(আবূ দাউদ)

জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি হিসেবে আমরা যদি এ দুটি ভিত্তিকে ত্যাগ করে একমাত্র ইসলামকে জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করি, তবে তা আমাদের ভৌগলিক অখণ্ডতা রক্ষা এবং ঈমান রক্ষার ক্ষেত্রে একটি মাইল ফলক হতে পারে। আমাদের দেশের অখণ্ডতা ও স্বাধীনতা রক্ষার ক্ষেত্রে এই ঐক্য এমনই এক প্রেরণা যোগাতে পারে যে, কোনো শত্রু রাষ্ট্র এর উপর আক্রমন চালালে কোনো একজন মুসলমানেরও জীবন দেহাভ্যন্তরে থাকাকালে শত্রুরা সফল হতে পারবে না। কারণ

আমাদের দেশ যে দেশ দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, সে দেশটি অমুসলমান অধ্যুষিত। সে দেশ যদি কোনো দিন কোনোভাবে আমাদের দেশের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়, তবে আমাদের মুসলমানদের পক্ষে ইসলামী নিয়ম-নীতি পরিপালন কতোবেশি কঠিন হয়ে পরবে, তা কারোরই অজ্ঞাত নয়। সুতরাং, ইসলামের ভিত্তিতে ঐক্য তৈরি করতে হলে ঐ ঐক্যই হবে আমাদের দেশের জন্য সর্বাধিক নিরাপদ। বিগত ২০০১ সালের নির্বাচনে মানুষ কোনো দলের আদর্শে অভিভূত হয়ে ভোট দিয়েছে মনে করলে বিরাট ভুল হবে। এ দেশের মানুষ মূলত ইসলামী ঐক্যের ভিত্তিতেই ভোট দিয়েছে। জনসাধারণ মনে করেছে ঐ বিশেষ দলটি পুনরায় ক্ষমতায় আসলে মুসলমানদের ধর্মীয় মূল্যবোধ পর্যুদস্ত হবে, লাঞ্ছিত হবে মুসলমান ব্যক্তিত্ব ও এ দেশকে হয়তো বরণ করে নিতে হবে অপর কোনো অমুসলমান দেশের পরোক্ষ গোলামী। আর তাই এ দেশের জনগণ নিজেদের ধর্মীয় মূল্যবোধ রক্ষার্থেই 'মন্দের ভালো' নীতিকে ভোট দিয়েছে। সে যাই হোক আমাদেরকে একমাত্র ইসলামী ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতেই জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। কেননা আল্লাহ্ কালামে হাকীমে বলেছেন–

وَ اعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّ لَا تَفَرَّقُوْا ۠ وَ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖٓ اِخْوَانًا ۚ

'তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর রশিকে শক্ত করে আকড়ে ধরো এবং কখনো পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহর সেই নেয়ামতের কথা স্মরণ করো- যখন তোমরা একে অপরের দুশমন ছিলে, আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের একের জন্য অপরের ভালোবাসার সঞ্চার করে দিলেন, অত:পর তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহে একে অপরের ভাই হয়ে গেলে।

-সূরা আলে ইমরান; ১০৩

وَ لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَ اخْتَلَفُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ۚ وَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۙ ١٠٥

'তোমরা তাদের মতো হয়ে যেয়ো না, যাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার পরও তারা বিভিন্ন দলে উপ-দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং নানা ধরনের মতানৈক্য সৃষ্টি করেছে। এ ধরনের মানুষদের জন্য কঠোর শাস্তি রয়েছে।

-আলে ইমরান-১০৫

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۚ ١٠

মোমেনরা তো (একে অপরের) ভাই, অতএব তোমাদের ভাইদের মধ্যে মিমাংসা করে দাও, আল্লাহকে ভয় করবে-যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও। -হুজরাত; ১০

সুতরাং, যে সকল দল ইসলামকে ঐক্যের ভিত্তি মনে করার পরিবর্তে অপর কোনো ভিত্তির মাধ্যমে ঐক্য সৃষ্টি করতে চায়, কোনো মুসলমান ঐ দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলে স্বাভাবিক কারণে ইসলামী ঐক্যের বাইরে চলে যায়। কেননা মুসলমানের ঐক্যের একমাত্র ভিত্তি হলো 'ইসলাম'।

দলের প্রতিষ্ঠাতার আদর্শ বাস্তবায়ন : মূলত ধর্মহীন রাজনৈতিক দলসমূহ স্বীয় দলের প্রতিষ্ঠাতার প্রতি আনুগত্য, আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা ও তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই কাজ করে এবং এ ঘোষণাদানের মাধ্যমে রাজনীতি পরিচালনা করে। এ সকল দলসমূহ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন ব্যক্তিগণ দ্বারা গঠিত হয়েছে এবং দল গঠনকালে দলের প্রতিষ্ঠাতাগণ বিভিন্ন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কর্মপদ্ধতি ঘোষণা করেছেন এবং দলের প্রতিষ্ঠাতা ঘোষিত সেই লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি অনুসারেই পরিচালিত হয়। এ সকল দল নেতাগণের তিরোধানের পরও দলভুক্ত ব্যক্তিগণ তাদের প্রদর্শিত পথে কমবেশি পরিবর্তন সাপেক্ষে পরিচালিত হয়। কোনো ব্যক্তি ঐ সকল দলের কোনো একটির অন্তর্ভুক্ত হলে সে ঐ দলের আদর্শে বিশ্বাসী ও দল প্রধানের আনুগত্যকারী হয়ে যায়। এখন আসুন এটি কীভাবে ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক এবং এর দ্বারা একজন মুসলমান কীভাবে মুসলমান হওয়ার মর্যাদা পর্যন্ত হারাতে পারে, তা আমরা বিবেচনা করি। আল্লাহ্ কালামে হাকীমে বলেছেন–

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَ الْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَ ذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ٢١

'(হে মুসলমানরা) তোমাদের জন্যে অবশ্যই আল্লাহর রাসূলের (জীবনের) মাঝে অনুকরণযোগ্য উত্তম আর্দশ রয়েছে। (আদর্শ রয়েছে) এমন প্রতিটি ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ তায়ালার সাক্ষাৎ পেতে আগ্রহী এবং যে পরকালের (মুক্তির) আশা করে, (সর্বোপরি) যে বেশি পরিমানে আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করে।'

-সূরা আল-আহযাব;২১

এবং আমরাও কালিমা পাঠের মাধ্যমে ঘোষণা দিয়েছি মুহাম্মদ সা. আল্লাহ্র রাসূল এবং আমরা একমাত্র তাঁরই অনুসরণে অঙ্গীকারবদ্ধ।

সুতরাং, কোনো ব্যক্তি মুসলমান হওয়ার অর্থই হলো-

- সে বিশ্বাস করবে একমাত্র রাসূল সা. এর মধ্যেই রয়েছে উত্তম আদর্শ।
- ব্যক্তিগত জীবনে একমাত্র রাসূল সা. এর আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন, আস্থা স্থাপন, অনুসরণ ও বাস্তবায়নের জন্য সংগ্রাম করতে হবে।

- পারস্পরিক সাংঘর্ষিক দুটি আদর্শ একই সাথে অনুসরণ সম্ভব নয়। লক্ষ্য করুন, সেক্যুলার রাজনৈতিক দলসমূহের অনুসরণীয় আদর্শ নেতাদের আদর্শের সাথে রাসূল সা. এর আদর্শ কীভাবে সাংঘর্ষিক? আমরা হাজারো সাংঘর্ষিক বিষয় হতে কতিপয় উল্লেখ করছি;

- রাসূল সা. একমাত্র আল্লাহ্‌র গোলামী গ্রহণ করে নিয়ে আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দাহ হয়ে যাওয়ার জন্য মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আইন অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দাহ হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। পক্ষান্তরে এ সকল ব্যক্তিবর্গ মানুষকে আল্লাহ্‌র আইনের পরিবর্তে মানুষের তৈরি করা আইন অনুসরণে বাধ্য করছে। যেমন- বাংলাদেশে প্রচলিত সিংহভাগ আইনই মানব রচিত। উক্ত নেতাগণ এই মানব রচিত আইন দ্বারা দেশ পরিচালনা করে মানুষকে আল্লাহ্‌র আইনের পরিবর্তে মানুষের আইনে চলতে বাধ্য করছে।
- রাসূল সা. একমাত্র ইসলামকেই দ্বীন/জীবন বিধান বা আইনের উৎস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন, পক্ষান্তরে এ সকল নেতাগণ বৃটিশদের তৈরি করা আইন ও ইসলাম অনুসরণ ব্যতিরেকে সংসদে মানুষ কর্তৃক তৈরি করা আইনকে জীবন-বিধান বা আইনের উৎস বলে গ্রহণ করে নিয়েছেন।
- কুরআন যাকে হারাম করেছে, রাসূল সা. তাকে হারাম করেছেন এবং কুরআন যাকে হালাল করেছে, রাসূল সা. তাকে হালাল করেছেন। অপরদিকে যে সকল বিষয় জনগণের কোনো উপকারে আসতে পারে বলে ঐ নেতারা মনে করেছেন, তাকে বৈধতা দিয়েছেন আবার যা জনগণের স্বার্থের পরিপন্থী বলে মনে করেছেন তাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। যেমন- মদ্যপান ও পতিতাবৃত্তি ইসলামে চূড়ান্তভাবেই নিষিদ্ধ। কিন্তু ঐ সকল নেতাগণ তা অনুমোদিত বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। অপরদিকে ইসলামে ১৮ বছর বয়সের নিচে মেয়েদের বিবাহ হালাল। কিন্তু ঐ সকল নেতৃবৃন্দ তাকে হারাম বলে ঘোষণা দিয়েছেন। সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ কিন্তু এ সকল নেতৃবৃন্দের সরকারের আর্থিক নীতিতে সুদ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। যাকাত দেয়া ইসলামে বাধ্যতামূলক কিন্তু ঐ সকল নেতৃবৃন্দের বিবেচনায় তার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, ইত্যাদি হাজারো বিষয়।
- নেতৃত্ব, শাসক ও বিচারক নির্বাচনের ক্ষেত্রে রাসূল সা. এর আদর্শ অনুসারে মূখ্য বিবেচ্য বিষয় হলো ইসলামী জ্ঞান ও তাকওয়া। পক্ষান্তরে এ সকল দলনেতাদের ক্ষেত্রে নেতৃবৃন্দের পদ, শাসক ও বিচারক হিসেবে নির্বাচনের ক্ষেত্রে ইসলামী জ্ঞান ও তাকওয়া কোনো বিবেচ্য বিষয়ই নয়।

- রাসূল সা. এর আদর্শ অনুসারে পার্থিব জীবনে দায়িত্বশীলের আনুগত্য ও জবাবদিহিতা এবং পরকালে আল্লাহ্‌র কাছে চূড়ান্ত জবাবদিহিতা এবং জান্নাত ও জাহান্নামই হলো শাসনকার্য পরিচালনার মূল ভিত্তি। পক্ষান্তরে এ সকল দলসমূহের নেতাদের আদর্শ অনুসারে জনসাধারণ, সংসদ বা দেশের প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট জবাবদিহীতা এবং সরকারের পুন:নির্বাচন, অভিশংসন ও বিভিন্ন আর্থিক ও শারীরিক শাস্তিই হলো সরকার পরিচালনার মূল ভিত্তি।

উপরোক্ত বিষয়সমূহ হতে প্রতীয়মান হলো যে, ঐ সকল নেতৃবৃন্দ মুসলমানের ঔরসে জন্মগ্রহণ করার সূত্রে মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তাদের আদর্শ ছিল রাসূল সা. এর আদর্শের সাথে সাংঘর্ষিক। সুতরাং, যে সকল মানুষ রাসূল সা. এর আদর্শ অনুসরণ করার অঙ্গীকার করেছে, তারা ঐ সকল নেতাদের আদর্শ অনুসরণ করতে পারে না এবং তাদের আদর্শের প্রতি আস্থা স্থাপন করতে পারে না। যদি কোনো ব্যক্তি হৃদয় নিঃসৃত মৌখিক ঘোষণা ও বাস্তব কার্যাদীর মাধ্যমে ঐ সকল দলের কেন্দ্রীয় (চরিত্র) নেতার আদর্শের প্রতি আস্থা প্রকাশ করে ও অনুসরণে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়, সে রাসূল সা. এর আদর্শ অনুসরণের অঙ্গীকার প্রকারান্তরে প্রত্যাহার করে নেয়। মৃত্যুর পর যখন প্রশ্ন করা হবে তোমার নবী কে, বা তুমি কার আদর্শ অনুসরণ করে এসেছো তখন ঐ সকল দলের সদস্যগণ প্রকৃতার্থে রাসূল সা. এর অনুসরণ না করা সত্ত্বেও কি রাসূল সা. কে নিজের নবী বা অনুসৃত নেতা হিসেবে ঘোষণা দিতে সক্ষম হবে?

শিক্ষাব্যবস্থা : আল্লাহ্‌ প্রতিটি মানুষের জন্য একমাত্র ইসলামকে জীবন-বিধান হিসেবে মনোনয়ন দিয়েছেন এবং এর বাইরে কোনো দ্বীন গ্রহণ করে নেয়া হবে না। মানুষ যদি এ জীবন-বিধানের বাইরে কোনো জীবন-বিধান তালাশ করে তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। আল্লাহ্‌ বলেন-

وَ مَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَ هُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۸۵

'যদি কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো জীবন বিধানের অনুসন্ধান করে, তবে তার কাছ থেকে তার সেই (উদ্ভাবিত) ব্যবস্থা কখনো গ্রহণ করা হবে না, পরকালে সে হবে চরম ব্যর্থ।' -আলে ইমরান; ৮৫

কোনো মানুষকে কোনো একটি পথ ধরে চলতে হলে তাকে ঐ পথটি জানতে হবে আগে। কোনো মানুষ যখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে, তখন তাকে প্রথমে জানতে হবে ইসলাম কী? অত:পর ইসলাম পালন করা। আল্লাহ্‌ মনোনীত জীবন ব্যবস্থা ইসলামের মূল দুটি বিষয় হলো কুরআন ও সুন্নাহ্‌। কোনো মানুষ যদি মনে

করে আখেরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন আর এ দুনিয়া ঐ জীবন যাত্রার মান নিরুপনের একটি ক্ষেত্র মাত্র। তবে ঐ ব্যক্তির কাছে সর্ব প্রথম গুরুত্ব পাবে ইসলামী জ্ঞান। যখন কোনো ব্যক্তি রাসূল সা. এর হাতে ইসলাম কবুল করতেন, তখনই রাসূল সা.তাকে কুরআন শিক্ষা দিতেন। রাসূল সা. এর সাহাবাগণও কুরআন শিক্ষা গ্রহণ করতেন, যে কোনো বিষয়ে রাসূল সা. এর নির্দেশনা নিতেন এবং পাশাপাশি পেশা শিক্ষাও গ্রহণ করতেন। সেই দিক থেকে মুসলমান হিসেবে আমাদের কর্তব্য হলো আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় সর্বোচ্চ স্থানে ইসলামী শিক্ষাকে স্থান দিয়ে এর পাশাপাশি পেশা শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে দক্ষ নাগরিক তৈরি করা। এতে করে দেশ দুটি কল্যাণ লাভ করতে পারে। প্রথমত: ইসলামী শিক্ষা গ্রহণের কারণে দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া সকলে আল্লাহ্‌র উপর আস্থা ব্যাপকভাবে অর্জন করবে, তাকওয়া বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবে। এতে তাদের মধ্যে সততা নামের দূর্লভ একটি গুণ সৃষ্টি হবে। আর পেশা শিক্ষা গ্রহণ করার মাধ্যমে তারা দক্ষতা অর্জন করতে পারবে। সততার সাথে দক্ষতাকে কাজে লাগালে দেশ ও জাতির উন্নতি না হওয়ার কোনো কারণ থাকতে পারে না। অপরদিকে দেশের নাগরিকগণও আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভ করে ও ইসলাম অনুশীলন করার মাধ্যমে উন্নত চরিত্র অর্জন করে পরকালীন জীবনে মুক্তি অর্জন করে চিরস্থায়ী সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হবে। অথচ ইতিপূর্বে যে সকল রাজনৈতিক দল দেশ পরিচালনা করেছে এবং বর্তমানে যারা করছে, তাদের শিক্ষানীতিতে ইসলামকে একটি ঐচ্ছিক ও চতুর্থ বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ফলে দেশের মানুষ আল্লাহ্‌কে চিনতে পারছে না। আখিরাত কি, তা জানতে পারছে না। জান্নাত-জাহান্নামের বিষয়ে প্রত্যয় সৃষ্টি হচ্ছে না। ফলে ইহকালীন জীবনের অপরাধের পরিণতির বিষয়েও তাদের কোনো অনুভূতি জাগ্রত হতে পারছে না। ফলে তারা তাদের পেশাগত দক্ষতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সততার প্রয়োগ করছেন না। এ সকল অসৎ লোকজনের পদচারণার কারণে মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র নীতিহীনতায় আবদ্ধ হয়ে পরেছে এবং জনজীবন অতিষ্ট হয়ে উঠেছে। অতএব আজকে যারা ধর্মহীন রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে জড়িত এবং যারা সমর্থন দানের মাধ্যমে সেক্যুলার রাজনীতিবিদদেরকে দেশে প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছেন, তাদের সকলেই আল্লাহ্‌র কুরআনের শীতলতা হতে দেশের জনগণকে বিমুখ রাখছেন। অতএব এখন বিবেচনা করার সময় একজন মুসলমানের জন্য এ সকল সেক্যুলার দলসমূহের সহযোগিতা কতোটুকু বিধিসম্মত।

দলের প্রতিষ্ঠাতাদের পূজা অর্চনা করা : ইসলাম মূর্তি পূজাকে চিরতরে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে।

মুসলিম বর্ণনা করেছেন, আমরা মাসরুকসহ ইয়াসার ইবনে নুমাইর-এর ঘরে ছিলাম। মাসরুক তাঁর ঘরে কতোগুলো মূর্তি দেখতে পেলেন। তখন তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, আমি নবী সা.কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে কঠিন আজাব হবে ছবি নির্মাতাদের। -সহীহ আল বুখারী-৫৫১৮

আবু যুরআ বর্ণনা করেছেন, আবূ হুরায়রা রা. সহ আমি মদিনায় এক বাড়িতে প্রবেশ করলাম। তিনি দেখতে পেলেন একজন ছবি নির্মাতা গৃহের উপরে ছবি অংকন করছে। তখন তিনি বললেন, আমি রাসূল সা. কে বলতে শুনেছি, (আল্লাহ তা'আলা বলে থাকেন) আমার সৃষ্টির মতো করে যে লোক (কোনো প্রাণী) সৃষ্টি করতে যায়, তার চেয়ে বড় যালিম আর কে আছে? তাহলে তারা একটি শস্য দানা এবং একটি অনুকনা সৃষ্টি করুক তো দেখি।

-সহীহ আল বুখারী-৫৫২১

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। মক্কা বিজয়ের বছর তিনি রাসূল সা. কে বলতে শুনেছেন, সেই সময় তিনি মক্কাতেই অবস্থানরত ছিলেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল শরাব, মৃতজন্তু, শুকর ও মূর্তি ক্রয়-বিক্রয় হারাম ঘোষণা করেছেন।

-সহীহ আল বুখারী-২০৭৭

মূর্তি পূজাতো অনেক দূরের ব্যাপার, কোনো প্রাণীর ছবি অঙ্কন, সংরক্ষণও ইসলামে নিষিদ্ধ। অতএব কোনো মানুষের অন্তরে যদি ঈমানের লেশমাত্র অবশিষ্ট থাকে, তবে সে মূর্তিপূজায় রত হতে পারে না। মূর্তিপূজায় অংশগ্রহণকারী কোনো দল, গোষ্ঠীর আদর্শকে গ্রহণ করতে ও নিজেকে তাদের সাথে একাকার করে দিতে পারে না। ইব্রাহীম আ. এর জীবন চরিত হতে আমরা দেখতে পাই তিনি চরম প্রতিকূলতায় জীবন বাজি রেখে মূর্তিপূজারীদের মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। রাসূল আকরাম সা. মক্কা বিজয়ের পর প্রথম যে কাজটি করেছিলেন, তা হলো আল্লাহ্‌র ঘরে রক্ষিত মূর্তিসমূহকে নিজ হাতে চূর্ণ করা। অথচ অনেকে মুসলমান হয়েও আজ নির্দ্বিধায়, অসংকোচে মূর্তিপূজারী দলের সাথে একাকার হয়ে আছে। অবশ্য এর জন্য তাদের জ্ঞানের স্বল্পতা প্রধানত: দায়ী। অনেক মানুষ জানে না কোন কোন বিষয়সমূহ মূর্তিপূজার অর্ন্তভুক্ত হবে। পূজা বলতে কেবলমাত্র দেবতাদের মূর্তির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনকে বুঝায় না। কা'বা ঘরে রক্ষিত যে সকল মূর্তিসমূহ চূর্ণ করা হয়েছিল, তার সব কয়টি দেবতাদের ছিল না। কিছু কিছু মূর্তি ছিল তাদের পূর্ব পুরুষদের, যাদেরকে নিয়ে তারা গৌরববোধ করতো। মূলত:

শ্রদ্ধা নিবেদনের লক্ষ্যে কোনো ব্যক্তির আকৃতি খচিত করা, মৃত্তিকা, মেটাল, লৌহ ইত্যাদি যে কোনো বস্তু দিয়ে আকৃতি তৈরি করা এবং শ্রদ্ধাভরে সংরক্ষণ করা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা পূজার অন্তর্ভুক্ত। আমরা যদি দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনের প্রধান দু'টি দলের দিকে তাকাই দেখব দলীয়ভাবে তারা মূর্তিপূজায় ব্যস্ত। এমনকি কোনো শীর্ষ নেতার পক্ষে এ পূজায় অংশগ্রহণ না করে রাজনীতি করা সম্ভব নয় বলে প্রতীয়মান হয়। এর একটি উদাহরণ হলো: বাংলাদেশের জনৈক প্রেসিডেন্ট কর্তৃক কোনো একটি বিশেষ দিনে স্বীয় নেতার কবরের পার্শ্বে উপস্থিত হয়ে পুস্পস্তবক অর্পণ না করার কারণে তাঁকে প্রেসিডেন্ট পদ থেকে সরিয়ে দেয়া। আমরা যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ দিয়ে পলাশির মোড় হয়ে ফুলার রোড দিয়ে যাতায়াত করি, দেখতে পাবো কথিত জাতির জনকের আকাশচুম্বি বিশাল মূর্তিটি ঠাঁয় দাঁড়িয়ে আছে, আর তাকে বহন করছে উলঙ্গ কয়টি নারী দেহ। তার চারপাশে রয়েছে আরও অজগ্র মূর্তি। এ সকল মূর্তির পদতলে হয়তো নেতা নেত্রীরা মাথা নত করে না, তবে তারা পুস্পস্তবক অর্পণকে কর্তব্য গণ্যকরতে কার্পণ্য করে না। অপর একটি দলের প্রধান কার্যালয়ের নীচতলায় রয়েছে দলীয় প্রতিষ্ঠাতার বিশালদেহী পাথর মূর্তি। বিশেষ বিশেষ দিনগুলোতে তারা তাদের নেতাদের বেদীতে পুস্পস্তবক অর্পন করেন। ইসলামের সাথে প্রধান প্রধান দলগুলোর এই যে বিশাল সংঘাত, তা অবলোকন করার পরও কোনো ব্যক্তি যদি এ সকল দলের প্রতি আস্থা রেখে নিজেকে মুসলমান মনে করে, তবে তার মুসলমান মনে করার এ আত্মতৃপ্তি তার কতোখানি কাজে আসতে পারে?

এই সূদীর্ঘ আলোচনার যে মূল প্রতিপাদ্য বিষয় তা হলো–

- ইসলাম একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্র জীবন ব্যবস্থা।
- বর্তমানে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠিত রয়েছে একটি মানব রচিত অসম্পূর্ণ ও ধার-কর্য সমেত ধর্মহীন জীবন ব্যবস্থা।
- সেক্যুলার রাজনৈতিক দলসমূহ হলো বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত ধর্মহীন জীবন ব্যবস্থার প্রণেতা, ধারক, বাহক ও সংরক্ষক।
- একই ব্যক্তি একই সাথে সমান্তরালভাবে পরস্পর সংঘর্ষপূর্ণ দুটি পৃথক জীবন ব্যবস্থার অনুসারী হতে পারে না।
- যে ব্যক্তি ইসলাম কবুল করে মুসলমান হওয়ার ঘোষণা দিয়েছে, সে অন্য কোনো জীবন-বিধান অনুসরণ করতে পারে না এবং অন্য কোনো জীবন-বিধানের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না।
- যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অপর কোনো জীবন-বিধানের প্রতি আস্থা স্থাপন করার ঘোষণা দিয়েছে, তার পক্ষে ইসলামের পরিপূর্ণ অনুসরণ সম্ভব নয় এবং

ইসলামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও আল্লাহ্‌র এবং তাঁর রাসূল সা. এর প্রতি ঈমান আনার ঘোষণাটি আদৌ বাস্তবসম্মত নয়।

সুতরাং, কোনো ব্যক্তি যখন ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ব্যতীত দেশে প্রচলিত বা নতুন এমন কোনো দলের নেতৃত্ব দেয়, কর্মী হিসেবে কাজ করে বা মনেপ্রাণে সমর্থন দেয় তখন আর ঐ ব্যক্তির মুসলমান দাবি করার অবকাশ থাকে না। কেননা, সে ইসলামকে নিজের জীবন-বিধান ঘোষণা দেয়া সত্ত্বেও অপর একটি জীবন-বিধানকে নিজের জীবনের জন্য নির্দিষ্ট করে নিয়েছে। অতএব আজকে যারা মুসলমান পরিচয় নিয়ে সমাজে অবস্থান করছে অথচ এ সকল সেক্যুলার দলের সাথে জড়িত রয়েছে তাদের কর্তব্য হলো এ কাজের পরিণতি কতোবেশি ভয়াবহ তা বুঝা এবং স্বীয় কর্তব্য সম্পর্কে চিন্তা করা। অন্যথায় মৃত্যুর মাধ্যমে ইহকালীন জীবনাবসানের পর হয়তো জাহান্নাম এসে উপস্থিত হয়ে যাবে, যখন আল্লাহ্‌কে ছাড়া আর কাউকেও সাহায্যকারী হিসেবে পাওয়া যাবে না।

যারা আজ এ সকল রাজনৈতিক দলসমূহের সাথে জড়িত রয়েছে তারা হয়তো বিষয়টিকে এভাবে চিন্তা করছেন-

(১) রাজনীতি বৈষয়িক জীবনে মর্যাদা বৃদ্ধির একটি উপকরণ মাত্র। ধর্মীয় বিষয়ের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

(২) দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার সম্ভবনা ক্ষীণ। সুতরাং, অপেক্ষাকৃত কম মন্দ এরূপ দলের সাথে থাকলে অধিক মন্দ দল কর্তৃক ইসলাম কম ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা যা করছেন, তা হলো-

(১) ইসলাম একটি দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা এবং তিনি যে দলের রাজনীতি করছেন ঐ দলের মাধ্যমে দেশ যে নীতিতে শাসিত হবে, তাও একটি জীবন ব্যবস্থা। ইসলাম আল্লাহ্‌র আইন ও আদেশ আর ঐ রাষ্ট্রীয় আইন মানুষের আইন ও মানুষের আদেশ। মুসলমানদের আদেশকর্তা হলেন আল্লাহ্ আর এই রাষ্ট্রের নাগরিকদের আদেশকর্তা হলো মানুষ। তিনি যখন কলেমা পাঠ করেছেন, তখন এ সকল আদেশকর্তা ও উপাস্যদেরকে অস্বীকার করে একমাত্র আল্লাহ্‌কে আদেশকর্তা ও উপাসক হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি যখন বাস্তবে ঐ দলে যুক্ত ছিলেন, তখন ইসলাম প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে ঐ দলের আদর্শ প্রতিষ্ঠায় সংগ্রামরত হলেন। ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হতে হলে এ মানব মতবাদ অপসারণ করে তদস্থলে প্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি মানব মতবাদের প্রতিষ্ঠাকে মজবুত করার মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজে অসহযোগিতা, বিরোধিতা করলেন। আল্লাহ্ আদেশ করছেন ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করতে আর তিনি ইসলাম প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছেন। এতে দুনিয়াতে সামান্য মর্যাদা বৃদ্ধি

হতে পারে হয়তো কিন্তু আল্লাহ্‌র আদেশের প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করার কারণে আখিরাতে চরমভাবে লাঞ্ছিত হবেন। সুতরাং, ভেবে দেখা জরুরি ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করবে, না ইসলাম ভিন্ন অপর কোনো জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের জন্য কাজ করে দুনিয়ায় সামান্য তথাকথিত মর্যাদা লাভ করে আখিরাতে খোদাদ্রোহীদের কাতারে দাঁড়িয়ে লাঞ্ছনাকে নিজের জন্য নির্ধারণ করে নেবে?

(২) যখন সমাজের অধিকাংশ মানুষ হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে, তখন ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে। আর মানুষকে হিদায়াত করার কোনো ক্ষমতা কোনো মানুষের নেই। এ ইখতিয়ার একমাত্র আল্লাহ্‌র। তিনি যাকে চাইবেন তাকে হিদায়াত দেবেন। মানুষের দায়িত্ব-কর্তব্য হলো আল্লাহ্‌র আদেশ মান্য করা। আর আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করার আদেশ আল্লাহ্‌ দিয়েছেন। তিনি এমন আদেশ দেননি যে, ইসলামের কল্যাণে তাগুতের সাথে থেকে তাগুতকে শক্তিশালী করতে। সুতরাং, মানুষের কর্তব্য হলো আল্লাহ্‌র আদেশ পালন করা। যে আল্লাহ্‌র আদেশ পালন করবে সে মুসলমান। আর যে আল্লাহ্‌র আদেশ পালন করতে অস্বীকার করবে সে কাফির। মানুষ কোনো অজুহাত দাঁড় করিয়ে আল্লাহ্‌র আদেশ পালন হতে বিরত থাকলে সেও মুসলমান হতে পারে না। লুত আ. সমগ্র জীবন অতিবাহিত করে কাউকেও মুসলমান বানাতে পারেননি। তাই বলে কি তিনি অমুসলমানদের সাথে একাকার হয়ে গিয়েছিলেন? না আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠায় চেষ্টারত ছিলেন? সমাজের অবস্থার পরিপেক্ষিতে ইসলাম প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় বলে কি তিনি কাফেরদের দলে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন? কখনো নয়। ইব্রাহীম আ. কি চিন্তা করেছিলেন যে, এ সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় অতএব ওদের সাথে বিরোধ করে কী লাভ? মূলত: ইসলাম প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়, সুতরাং ইসলামী আন্দোলন করে লাভ নেই এটি একটি শয়তানী ধ্যান-ধারণা। কেউ যদি মুসলমান হন, তবে ফলাফলের দিকে না তাকিয়ে আল্লাহ্‌র আদেশ পালন করা তার কর্তব্য। আর তিনি যদি আল্লাহ্‌র আদেশ পালন না করে তাগুতের সাথে কাতারবন্দি হন, তবে যত অজুহাত দাঁড় করান না কেন তিনি আর মুসলমান থাকলেন না। কেননা আল্লাহ্‌ তাকে আদেশ করেছেন আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করতে আর তিনি সংগ্রাম করছেন তাগুতের পথে। মনে রাখতে হবে আল্লাহ্‌র দ্বীন ব্যতীত যে কোনো দ্বীন/জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার/সংরক্ষণের চেষ্টা সাধনা করা বা এ লক্ষ্যে কাজ করাই হলো তাগুত।

অতএব মন-মস্তিষ্ক উন্মুক্ত করে আল্লাহ্‌র দেয়া বিবেককে জাগ্রত করে, জান্নাত-জাহান্নামের বিষয়টি অনুভব করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অর্থাৎ তিনি কি আল্লাহ্‌র

পথে সংগ্রাম করে / ইসলাম প্রতিষ্ঠায় কাজ করে জান্নাত লাভে সচেষ্ট হবেন, না দুনিয়ার সামান্য মর্যাদা অর্জনের জন্য ইসলাম প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করে জাহান্নামবাসী হওয়ার উপযুক্ত হবেন?

এ পর্যায়ে আমার পক্ষ হতে প্রচলিত রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় নেতার প্রতি আহ্বান থাকবে, আপনি আপনার দলের নীতি পরিবর্তন করে ইসলামী নীতিকে দলের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করুন। আপনি আপনার দলের বিপুল সংখ্যক মানুষকে আল্লাহ্‌র দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত করার কারণে সকলের ভালো কাজের সমান প্রতিদান আপনি আল্লাহ্‌র কাছে প্রত্যাশা করতে পারবেন, দুনিয়া এবং আখিরাতে সম্মানিত হবেন।

দলের অধস্তন নের্তৃবৃন্দ এবং কর্মী-সমর্থকদের প্রতি আমার আহ্বান থাকবে আপনারা বিষয়টির উপর অধ্যয়ন করুন, অনুধাবন করুন। অত:পর আপনাদের নেতৃবৃন্দকে এ পথে আহ্বান জানান এবং নিজেরা ধর্মহীন বা সেক্যুলার রাজনীতি পরিহার করে আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োগ করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করে পরকালিন মুক্তি নিশ্চিত করে নিজের জীবনকে সফল করুন।

ইসলাম প্রতিষ্ঠার রাজনীতি

বাংলাদেশর রাজনীতির অপর ধারণাটি হলো ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজনীতি বা ইসলামী আন্দোলন। ইসলাম প্রতিষ্ঠার রাজনীতি বা ইসলামী আন্দোলনের বিষয়ে আলোচনার পূর্বে অপর একটি গোষ্ঠীর পরিচয় সম্পর্কে আলোচনা করা আবশ্যক। ইতিপূর্বে আমরা যে সকল ধর্মহীন দলসমূহ নিয়ে আলোচনা করলাম, যদিও তারা এ দেশ শাসন করে আসছে, তাদের বিশ্বাস ইসলামী আন্দোলনকারী দলগুলো যদি ইসলামের প্রকৃতরূপ মুসলমানদের কাছে তুলে ধরতে সক্ষম হয় এবং তাদের প্রকৃত অবস্থা জনগণের কাছে উম্মোচিত হয়ে যায়, তবে তাদের ভীত নড়ে উঠবে, রাজনৈতিক অবস্থান হারাতে পারে। সুতরাং, মুসলমানদের কাছে ইসলামী আন্দোলনকারীদেরকে কুৎসিতভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে তাদেরকে অবিশ্বস্ত করে তোলা যেমন জরুরি, তেমনি নিজেদেরকে ইসলাম দরদী হিসেবে প্রচার করে সাধারণ মুসলমানদের সহানুভূতি অর্জন করাকে জরুরি মনে করছে। তারা এও জানে যে, নিজেরা নিজেদেরকে ইসলাম দরদী হিসেবে প্রচার করলে যতটুকু ফলপ্রসূ হবে, তার থেকেও বেশি ফলদায়ক হবে যদি ইসলাম শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বা আলেম-ওলামাদের মুখ দিয়ে এ প্রচারণাটি চালানো যায়। একইভাবে ইসলামী আন্দোলনকারীদের বিষয়ে নিজেরা অপপ্রচার চালালে যতটুকু কার্যকর হবে তদপেক্ষা বেশি কার্যকর হবে যদি তথাকথিত আলেম-ওলামাদেরকে দিয়ে ইসলামী দলগুলোর বিষয়েনেতিবাচক ধারণা প্রচার করা যায়। এ লক্ষ্যে ধর্মহীন বড় বড় দলসমূহ ওলামাদের মধ্য থেকে যতদূর সম্ভব লোক সংগ্রহ করে তাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। আর সকল যুগেই দুনিয়াদার আলেম বিদ্যমান ছিল, এখনো আছে, যারা দুনিয়াতে সহায়-সম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও কথিত সম্মান পাওয়ার আশায় এ কাজে অংশ নিতে প্রস্তুত থাকে। ফলে এ দলসমূহ দলের নামের সামনে ওলামা শব্দটি জুড়ে দিয়ে ওলামাদের থেকে লোক নিয়ে তাগুতের সহযোগী দল গঠন করেছে। এ সকল দল গঠনের মূল লক্ষ্য হলো ইসলামী আন্দোলনকারীদেরকে সমাজে হেয় প্রতিপন্ন করা, অবিশ্বস্ত হিসেবে উপস্থাপন করা, তাদের অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করা এবং নিজেদেরকে ইসলাম বান্ধব বলে প্রচার করে নিজেদের ভিত মজবুত করা। সুতরাং, ওরা তাগুতের সহযোগী এবং তাদের মর্যাদা এ সকল তাগুতী দলসমূহ হতে আরও নিকৃষ্ট মানের। কারণ এ সকল সেক্যুলার দলসমূহ স্ব পরিচয়ে পরিচিত হয়ে রাজনীতি করছে। অপরদিকে এ সকল তথাকথিত ওলামাদের দল ইসলামী আন্দোলনকারীদেরকে দাবিয়ে রেখে তাগুতকে প্রতিষ্ঠিত করতে ইসলামের লেবাস পরে জনগণকে প্রতারিত করছে। সুতরাং, এ সকল দলসমূহ তাগুত এবং তাদের স্থান জাহান্নামের সর্বনিম্নে হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কেননা তারা মূলত: মুনাফিকী

আচরণ করে। যারা নিজেদেরকে মুসলমান হিসেবে এবং আলেম-ওলামা হিসেবে পরিচয় দেয়, অথচ কাজ করে তাগুতের পক্ষে তারাই মুনাফিক। মুনাফিকদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ اُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ١ۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ١ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ۝٥٩ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَ مَاۤ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْۤا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَ قَدْ اُمِرُوْۤا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ١ؕ وَ يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلًۢا بَعِيْدًا ۝٦٠ وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَ اِلَى الرَّسُوْلِ رَاَيْتَ الْمُنٰفِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا ۝٦١

‘হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর নির্দেশ মান্য করো। নির্দেশ মান্যকরো রাসূলের; এবং তোমাদের মধ্যে যারা দায়িত্বশীল তাঁদের। তারপর যদি তোমরা কোনো বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়ো, তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি প্রত্যার্পণ করো, যদি তোমরা আল্লাহ ও কেয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাকো। আর এটা কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম। আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবি করে যে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, আমরা সে বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছি এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে। তারা বিরোধীয় বিষয়কে মীমাংসার জন্য তাগুতের দিকে নিয়ে যেতে চায়, অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে, যাতে তারা তাগুতকে অস্বীকার করে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করে ফেলতে চায়। আর যখন আপনি তাদেরকে বলবেন, আল্লাহর নির্দেশের দিকে এসো, যা তিনি রাসূলের প্রতি নাযিল করেছেন। তখন আপনি মুনাফিকদেরকে দেখবেন, ওরা আপনার কাছ থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে যাচ্ছে।

-সূরা নিসা, আয়াত: ৫৯-৬১

فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْۤ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ۝٦٥

(হে রাসূল) অতএব তোমার পালন কর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায় বিচারক বলে

মনে করে, অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে। –সূরা নিসা, আয়াত: ৬৫

উপরোক্ত আয়াত দ্বারা মুনাফিকদেরকে চিহ্নিত করা যায়। এ আয়াতের আলোকে বলা যায় দুনিয়াতে যে সকল রাষ্ট্রনায়ক আছে যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান না এনে অর্থাৎ, কালেমা পাঠের মাধ্যমে ইসলামে প্রবেশ না করে মানব রচিত মতবাদ দিয়ে দেশ পরিচালনা করছে, তারা প্রত্যক্ষভাবে কুফরীতে নিমজ্জিত। আর যে সকল রাষ্ট্রনায়ক ঈমান গ্রহণের ঘোষণা দিয়েছে এবং কালেমা পাঠ, সালাত আদায়, রোযা পালনসহ ইসলামের যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা পরিপালন করা সত্ত্বেও জীবনের তথা রাষ্ট্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামী আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা হতে বিরত রয়েছে, তারা মুনাফিকীর উপর অবস্থান করছে। কেননা, তারা কালেমার ঘোষণা দিয়ে, সালাত আদায় করে, সিয়াম পালন করে ও হজ্জ করে মুসলমান সমাজে মুসলমান হিসেবে পরিচিত এবং মুসলমানদের একজন হয়ে মুসলিম রাষ্ট্রের যাবতীয় সুযোগ সুবিধা ভোগ করছে। অথচ তাদের অন্তরে ঈমানের নূর বিদ্যমান নেই। আর এ কারণে তারা আল্লাহর আইনের উপর আস্থাশীল নয়। তারা যে আল্লাহর আইনের প্রতি আস্থাশীল নয় তার প্রকৃষ্ঠ প্রমাণ হলো তারা মানব কল্যাণে এবং নিজের কল্যাণে আল্লাহর আইনকে যথার্থ মনে করছে না। আর এ কারণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আল্লাহর আইনের পরিবর্তে নিজেদের তৈরি করা আইন বা তাদের পূর্ববর্তী লোকদের তৈরি করা আইন দ্বারা দেশ পরিচালনা করছে।

এখানে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। মুসলমান সমাজে মুমিন হিসাবে পরিচিত এক মুনাফিকের নাম ছিল বিশ্‌র। কোনো একটি বিষয়ে জনৈক ইহুদীর সাথে তার বিবাদ বেধে যায়। জাত-গোত্র, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের মনে একমাত্র রাসূল সা. ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে বিশ্বস্ততা অর্জন করেছিলেন। আর তাই ইহুদী ব্যক্তিটি তাদের বিরোধ মীমাংসার জন্য রাসূল সা. এর উপর বিচারের ভার ন্যস্ত করার প্রস্তাব করেন। মুমিন বলে পরিচিত মুনাফিক ব্যক্তিটিও রাসূল সা. কে ন্যায় বিচারক বলে বিশ্বাস করতো। কিন্তু নিজের মনে অপরাধবোধ বিদ্যমান থাকার কারণে নিজে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার ভয়ে বা রায় বিপক্ষে যাওয়ার আশংকার কারণে সে রাসূল সা. এর পরিবর্তে এক ইহুদীর বিচারকে নিজের জন্য যথার্থ মনে করেছিল। পরিশেষে উভয়েই রাসূল সা. এর নিকট উপস্থিত হয়ে নিজেদের মোকদ্দমা দায়ের করলে, রাসূল সা. মোকদ্দমার বিষয় অনুসন্ধান করলেন। তাতে ইহুদীর অধিকার প্রমাণিত হয় এবং রাসূল সা. তারই পক্ষে ফয়সালা করে দেন।

বাহ্যিক মুমিন সেই মুনাফেক বিশ্‌র রাসূল সা. এর রায় মেনে নিতে অসম্মতি জানায় এবং ভিন্ন বিচার অন্বেষণ করে। সে এই বিচার পূন: বিবেচনার জন্য রাসূল সা. এরই অনুসারী ওমর (রা:) এর নিকট পুনরায় মোকদ্দমা দায়ের করে। ওমর রা. যখন জানতে পারলেন যে, বিশ্‌র রাসূল সা. এর রায়ে অসন্তুষ্ট হয়ে পূন: মোকাদ্দমা দায়ের করেছে, তিনি তলোয়ারের আঘাতে বিশ্‌রের শিরচ্ছেদ করলেন। কেননা রাসূল সা. এর ফায়সালা তখনই অমান্য করা যায়, যখন রাসূল সা. এর উপর ঈমান না থাকে। আর ঈমান না থাকা সত্ত্বেও মুসলমান দাবি করাই হলো মুনাফিকী। আর যখন কোনো ব্যক্তি তার মুনাফিকীকে প্রকাশ্য রূপ দেয়, তখন সে মুরতাদ হয়ে যায়। আর মুরতাদের শাস্তি হলো মৃত্যুদন্ড। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে যখন মুসলমানদের মধ্যে ওমর-(রা:) সম্পর্কে মন্তব্য হচ্ছিলো তখনই মহান আল্লাহ পাক ওমর-(রা:) এর কাজের সঠিকতার পক্ষে উপরোল্লিখিত আয়াত নাযিল করেন।

যদি বর্তমান মুসলিম বিশ্বের শাসকবর্গের অধিকাংশের দিকে দৃষ্টিপাত করা হয়, তবে মুনাফিক বিশ্‌র এর সাথে তাদের তেমন কোনো পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যাবে না। কেননা, সেই বিশ্‌রও সালাত-রোযাসহ সকল প্রকার আনুষ্ঠানিকতার বাহ্যিক পরিপালনে যত্নবান ছিলো, যার কারণে মুসলমানগণ তাকে মুমিন হিসাবেই জানতেন। কিন্তু যখনই সে মনে করেছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা. এর ফায়সালা তার বিপক্ষে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তখনই সে ভিন্ন নিয়ম-নীতি ও বিচারকের অন্বেষন করেছে। যখনই দেখলো রাসূল সা. এর ফায়সালা তার বিপক্ষে হয়েছে, তখনই সে তা পুনরায় অন্যের মতে ফায়সালা করানোর চেষ্টা করেছে। বর্তমান মুসলিম বিশ্বের শাসকগণও বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান পরিপালনের মাধ্যমে মুসলমান সমাজে শীর্ষস্তরের মুমিন হিসাবে খ্যাতি অর্জনের চেষ্টায় নিমগ্ন। অথচ নিজেদের সামর্থ থাকা সত্ত্বেও নিজেদের শাসনব্যবস্থাকে পরিপূর্ণ ইসলামী শাসনব্যবস্থা হিসেবে, নিজেদের রাষ্ট্রব্যবস্থাকে খোদায়ী খিলাফত হিসেবে ঘোষণা দিচ্ছে না। কেননা এতে তাদের ক্ষমতা হারানোর ভয় আছে বা অন্য কোনো স্বার্থহানী ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। এ সকল শাসকগণ সূদীর্ঘকাল হতে মুসলিম সমাজে মুমিন মুসলমান হিসেবে পরিচিত হয়ে আসছে। সাধারণ মুসলমানগণ ইসলাম সম্পর্কে সুগভীর জ্ঞান অর্জন করেনি বিধায় তাদের এ চরিত্র চিনতেও সক্ষম নয়। যে সকল মুসলমান এই সকল তাগুত সরকারের প্রকৃতি সর্ম্পকে জানে তারা কেউ কেউ ওদের কঠোরতার ভয়ে আবার কেউ কেউ দুনিয়ার কিছু কিছু স্বার্থ উদ্ধারের আশায় ওদের প্রকৃত ধর্মীয় অবস্থান সাধারণ জনসাধারণের সামনে উপস্থাপন করার সাহস পায় না। আর যারা তাদের এ মুনাফিকী চেহারাকে জনসাধারণের সামনে তুলে

ধরাকে ঈমানী দায়িত্ব-কর্তব্য মনে করে তারাও সুগঠিত রাষ্ট্রীয় আইনী হয়রানীর ভয়ে প্রত্যক্ষভাবে মুখ খুলতে পারেন না। নেহায়েত দায়িত্ব পালনের জন্য বা আল্লাহর দরবারে জবাবদিহিতার ভয়ে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াত পৌঁছিয়ে থাকেন। দুটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে তাদের এ দাওয়াতের মাধ্যমে সাধারণ মুসলমানরা সেক্যুলার দলসমূহের এ মুনাফেকী চরিত্র চিনতে পারে না। প্রথমত: তাদের মুনাফিকী চরিত্র রাষ্ট্রীয় আইনী হয়রানী ও নির্যাতনের ভয়ে প্রত্যক্ষভাবে প্রচার করা সম্ভব হয় না। ফলে সাধারণ অশিক্ষিত ও কম শিক্ষিত মুসলমানগণ দাওয়াতের মর্ম বুঝতে সক্ষম হন না বা তা বুঝার তাকীদও অনুভব করেন না। দ্বিতীয়ত: এ সকল শাসক যেহেতু মুসলমান সমাজে নির্ভেজাল মুসলমান হিসেবে পরিচিত, তাই তারাও সাধারণ মুসলমান অর্থাৎ ইসলামী শিক্ষায় কম শিক্ষিত বা অশিক্ষিত জনসাধারণের কাছে ইসলামী আন্দোলনকারীদের সম্পর্কে বিভিন্ন মিথ্যা, প্রতারণামূলক প্রচার-প্রচারণার সুযোগ পায়। এ সকল ধর্মহীন দলের চালাকিপূর্ণ ও মিথ্যা প্রচার প্রচারণায় প্রতারিত হয়ে সাধারণ মানুষ তাদেরকে মেন্ডেট দিয়ে বসে। ফলে তারা মুসলমানদের শাসক বা জনগণের নেতা হয়ে সমাজে প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ পায়। সুতরাং, যে সকল আলেম-ওলামা বা ইসলামী ব্যক্তিত্বের দাবিদার ব্যক্তিগণ ইসলামী দল বা ওলামাদের দলের নামে প্রকারান্তরে ইসলামী আন্দোলনের ক্ষতি করার চেষ্টা করছে বা ধর্মহীন দলের সহযোগিতা করছে, তারা এবং তাদের দল মোনাফেকিতে লিপ্ত। অতএব ওদের পরিচয় সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর আপনি যদি এ দলের কেউ হন বা এ দলের কারও দ্বারা প্রতারিত হয়ে থাকেন, তবে নিজের কর্তব্য স্থির করুন।

এখন আসুন, মূল ইসলামী আন্দোলনকারীদের সম্পর্কে আলোচনা করি। ইসলামী আন্দোলনকারী দলসমূহ সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে কতিপয় বিষয় সম্পর্কে আলোচনা প্রয়োজন। যেমন- ইসলামী আন্দোলন কী? এর গুরুত্ব কতোটুকু, একাধিক দল থাকা কি অনুচিত, না যথার্থ?

ইসলামী আন্দোলন

আন্দোলন বলতে কোনো দাবি, অধিকার প্রতিষ্ঠা বা কোনো কিছু করার জন্য স্বর্গমর্ত্য তোলপাড় করা বুঝায়। অর্থাৎ, যখন কোনো দাবি আদায়, অধিকার প্রতিষ্ঠা বা কোনো প্রস্তাবের বাস্তবায়নের জন্য সংঘবদ্ধ হয়ে তৎপরতা চালানো হয়, তাকে আন্দোলন বুঝায়। ইসলামী আন্দোলন বলতে ইসলামের পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে বুঝায়। ইসলাম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা-সাধনার বিষয়টিকে সহজে বোধগম্য করার জন্যও বাংলাভাষায় আন্দোলন শব্দটি ব্যবহার করা হচ্ছে, যদিও ইসলামে এর একটি নিজস্ব পরিভাষা আছে। আমরা যে অর্থে 'ইসলামী আন্দোলন' শব্দটি ব্যবহার করি, ইসলামী পরিভাষায় তাকে বলা হয় 'জিহাদ' বা 'জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ'। যদিও ইসলামী আন্দোলন শব্দটি ইসলাম প্রতিষ্ঠার কর্মকাণ্ডকে সহজে বোধগম্য করার লক্ষ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে, তথাপি আমার বিবেচনায় বাংলা শব্দটির পরিবর্তে ইসলামী পরিভাষা 'জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ' শব্দটি ব্যবহার অধিক গুরুত্ববহ।

'জিহাদ' আরবী শব্দ, যার বাংলা অর্থ হলো চেষ্টা-সাধনা করা। কালামে হাকীমে এ শব্দ সম্বলিত আয়াতসমূহের মধ্যে নিম্নোক্ত আয়াত বিশ্লেষণে জিহাদ বলতে কী বুঝায়, তা উপলব্ধি করা যায়-

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَ جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ۱۵

'তাঁরাই মু'মিন, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং আল্লাহ্র পথে প্রাণ ও ধন সম্পদ দ্বারা জিহাদ করে। তাঁরাই সত্যনিষ্ঠ।' -সূরা হুজরাত: আয়াত ১৫

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ জিহাদ (চেষ্টা-সাধনা) করতে বলেছেন শুধুমাত্র আল্লাহ্রই পথে এবং তার পূর্বে বলেছেন তাঁরাই মু'মিন, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সা. এর প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং আল্লাহ্র পথে প্রাণ ও ধন সম্পদ দ্বারা জিহাদ করে। আর যারা এ কাজটি করেন, আল্লাহ্ একমাত্র তাঁদেরকেই সত্যনিষ্ঠ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। মু'মিন হতে হলে নিম্নোক্ত শর্ত উপস্থিত থাকতে হবে–

আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সা. এর প্রতি ঈমান আনার পর কোনো প্রকার সন্দেহ পোষণ করা যাবে না। জান ও মাল যা কিছুই প্রয়োজন হোক না কেন সবকিছু নিয়োজিত করে আল্লাহ্র পথে চেষ্টা-সাধনা করতে হবে। যদি কোনো ব্যক্তির

মধ্যে উপরোক্ত শর্তদ্বয়ের মধ্য হতে কোনোটির অভাব বা অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, তবে আল্লাহ্‌র উপরোক্ত বাণী অনুসারে সে ব্যক্তি পরিপূর্ণ মু'মিন হওয়ার দাবিদার হতে পারে না। আল্লাহ্‌ বলেন-

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ؕ

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি, আমার নিয়ামত তোমাদের প্রতি সম্পূর্ণ করেছি এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে তোমাদের দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা) হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছি।' -সূরা মায়েদা: ৩

যেহেতু আল্লাহ্‌ বলেছেন যে, তিনি আমাদের জীবন ব্যবস্থাকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন এবং এটি আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিয়ামত এবং আল্লাহ্‌র মনোনীত একমাত্র জীবন ব্যবস্থা, সেহেতু কোনো ব্যক্তি যদি ইসলামের বাইরে অপর কোনো জীবন-বিধান অনুসারে দেশ পরিচালনা করে বা করতে চায়, তবে বলা যায় যে, সেই ব্যক্তি বা শাসক আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রাসূল সা. এর ব্যাপারে সংশয় পোষণ করে এবং সে মু'মিন নয়। মু'মিন হওয়ার দ্বিতীয় শর্ত হলো, ঈমান আনার পর আল্লাহ্‌র পথে জান ও মাল দিয়ে চেষ্টা-সাধনা করা বা জিহাদ করা। আল্লাহ্‌ তাঁর বান্দাহদের সামনে তাঁর পথের পরিচয় কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। কালামে হাকীমে আল্লাহ্‌ বলেন–

اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ ۖۗ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ۚ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَ قُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ٢٣

'আল্লাহ্‌ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণী সম্বলিত এমন এক গ্রন্থ, যা সামঞ্জস্যপূর্ণ, পূন: পূন: পঠিত। এতে যারা তাঁদের প্রতিপালককে ভয় করে তাঁদের গাত্র রোমাঞ্চিত হয়, অত:পর তাঁদের দেহমন প্রশান্ত হয়ে আল্লাহ্‌র স্মরণে ঝুঁকে পড়ে। এটিই আল্লাহ্‌র হিদায়াত, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দিয়ে পথ প্রদর্শন করেন।'

-সূরা যুমার: আয়াত ২৩

কুরআনুল কারীমের উপরোক্ত আয়াত হতে জানা যায় যে, কুরআনই হলো আল্লাহ্‌র পথ বা পথ নির্দেশক। স্বাভাবিকভাবে আমরা জানি, পথ বলতে এমন কিছুকেই বুঝায়, যা কাউকে তার যাত্রাস্থল হতে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে দেয়। সফলতাই প্রতিটি মানুষের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। আর একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে পরকালীন মুক্তি অর্জন নিশ্চিত হলেই বলা যায় একটি মানুষের জীবন সফল হয়েছে। জীবনে সফলতা অর্জনের জন্য আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে

লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাতে হলে একমাত্র কুরআনের পথেই চলতে হবে। কালামুল্লাহতে অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন-

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا اَلَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَ يُمِيْتُ ۫ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ كَلِمٰتِهٖ وَ اتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ١٥٨

'বলে দাও, হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের সবার প্রতি আমি আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূল, সমগ্র আসমান ও জমিনে তাঁর রাজত্ব। একমাত্র তাঁকে ছাড়া আর কারো উপাসনা নয়। তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন। সুতরাং, তোমরা সবাই বিশ্বাস স্থাপন করো আল্লাহ্র প্রতি, তাঁর প্রেরিত উম্মী নবীর প্রতি, যিনি বিশ্বাস রাখেন আল্লাহ্র এবং তাঁর সমস্ত কালামের প্রতি। তাঁর অনুসরণ করো, যাতে সরল পথ প্রাপ্ত হতে পারো।' -সূরা আ'রাফ: আয়াত ১৫৮

আল্লাহ্ তাঁর বান্দাহগণকে সরল পথ তথা আল্লাহ্র পথ প্রাপ্তির নির্দেশনা স্বরূপ উপরোক্ত বিষয়গুলো মানব মণ্ডলীকে বলে দেয়ার জন্য রাসূল আকরাম সা. কে নির্দেশ দিয়েছেন। বিষয়গুলো হতে আমরা যা বুঝতে পারি-

- মুহাম্মদ সা. সকলের প্রতি প্রেরিত আল্লাহ্র রাসূল।
- সমগ্র আসমান ও জমিনে একমাত্র আল্লাহ্রই রাজত্ব। অতএব অন্য যে কারো রাজত্বকে অস্বীকার করতে হবে।
- একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো উপাসনা করা যাবে না। অর্থাৎ আল্লাহ্র আদেশ নিষেধ এর পরিবর্তে অন্য কোনো ব্যক্তি বা পক্ষের আদেশ নিষেধ মান্য করা যাবে না।
- মানুষকে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল সা. ও কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসূল সা. এর অনুসরণ করতে হবে।

অতএব আল্লাহ্র পথ বলতে আমরা বুঝবো– জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্র কালাম ও তাঁর রাসূল সা. এর অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ্র উপাসনা করা। জীবনের সকল ক্ষেত্র বলতে ব্যক্তি, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, শিক্ষাব্যবস্থা ও আন্তর্জাতিকসহ সবকিছু অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং, আমরা আল্লাহ্র পথে জিহাদ বা আল্লাহ্র পথে চেষ্টা-সাধনা বলতে বুঝবো, যেমনি নিজের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ্র আইনের বাস্তবায়ন, তেমনি বুঝবো পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও আন্তর্জাতিক প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ্র হুকুমাত, রাজত্ব কায়েম ও বহাল রাখার চেষ্টা-সাধনা করা। একজন মানুষ সাবালক হওয়ার অর্থাৎ, আল্লাহ্র হুকুম-আহকাম পালনের উপযুক্ত বয়স প্রাপ্তির

পর থেকে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত প্রতিটি মুহূর্ত জিহাদে থেকে জীবন পার করে দিতে পারে। সে তার নিজের জীবনে ইসলামকে বাস্তবায়নের জন্য নাফসের বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হতে পারে। যখন তার নাফস চাইবে ইসলাম নিষিদ্ধ পন্থায় বিশাল সম্পদ হস্তগত করে ফেলতে, সে তখনি দাঁড়িয়ে বলবে, 'না'– এটি আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ পন্থা। একইভাবে পরিবারের সকল সদস্যকে সে আল্লাহ্‌র মনোনীত পন্থায় জীবন-যাপন করানোর জন্য চেষ্টা-সাধনা বা জিহাদ করবে। সমাজে এবং রাষ্ট্রে আল্লাহ্‌র কানুন বাস্তবায়নের চেষ্টা-সাধনা করবে এবং নিজের সমাজ ও রাষ্ট্রে আল্লাহ্‌র হুকুমাত কায়েমের পর আন্তর্জাতিকভাবে তার প্রচার-প্রসারের চেষ্টা-সাধনা করবে। এ চেষ্টা সাধনার অংশ হিসাবে সে প্রথমে আল্লাহ্‌র দ্বীনের প্রচার তথা দাওয়াতে আত্মনিয়োগ করবে। এ উদ্দেশ্যে বলন, লিখন, ভ্রমন এই সব কিছুই জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য দাওয়াতের কাজে মানসিক, শারীরিক নির্যাতন সহ্য করা, সময়, ধন-সম্পদ ব্যয় করা, জীবন উৎসর্গ করা, প্রয়োজনে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা জিহাদের অংশ। একইভাবে ব্যক্তিগত জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র হুকুমাত কায়েম হয়ে গেলে বা কায়েম থাকলে তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মানুষের মধ্যে এর সুফলসমূহের প্রচার, মানুষকে শিক্ষাদান এবং প্রয়োজনে যুদ্ধ করাও জিহাদের অংশ। এ কাজে নিয়োজিত থাকার কারণে যে কেউ হত্যার শিকার হবে, সে শাহাদাত লাভ করবে।

ইসলামী আন্দোলনের অপরিহার্যতা

জিহাদ বলতে কী বুঝায় এ সংক্রান্ত উপরোক্ত আলোচনা হতে জিহাদের গুরুত্ব বা অপরিহার্যতা অনুধাবন করা যায়। তথাপিও সংক্ষিপ্ত কলেবরে জিহাদের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। এজন্য আমাদের প্রথমে চিন্তা করতে হবে, আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ সা. কোনো মিশন নিয়ে দুনিয়াতে এসেছিলেন এবং তাঁর মিশন কখন পরিপূর্ণ হলো। এর উত্তর হলো, রাসূল মুহাম্মদ সা. দুনিয়াতে আসার প্রধান উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ্‌র একত্ববাদ তথা তাওহীদের প্রতিষ্ঠা এবং জগতের সমগ্র মানুষের জন্য তাওহীদে বিশ্বাসী হয়ে হিদায়াত লাভ করে পরকালীন মুক্তির ব্যবস্থা করা। আর তখনই রাসূল সা. এর মিশন পরিপূর্ণতা লাভ করলো যখন মানুষ আল্লাহ্‌র একত্ববাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে হিদায়াত লাভ করে আল্লাহ্‌র দ্বীনকে আঁকড়ে ধরে দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করলো এবং ইসলামী জীবনব্যবস্থা সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো। রাসূল সা. এর আগমন ও নবুওয়াত লাভের পূর্বে সে সমাজের মানুষ আল্লাহ্‌র একত্ববাদে বিশ্বাসের পরিবর্তে শিরকে লিপ্ত ছিল, আল্লাহ্‌র আইন পরিপালনের পরিবর্তে তাদের পূর্ববর্তীদের ও

গোত্রপতিদের তৈরি করা আইনের অনুসারী ছিল। আল্লাহ্ মানবতার মুক্তির জন্য মুহাম্মদ সা. কে প্রেরণ করে রিসালাত দান করেন এবং তাঁর প্রতি নাযিল করেন মহান আল্লাহ্র শ্বাস্বত বাণী 'কুরআনুল কারিম' যা সর্বকালের সকল মানুষের পরিপূর্ণ ও একমাত্র জীবন ব্যবস্থা।

রাসূল সা. তাঁর নবুওয়াতী জীবনের দীর্ঘ ২৩টি বছর চরম ত্যাগ-তিতীক্ষা, অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করা, চেষ্টা-সাধনার মাধ্যমে আল্লাহ্র মেহেরবাণীতে কুরআনে কারিমার বিধানকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করেন। আর এ লক্ষ্যে আল্লাহ্র ও রাসূল আকরাম সা. এর উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী সাহাবাগণ জীবন বাজি রেখে চরম আত্মত্যাগ তথা জীবন-স্বর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে দ্বীন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা-সাধনা করেছেন এবং বহুসংখ্যক সাহাবা শাহাদাত বরণ করেছেন। দ্বীন প্রতিষ্ঠার পর রাসূল আকরাম সা. এর ওফাতের পর প্রায় ত্রিশটি বছর এ দ্বীনকে সংরক্ষণ করার জন্য ৪ খলিফাসহ সাহাবায়ে কিরাম রা. প্রাণপণ-চেষ্টা সাধনা করে গেছেন। ত্রিশ বছর পর যখন খিলাফতে রাশেদার উজ্জ্বলতম দিনগুলো ক্রমান্বয়ে ম্লান হতে হতে এক সময় ইয়াজিদের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে, ইসলামী আদর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্রব্যস্থার অবসান ঘটলো তখন রাসূল সা. এর প্রিয়তম দৌহিত্র হোসাইন রা. ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা পূন:প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে জিহাদে অবতীর্ণ হন এবং শাহাদাত বরণ করেন। যেহেতু বর্তমানে রাসূল সা. আমাদের মাঝে নেই, ইসলাম গ্রহণ করে আমরা তাঁর অনুসারী হয়ে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করছি সেহেতু স্বাভাবিক ভাবে রাসূল সা. এর অনুসরণে এই ধর্মহীন রাষ্ট্রব্যবস্থা হতে আইয়ামে জাহেলিয়াতের যুগের মতো সমাজ ব্যবস্থার মূলোৎপাটনের মাধ্যমে আল্লাহ্র দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার জন্য জিহাদ করা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। আমরা যদি এ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন না করি, তবে দায়িত্ব অবহেলার দায়ে আল্লাহ্র দরবারে দোষী সাব্যস্ত হতে হবে। সুতরাং, ঈমান গ্রহণকারী প্রতিটি মুসলমানের জন্য জিহাদ করা অপরিহার্য।

এতো গেল ইসলামের ইতিহাস থেকে জিহাদের গুরুত্ব অনুধাবনের কথা। যে আল্লাহ্ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, লালন-পালন করছেন এবং যার দিকে আমাদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে প্রত্যাবর্তন করে পুরস্কার বা কঠিনতম শাস্তি ভোগ করতে হবে, সেই আল্লাহ্ জিহাদ সম্পর্কে বলেছেন-

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَ يَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ ١٤٢

'তোমাদের কি ধারণা, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ আল্লাহ্ এখনও দেখেননি তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং কারা ধৈর্য্যশীল।'

-সূরা আলে ইমরান: আয়াত ১৪২

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَ جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ۱۵

'তাঁরাই মু'মিন, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং আল্লাহ্র পথে প্রাণ ও ধন-সম্পদ দ্বারা জিহাদ করে। তাঁরাই সত্যনিষ্ঠ।' -সূরা হুজরাত: আয়াত ১৫

وَ قٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّ يَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ؕ

'তোমরা তাদের সাথে লড়াই করতে থাকো, যতক্ষণ না ফেতনা চূড়ান্তভাবে শেষ হয়ে যায় ও দ্বীন কেবলমাত্র আল্লাহ্র জন্যই নির্দিষ্ট হয়।'

–সূরা বাক্বারা: ১৯৩

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ؕ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَ يُقْتَلُوْنَ ۟

'আল্লাহ্ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তাঁরা যুদ্ধ করে আল্লাহ্র রাহে, অত:পর মারে ও মরে।' -সূরা আত্ তাওবা: আয়াত ১১১

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ۱۰ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ تُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۙ ۱۱

হে মুমিনগণ, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দেবো, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহ্র পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবনপণ করে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম; যদি তোমরা বোঝো। -সূরা আস সফ: আয়াত ১০-১১

জিহাদের মর্যাদা সম্পর্কে রাসূল আকরাম সা. বলেছেন-

সাহল ইবনে সাঈদী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন: আল্লাহ্র পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে একদিন সীমান্ত পাহারা দেয়া পৃথিবী ও এর উপরস্থ সমস্ত সম্পদের চাইতেও উত্তম। জান্নাতে তোমাদের কারো চাবুক পরিমান জায়গা পৃথিবীর ও এর উপরস্থ সমস্ত সম্পদরাজি থেকে উত্তম। আল্লাহ্র পথে জিহাদের

উদ্দেশ্যে বান্দাহর একটি সকাল বা সন্ধ্যা ব্যয় করা পৃথিবীর ও তার উপরস্থ সকল সম্পদরাজি হতেও উত্তম। -সহীহ্ আল বুখারী: ২৬৭৯

মহান আল্লাহ্র বাণী এবং রাসূল সা. এর হাদীস হতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, জান্নাত লাভের এক বিকল্পহীন পথের নাম হলো জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ্। মানুষের গন্তব্য হলো জান্নাত। যারা জান্নাত লাভ করতে পারবে না, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম। জাহান্নামে যাওয়ার অর্থ হলো চূড়ান্ত ধ্বংস। জিহাদই পারে মানুষকে এ নিশ্চিত ধ্বংস হতে রক্ষা করতে। সুতরাং, আল্লাহ্ আমাদেরকে জিহাদের গুরুত্ব অনুধাবন করে জিহাদে শরীক হয়ে জান্নাত লাভের তৌফিক দান করুন।

দ্বীন প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি

যখন কোনো মানুষ রাসূল সা. এর কাছ থেকে দাওয়াত পেয়ে ঈমান এনেছেন সাথে সাথে প্রতিটি ক্ষেত্রে ঐ বিষয়ে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সা. অনুমোদিত পদ্ধতি জেনে নিয়ে সেভাবে কর্মপন্থা স্থির করেছেন। ঈমান আনার পর তাঁরা রাসূল সা. পছন্দ করেন না, এমন কোনো কাজে নিজেকে ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পৃক্ত করার কোনো উদাহরণ সৃষ্টি করেননি। বরং দ্বীন গ্রহণ করে নেয়ার সাথে সাথে রাসূল সা. যে জিনিস প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তার প্রতিষ্ঠাকে নিজেদের জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। অতএব আজকেও একজন মানুষ যখন সত্যিকার অর্থে ঈমান আনবে, তার মধ্যে দ্বীনের পূর্ণ অনুসরণের অদম্য প্রচেষ্টা প্রতিফলিত হবে এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সাধ্যের সর্বোচ্চ প্রয়োগে সচেষ্ট হবেন। আধুনিকতার অজুহাতে দ্বীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নতুন কোনো পন্থা উদ্ভাবন করার প্রয়োজন নেই। রাসূল সা. দ্বীন প্রতিষ্ঠা করে তাঁর উম্মতের জন্য একটি ম্যানুয়াল রেখে গেছেন। সত্যিকার অর্থে দ্বীন প্রতিষ্ঠায় সফলতা আশা করলে সেই ম্যানুয়াল অনুসরণ করতে হবে। যদি কেউ আধুনিকতার দোহাই দিয়ে নতুন কোনো পদ্ধতি প্রণয়ন বা আবিষ্কার করতে চায়, তবে তা তার বিখ্যাত হওয়ার জন্য কাজে আসতে পারে বটে, দ্বীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে না। তাছাড়া হিকমত বা কৌশল অবলম্বনের ক্ষেত্রেও কেউ রাসূল সা. অপেক্ষা দক্ষ, পটু, বিজ্ঞ নয়। তাঁর দেখানো পথ অপেক্ষা কার্যকর পথ আবিষ্কারেও কেউ সমর্থ নয়, এ বিষয়ে নতুন পদ্ধতি আবিস্কারে গবেষণা করে সময় ক্ষেপণও অপ্রয়োজনীয়। অতএব কেউ সত্যিকার অর্থে দ্বীন প্রতিষ্ঠায় কাজ করতে চাইলে তাকে রাসূল সা. এর দেখানো পথের অনুসরণ করতে হবে। আর এ পথ চিনে নিতে কুরআন-হাদীস এবং সীরাতে রাসূলুল্লাহর সা. অধ্যয়ন অপরিহার্য। সীরাত ও হাদীস হতে দ্বীন প্রতিষ্ঠার যে নমুনা পাওয়া যায়, অতি সংক্ষেপে তার একটি ধারণা দেয়ার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ্। তবে পূর্ণাঙ্গ ধারণা লাভের জন্য বিশুদ্ধ সীরাতে রাসূল সা. অধ্যয়ন অপরিহার্য।

রাসূল আকরাম সা. দ্বীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যে কর্মপন্থা প্রয়োগ করেছিলেন, তা পর্যালোচনা করলে চারটি বিষয় পরিলক্ষিত হয়;

১. দাওয়াতে দ্বীন।
২. দাওয়াতে দ্বীন কবুলকারী মুসলিমদেরকে জ্ঞানার্জনের ব্যবস্থা এবং ব্যাপক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপযুক্ত দায়ী ও মুজাহিদ হিসেবে গড়ে তোলা।

৩. ঐক্যবদ্ধভাবে কার্য পরিচালনা এবং সংঘবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ ইসলামী জীবনযাপন।

৪. ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও তার সংরক্ষণ।

দাওয়াতে দ্বীন

ওহী আসার পর রাসূল হিসেবে মুহাম্মদ সা. এর দায়িত্ব পালনের প্রথম পদক্ষেপটি শুরু হয় দাওয়াতে দ্বীনের মাধ্যমে। ইবন্ ইসহাকের এক বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, নবী সা. মক্কার মালভূমি অংশে ছিলেন। জিবরীল আ. সুন্দর আকৃতি এবং উৎকৃষ্ট সুগন্ধিসহ তাঁর সামনে আবির্ভূত হন এবং বলেন, হে মুহাম্মদ! আল্লাহ্ আপনাকে সালাম দিয়েছেন আর বলেছেন যে, আপনি জ্বীন ও মানুষের জন্য তাঁর পক্ষ থেকে রাসূল। এজন্য আপনি তাদেরকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ এর দাওয়াত দিন।

ওহী প্রাপ্ত হওয়ার পর জিবরীল আ. রাসূল আকরাম সা. কে প্রথম অযুর পদ্ধতি প্রদর্শন করেন এবং তাঁকে সাথে নিয়ে চার সিজদায় দু রাকাত সালাত আদায় করেন। তারপর নবী সা. খাদিজা রা. কে অযু শিক্ষা দেন এবং তাঁকে সাথে নিয়ে দু'রাকাত সালাত আদায় করেন। অত:পর আবুবকর রা., আলী রা. এবং যায়েদ বিন হারেসা রা.কে দাওয়াত দেন এবং তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেন।

-সীরাতে সারওয়ারে আলম

আল্লাহ্ সুবহানাহু তায়া'লা সৃষ্টি অবধি মুহাম্মদ সা. পর্যন্ত যত নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন, তাদের প্রথম কাজ ছিল দাওয়াতে দ্বীন। যেমন- কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে:

لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ١ؕ اِنِّيْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ৫৯

'আমরা নূহকে তাঁর সময়কার লোকদের প্রতি প্রেরণ করেছি; সে বলে, 'হে জাতির লোকেরা, আল্লাহ্র দাসত্ব কবুল করো। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কেউ উপাস্য নেই। আমি তোমাদের জন্য (নির্দিষ্ট) একটি দিনের আযাবের ভয় পোষণ করি।' -সূরা আ'রাফ: আয়াত ৫৯।

وَ اِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا١ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ١ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ৬৫

‘এবং ‘আদ’ জাতির প্রতি আমরা তাদের ভাই ‘হুদ’কে পাঠিয়েছি। সে বললো: ‘হে জাতির লোকেরা, তোমরা আল্লাহ্‌র বন্দেগী করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কেউ ইলাহ্ নেই। এখন তোমরা কি ভুল পথে চলা হতে বিরত হবে না?’

-সূরা আ’রাফ: আয়াত ৬৫

وَ اِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْٓ اَرْضِ اللّٰهِ وَ لَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۷۳

‘এবং সামুদ জাতির প্রতি আমরা তাদের ভাই সালেহকে পাঠিয়োছি। সে বললো: হে জাতির লোকেরা, আল্লাহ্‌র দাসত্ব কবুল করো, তিনি ছাড়া তোমাদের কেউ ইলাহ্ নেই। তোমাদের নিকট তোমাদের রবের নিকট হতে সুস্পষ্ট দলীল এসে পৌঁছেছে। ইহা আল্লাহ্‌র উষ্ট্রী, তোমাদের জন্য একটি নিদর্শনস্বরূপ। অতএব উহাকে ছেড়ে দাও- আল্লাহ্‌র জমিনে চড়িয়া বেড়াবে; কোনো খারাপ উদ্দেশ্যে উহাকে স্পর্শ করো না, অন্যথায় এক কঠিন পীড়াদায়ক আযাব তোমাদের গ্রাস করবে।’ -সূরা আ’রাফ: আয়াত ৭৩।

وَ اِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيْزَانَ وَ لَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَ لَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۚ ۸۵

‘আর মাদায়েনবাসীদের প্রতি আমরা তাদের ভাই ‘শুয়াইব’কে পাঠিয়োছি। সে বললো: ‘হে জাতির লোকেরা, আল্লাহ্‌র দাসত্ব করো, তিনি ছাড়া তোমাদের কেউ ইলাহ্ নেই। তোমাদের নিকট তোমাদের আল্লাহ্‌র সুস্পষ্ট দলীল এসে পৌঁছেছে। অতএব ওজন ও পরিমাপ পূর্ণ মাত্রায় করো, লোকদের তাদের দ্রব্যে ক্ষতিগ্রস্ত করে দিও না এবং জমিনে ফাসাদ করো না, যখন উহার সংশোধন ও সংস্কার সম্পূর্ণ হয়েছে। এতেই তোমাদের কল্যাণ নিহিত, যদি তোমরা বাস্তবিকই মু’মিন হয়ে থাকো।’ -সূরা আ’রাফ: আয়াত ৮৫।

রাসূল সা. এর সাহাবীগণের জীবন চরিত হতেও পরিলক্ষিত হয় দ্বীন গ্রহণের পর তাঁদের প্রথম কাজ ছিল দায়ী ইলাল্লাহর দায়িত্ব পালন করা। সুতরাং, এখনও যারাই নিজেকে মুসলমান মনে করবে, তাঁদেরও প্রথম কাজ হলো দায়ী’ ইলাল্লাহ্‌র দায়িত্ব পালন করা। কুরআনে এ বিষয়ে আল্লাহ্ বলেন:

وَ لْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ١٠٤

তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক থাকতে হবে, যারা নেকী ও মঙ্গলের দিকে ডাকবে। ভালো ও সত্য কাজের নির্দেশ দেবে এবং পাপ ও অন্যায় কাজ হতে বিরত রাখবে। যারা এই কাজ করবে তাঁরাই সার্থকতা পাবে।

-সূরা আলে-ইমরান: আয়াত ১০৪

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ ۣ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِيْ ؕ وَ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَ مَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ١٠٨

‘তুমি তাদের স্পষ্ট বলে দাও যে, আমার পথ তো এই, আমি আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান জানাই। আমি নিজেও পূর্ণ আলোকে আমার পথ দেখতে পাচ্ছি, আর আমার সঙ্গী-সাথীরাও। আর আল্লাহ্ তো মহান-পবিত্র; আর মুশরিক লোকদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।’ -সূরা ইউসুফ: আয়াত ১০৮

وَ مَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَ عَمِلَ صَالِحًا وَّ قَالَ اِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ٣٣

‘আর সেই ব্যক্তির কথা অপেক্ষা অধিক ভালো কথা আর কার হবে যে আল্লাহ্‌র দিকে ডাকলো, নেক আমল করলো এবং বললো: আমি মুসলিম।’

-হা মীম আস্-সাজদা: আয়াত; ৩৩

অতএব কোনো মানুষ যখন মুসলমান হবে, তাকে দ্বীনের দাওয়াতের কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে। এ দায়িত্ব পালনের প্রাক্কালে একজন দায়ী’কে খুব ভালো করে বুঝে নিতে হবে দাওয়াতের বিষয়বস্তু কী হবে এবং কী হবে তার পদ্ধতি?

দাওয়াতের বিষয় বস্তু

রাসূল সা. এর সীরাত এবং হাদীস গ্রন্থ হতে দেখা যায় রাসূল আকরাম সা. এর দাওয়াত ছিল মূলত: কালেমার দাওয়াত। তিনি মানুষের কাছে দাওয়াত পৌঁছিয়েছেন মানুষ যেন সকল ইলাহ্ দাবিদারকে অস্বীকার করে এক আল্লাহ্‌কে একমাত্র ইলাহ্ এবং মুহাম্মাদ সা.কে আল্লাহ্‌র রাসূল হিসেবে গ্রহণ করে নেয়। এ দাওয়াত গ্রহণ করার পরই একজন মানুষ আল্লাহ্‌র গোলামীর বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায়। আর তখন তাঁর জীবনের প্রতিটি বিষয় আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হয়। কোনো বিষয় আর তার নিজের ইচ্ছাধীন থাকে না। অর্থাৎ

দ্বীন গ্রহণ করে নেয়ার পর সালাত সিয়াম হজ্জ যাকাতের মতো মৌলিক ইবাদতসহ সকল বিধি-নিষেধ পরিপালন স্বাভাবিক কর্তব্যে পরিণত হয়। ইসলামের কোনো একটি বিষয় বা অংশ বিশেষের প্রতি আহ্বান জানানোর প্রয়োজন হয়নি। তবে আল্লাহ্‌কে ইলাহ্ এবং মুহাম্মদ সা.কে আল্লাহ্‌র রাসূল হিসেবে গ্রহণ করে নেয়ার জন্য একটি ভিত্তি থাকা, কতিপয় বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা বা কতিপয় বিশ্বাস মনে বদ্ধমূল হওয়া আবশ্যক। যেমন- ১. আল্লাহ্‌র গুণ বা সিফাত তথা তাওহীদ সম্পর্কে ধারণা ও বিশ্বাস, ২. নিজের অস্তিত্ব বা সত্ত্বা সম্পর্কে ধারণা অর্থাৎ নিজের সৃষ্টি এবং মৃত্যু পরবর্তী অবস্থা তথা পরকাল। একজন মানুষের মধ্যে আল্লাহ্‌র গুণ বা সিফাত/তাওহীদ সম্পর্কে সঠিক ধারণা সৃষ্টি হলে কেবল তার পক্ষে সম্ভব আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনা এবং আখেরাত সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়ার পরই কেবল তার পক্ষে সম্ভব আল্লাহ্‌কে ইলাহ্ হিসেবে গ্রহণ করে নেয়া। আর রাসূল সা. আল্লাহ্ কর্তৃক মনোনীত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পরই কেবল তাঁর নিরঙ্কুশ অনুসরণ সম্ভব।

রাসূল আকরাম সা. এবং তাঁর সাহাবাগণ দাওয়াত দিয়েছেন কালেমার। কালেমা পড়ে নেয়ার পর একজন মানুষ মুসলমানে পরিণত হয়েছে। মুসলমানে পরিণত হওয়ার পর তাদেরকে ইসলামের বিধি-বিধান অবহিত করা হয়েছে। তারা জেনেছে, শুনেছে এবং মেনে নিয়েছে। পৃথকভাবে সালাত, সিয়াম বা কোনো খন্ডিত অংশের জন্য দাওয়াত দেয়ার প্রয়োজন হয়নি।

সুতরাং, দাওয়াতের বিষয় হলো, পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ্‌কে একমাত্র ইলাহ্ এবং মুহাম্মদ সা.কে তাঁর প্রেরিত রাসূল হিসেবে গ্রহণ করে নেয়ার আহ্বান জানানো। আল্লাহ্‌কে একমাত্র ইলাহ্ এবং মুহাম্মদ সা.কে তাঁর প্রেরিত রাসূল হিসেবে গ্রহণ করে নেয়ার অর্থ কী দাঁড়ায়, তা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে।

অতএব বর্তমানে দ্বীন প্রতিষ্ঠায় আমাদেরকে যে দাওয়াত প্রচার করতে হবে, তা হলো কালিমার দাওয়াত। আমরা যাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছাবো তাদের কেউ কেউ অমুসলিম এবং অনেকে পূর্ব হতে জন্মগতভাবে মুসলিম। যারা মুসলিম তাদের কাছে কালেমার দাওয়াত পৌঁছানোর ক্ষেত্রে আপনি প্রথমে যে প্রশ্নের সম্মুখিন হবেন তা হলো: 'আমরাতো মুসলমান আছিই, আমাদের কাছে আবার কালেমার দাওয়াত কেন?' কেউ কেউ কটাক্ষ করে আরও একটু বাড়িয়ে বলতে পারেন, 'কেবল নিজেকেই মুসলমান মনে করেন নাকি, আর আমাদের সবাইকে অমুসলিম মনে করে বসে আছেন?' অথচ তারা নিজেদেরকে মুসলমান দাবি করা সত্ত্বেও কালেমার মধ্যে পরিপূর্ণভাবে দাখিল হননি। এতদসত্ত্বেও এধরনের প্রশ্ন করার কারণ হলো কালিমার প্রকৃত দাবি সর্ম্পকে তারা অবগত নন। এর জন্য

আমাদেরকে কালেমার দাবি কি, তা বুঝাতে হবে এবং সে দাবি অনুসারে মুসলিম-অমুসলিম সবাইকে পরিপূর্ণভাবে কালেমার গণ্ডির মধ্যে দাখিল হয়ে যাওয়ার আহ্বান জানাতে হবে।

কালেমার মধ্যে তিনটি বিষয়ের উপর স্বীকৃতি/ঘোষণা রয়েছে।

১. শিরকের সাথে পরিপূর্ণভাবে সম্পর্কচ্ছেদ।

২. আল্লাহর একত্ববাদ তথা তাওহীদের বিশ্বাস ও স্বীকৃতি।

৩. মুহাম্মদ সা.কে আল্লাহ্‌র রাসূল হিসেবে স্বীকৃতি দান।

যারা অমুসলিম তাদের প্রতি আহ্বান হবে এ বিষয়গুলো বুঝে নিয়ে কালেমা পাঠের মাধ্যমে ইসলামে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়ার এবং যারা মুসলিম এবং প্রতিনিয়তই কালেমা পাঠে অভ্যস্ত তাদের প্রতি আহ্বান হবে কালেমার উপরোক্ত দাবি বুঝার এবং পরিপূর্ণভাবে তার মধ্যে দাখিল হয়ে যাওয়ার।

শিরক

শিরক শব্দটি আরবী شِرْك মূল শব্দ হতে উদ্ভুত যার অর্থ হলো, সমকক্ষ বানানো। বিশেষত: আল্লাহর কোনো সৃষ্টিকে কোনো না কোনো বিষয়ে কোনো না কোনোভাবে আল্লাহর সমকক্ষ বানানো হলো শিরক। কালেমার প্রথম দাবি হচ্ছে এ কাজ হতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করা বা মুক্ত রাখা। কুরআনে এ বিষয়ে প্রায় দেড়শতাধিক আয়াত রয়েছে। কুরআন এবং সুন্নাহর আলোকে ইসলামী মনিষীগণ, মুফাস্‌সিরগণ শিরককে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন এবং তার সহজ পরিচিতি চিহ্নিত করেছেন। যেমন-

- আশ-শিরকু ফিল উলূহিয়্যা: অর্থাৎ মা'বুদ সত্ত্বা মানবার ক্ষেত্রে শিরক করা।
- আশ-শিরকু ফি উজুবি'ল উজুদ: অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তায়ালাকে স্বাধিষ্ট ও স্বয়ংসম্পূর্ণ এই বিশ্বাসের ক্ষেত্রে অন্য কাহাকেও তাঁর শরীক মনে করা।
- আশ-শিরকু ফিত্‌-তাদবির : অর্থাৎ, বিশ্ব জগতের সৃষ্টি, তার পরিচালনা, সংরক্ষণ এবং উহার প্রলয় সাধনের ক্ষেত্রে আল্লাহর সথে অন্য কাউকে শরীক সাব্যস্ত করা।
- আশ-শিরকু ফিল ইবাদা: অর্থাৎ, ইবাদতে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করা। ইবাদত হলো হুকুম পালন করা। সুতরাং, আল্লাহ্‌র কিছু কিছু হুকুম পালনের পাশাপাশি আল্লাহর আদেশের পরিপন্থি অন্যান্য সত্ত্বারও হুকুম পালন করা এ ধরনের শিরক এর অন্তর্ভুক্ত।

কেউ কেউ শিরককে শিরকে আকবার এবং শিরকে আসগার এই দুই শ্রেণিতে এবং কেউ কেউ শিরক আজীম বা জালী অর্থাৎ বড় শিরক ও স্পষ্ট শিরক এবং

শিরক সাগীর অর্থাৎ, সুক্ষ্ম ও অস্পষ্ট শিরক এই দুই শ্রেণিতে ভাগ করেছেন।- ইসলামী বিশ্ব কোষ-ইফা

অমুসলিমগণ প্রায় সকল ধরনের শিরকে লিপ্ত থাকে। পক্ষান্তরে মুসলমানদের একটি বিরাট অংশ প্রতিনিয়ত আশ-শিরকু ফিল ইবাদা এবং শিরকে আসগার বা শিরকে সাগীর দ্বারা আক্রান্ত। বিশেষ করে যে সকল মুসলমান একমাত্র আল্লাহর দ্বীন কায়েমের আন্দোলন ব্যতীত যে কোনো মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা, প্রচলন, সংরক্ষণের আন্দোলন বা কাজে নিজেকে জড়িত রেখেছে বা সহযোগিতা করছে, তারা এ জাতীয় শিরক এ লিপ্ত রয়েছে। আমরা এ বইতে ইতিমধ্যে এ বিষয়টি আলোচনা করেছি বিধায় তার পুনরুল্লেখ করছি না। দাওয়াতী কাজের ক্ষেত্রে এ বিষয়সমূহ যথাযথভাবে উপস্থাপন করতে হবে।

আল্লাহর একত্ববাদ তথা তাওহীদের বিশ্বাস ও স্বীকৃতি

এ বিষয়টি হলো শিরকের ঠিক বিপরীত একটি বিষয়। যখন মানুষের মৌখিক ঘোষণা এবং তার বাস্তব কাজ এ সাক্ষ্য দেয় যে, সে আল্লাহর একত্ববাদের উপর ঈমান এনেছে, কেবল তখনই তাঁর কালিমা পড়ার স্বার্থকতা থাকতে পারে। অন্যদিকে দৈনিক হাজার বার কালেমা পড়ার দ্বারাও কোনো ফায়দা হাসিল হবে না, যদি তার বাস্তব কাজ আল্লাহর একত্ববাদের বিশ্বাসের বিপরীত বিশ্বাসের সাক্ষ্য প্রদান করে। যে সকল মানুষ নিজেকে সেক্যুলার রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত রাখে তাদের এ কর্মটি এ সিদ্ধান্তে আসার জন্য যথেষ্ঠ যে, তিনি আল্লাহর উপর পূর্ণমাত্রায় বিশ্বাসী নয়। আমাদের এ পুস্তিকার আল্লাহ্‌র উপর ঈমান অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বিধায় এখানে তার পুনরুল্লেখ নিস্প্রয়োজন।

মুহাম্মদ সা.কে আল্লাহ্‌র রাসূল হিসেবে স্বীকৃতি দান

এটিও কালেমার অপরিহার্য দাবি যে, মুহাম্মদ সা.কে আল্লাহ্‌র রাসূল হিসেবে নিজের কথা এবং বাস্তব কাজ দ্বারা স্বীকৃতি দিতে হবে। যখন কোনো মানুষ নিজেকে ধর্মহীন রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত রাখে, তখন তার এহেন কাজ এ কথা প্রকাশ করে যে, সে প্রকৃতার্থে মুহাম্মদ সা.কে আল্লাহ্‌র রাসূল হিসেবে পূর্ণমাত্রায় স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত নয়। এ বিষয়টি নবী-রাসূল বা রিসালাতের উপর ঈমান অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

অতএব দাওয়াতের বিষয়বস্তু কেবল একটিই। আর তা হলো কালেমার দাওয়াত। তবে কালেমার দাওয়াত দেয়ার সাথে সাথে যার উদ্দেশ্যে দাওয়াত পেশ করা হচ্ছে, তিনি কালেমার সঠিক মর্মার্থ বুঝেন কিনা, সে দিকে আহ্বায়ককে

মনোযোগ দিতে হবে। কেউ যখন কালেমার দাওয়াত সত্যিকার অর্থে গ্রহণ করে নেয়, তখন তাঁর আচরণের মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। যে মানুষটি আল্লাহর গুণের সাথে বহু সত্ত্বার গুণরাজির মিশ্রণ ঘটাতো, সে পরিপূর্ণভাবে নিজেকে তা থেকে মুক্ত করে নেবে। ব্যাপক অর্থে আল্লাহর ইবাদত বা হুকুম পালন বলতে যা বুঝায়, সে ক্ষেত্রে যে মানুষটি ইতিপূর্বে আল্লাহ ছাড়াও নিজের নাফসের হুকুমসহ বিভিন্ন সত্ত্বার হুকুম পালনকারী ছিল, সে তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তার নাফসসহ সকল হুকুমদাতার হুকুম অস্বীকার করে একমাত্র আল্লাহর হুকুম পালনে নিষ্ঠাবান হয়ে উঠবে। যে ব্যক্তিটি তার জীবনে নাফসের ইচ্ছার অনুসরণসহ বিভিন্ন ব্যক্তি, নেতা, শয়তানের অনুসরণ করতো সে কালেমার দাওয়াত গ্রহণ করার পর একমাত্র রাসূল সা. এর অনুসারী হয়ে যাবে। যখন কালেমা গ্রহণ করার দাবিদার কোনো ব্যক্তির মধ্যে উল্লেখিত পরিবর্তন/বৈশিষ্ট্য দেখা যাবে, তখন বুঝা যাবে কালেমার সঠিক অর্থ সে বুঝেছে এবং কালেমা গ্রহণ করে নিয়েছে। অন্যথায় বুঝতে হবে কালেমার প্রকৃত প্রভাব তার উপর পড়েনি এবং তাকে বুঝাতে হবে কালেমার এ ধরনের স্বীকৃতি দ্বারা পরকালীন মুক্তি, তথা কালেমার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। এ ক্ষেত্রে আহ্বায়ক যাকে কালেমার দিকে আহ্বান করতে চায়, তার সঠিক অবস্থা অবলোকন করে সুকৌশলে একজন দক্ষ পরামর্শকের মতো তাকে তার অবস্থা এবং করণীয় বিষয় বুঝিয়ে দিতে হবে।

দাওয়াতের পদ্ধতি

রাসূল আকরাম সা.এর দাওয়াত দানের পদ্ধতি লক্ষ্য করলে তিনটি পদ্ধতি পরিলক্ষিত হয়।

১. ব্যক্তিগতভাবে দাওয়াত।
২. সামষ্টিক বা জনসমক্ষে/সার্বজনীন দাওয়াত এবং
৩. লেখনীর মাধ্যমে দাওয়াত

ব্যক্তিগতভাবে দাওয়াত

রাসূল আকরাম সা.এর দাওয়াতের সূচনা হয় ব্যক্তিগতভাবে দওয়াত পৌঁছানোর মাধ্যমে। নবুওয়াত প্রাপ্তির পর তিনি সর্বপ্রথম দাওয়াত দেন তাঁর সহধর্মিণী খাদিজাতুল কুবরা রা.কে। অত:পর আলী ইবনে আবূ তালিব, রাসূল সা. এর চাচা আবূ তালিব, যায়দ ইবনে হারিছা রা. আবূ বকর রা.। তাদের মধ্যে আবূ তালিব ব্যতীত সকলে ইসলাম গ্রহণ করে সৌভাগ্য অর্জন করেন। ইসলাম

গ্রহণের পর অন্যান্য সাহাবাবৃন্দও ব্যক্তিগতভাবে দাওয়াতের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে রাসূল আকরাম সা. যে সকল বিষয় বিবেচনায় রেখেছেন বলে অনুভূত হয়, তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো:

১. তিনি ব্যক্তিগতভাবে দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে প্রথমে এমন কতিপয় মানুষকে বাছাই করে নেন, যারা তার দওয়াতকে সহজে কবুল করে নেবে। এজন্য দেখা যায় তিনি প্রথমত তাঁর আপনজনদেরকে দাওয়াতের জন্য বেছে নিয়েছিলেন। তিনি সা. আবূ তালিবকে বলেছিলেন 'হে চাচা! যাদের আমি কল্যাণ করার প্রয়াস পেয়েছি এবং যাদেরকে আমি সত্য পথের প্রতি দাওয়াত দিয়েছি, তাদের মধ্যে আপনিই আমার এই দাওয়াত গ্রহণ করার সর্বাধিক উপযুক্ত ব্যক্তি। আর আমাকে সহযোগিতা করার ব্যাপারে আপনি অধিক হকদার"-সীরাতে বিশ্বকোষ- ইফা

২. তিনি দাওয়াতের অনুকূল পরিবেশ বজায় রাখার সাধ্যমতো চেষ্টা করেছিলেন। আর তাই বিশৃঙ্খলা পরিহারের লক্ষ্যে প্রথম দিকে দাওয়াতের কাজে গোপনীয়তা রক্ষা করেন।

৩. তিনি সমাজের এমন সব ব্যক্তিদেরকে ইসলামে অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, সমাজের উপর যাদের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে এবং যাদের অন্তর্ভুক্তির কারণে ইসলাম প্রচারের পরিবেশ অনুকূলে আসবে। যেমন- রাসূল সা. দোয়া করেছিলেন 'আল্লাহ উমার ইবনুল খাত্তাব অথবা আমর ইব্ন হিশামের দ্বারা ইসলামকে শক্তিশালী করো।'

৪. যারা দাওয়াত গ্রহণে বেশি আগ্রহী ছিলেন, দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে তাদেরকে বেশি গুরুত্বারোপ করেছেন।

সামষ্টিক বা জনসমক্ষ্যে সার্বজনীন দাওয়াত

রাসূল আকরাম সা. সামষ্টিক এবং জনসমক্ষে সাধারণভাবে দ্বীনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। এ বিষয়ে দুটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য;

একদা রাসূল সা. আলী রা.কে লক্ষ্য করে বলেন: হে আলী! ছাগলের একটি আস্ত রান এবং এক সা' শস্য দ্বারা তুমি খাবারের আয়োজন করো এবং দুধের একটি বড় পেয়ালা প্রস্তুত রাখো। তারপর মোত্তালিব বংশের লোকজনকে একত্র করো। আলী রা. নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করলেন। প্রায় চল্লিশজন লোক সমবেত হলো। আলী রা. খাদ্য ভর্তি পাত্র তাদের সামনে উপস্থিত করলেন। রাসূল সা. পেয়ালা হতে গোশতের একটি টুকরা উঠায়ে নিজের পবিত্র দন্ত দ্বারা একটু চিবিয়ে পুনরায় উক্ত পেয়ালায় রেখে দিলেন। তারপর উপস্থিত লোকজনকে আল্লাহর নামে

খাদ্য গ্রহণ করতে আহ্বান জানানো হলো। সকলে তৃপ্তি সহকারে আহার করলো এবং দুধ পান করলো, অথচ তাতে খাদ্যের ও দুধের পরিমান এতোটা অল্প ছিল যে, তাদের এক ব্যক্তিই তা সাবার করতে পারতো। অত:পর রাসূল সা. দাওয়াত পেশ করার জন্য প্রস্তুত হলে আবূ লাহাবের কুটকৌশলে সে দিনের মতো দাওয়াত পেশ করা সম্ভব হয়নি। পরদিন মহানবী সা. অনুরূপ আয়োজন করে আহার শেষে তাঁদেরকে লক্ষ্য করে বলেন: 'আল্লাহ্‌র জন্যই সকল প্রশংসা। আমি তাঁর প্রশংসা করছি এবং তাঁর কাছে সাহায্য চাইছি। তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করছি। তাঁর ওপর ভরসা করছি। আমি এ সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের উপযুক্ত কেউ নেই। তিনি এক এবং অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো শরীক নেই।' -আর রাহীকুল মাখতুম

রাসূল আকরাম সা. একদিন সাফা পাহাড়ের ওপর উঠে আওয়াজ দিলেন যে, ইয়া সাবাহাহ অর্থাৎ, হায় সকাল, হে বনি ফিহর, হে বনি আদী। এই আওয়াজ শুনে কুরায়েশ গোত্রসমূহ তাঁর কাছে সমবেত হলো। যিনি যেতে পারেননি, তিনি একজন প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন। তখন রাসূল সা. তাঁদেরকে আল্লাহ্‌র তাওহীদ, তাঁর রিসালাতের এবং কেয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাস স্থাপনের দাওয়াত দিলেন। তিনি বলেছিলেন, তোমরা বলো যদি আমি তোমাদেরকে বলি যে, পাহাড়ের ওদিকের প্রান্তরে একদল ঘোড়সওয়ার আত্মগোপন করে আছে, ওরা তোমাদের ওপর হামলা করতে চায়, তোমরা কি সে কথা বিশ্বাস করবে? সবাই বললো, হ্যাঁ, বিশ্বাস করবো, কারণ আপনাকে আমরা কখনো মিথ্যা বলতে শুনিনি। নবী সা. বললেন, শোনো, আমি তোমাদেরকে এক ভয়াবহ আযাবের ব্যাপারে সাবধান করার জন্য প্রেরিত হয়েছি।-আর রাহীকুল মাখতুম।

লেখনীর মাধ্যমে দাওয়াত

রাসূল আকরাম সা. এর পক্ষে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাত করে দ্বীনের আহ্বান জানানো সম্ভব হয়নি, তাঁদেরকে লিখিত পত্রের মাধ্যমে দাওয়াত দিয়েছেন। ষষ্ঠ হিজরীর শেষ দিকে রাসূল সা. বিভিন্ন বাদশাহ ও আমীরদের নামে চিঠি প্রেরণ করে তাঁদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন। চিঠি লেখানোর পর রাসূল পাক সা. মোহারাংকিত করে বিজ্ঞ সাহাবাগণের কয়েকজনকে দিয়ে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন বাদশাহ ও আমীরদের কাছে চিঠি প্রেরণ করেন। যে সকল ব্যক্তিদের কাছে চিঠি প্রেরণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশী, মিসরের বাদশাহ মুকাওকিস, পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজ, রোমক সম্রাট কায়সার, বাহরাইনের শাসন কর্তা মুনযের ইবনে ছাদির, ইয়ামামার

শাসনকর্তা হাওযা ইবনে আলী, দামেস্কের শাসনকর্তা গাসসানি উল্লেখযোগ্য। এ সকল চিঠির মধ্যে একটি ছিল নিম্নরূপ:

'এই চিঠি নবী মুহাম্মদের পক্ষ থেকে হাবশার বাদশাহ আসহামের নামে। যিনি হেদায়াতের অনুসরণ করবেন এবং আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবেন তার ওপর সালাম। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ পাক ব্যতীত ইবাদতের উপযুক্ত কেউ নেই। তাঁর স্ত্রী পুত্র কিছু নেই। আমি এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দাহ ও রাসূল। আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি, কেননা আমি আল্লাহর রাসূল। কাজেই ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তিতে থাকবেন। হে আহলে কিতাব, এমন একটি বিষয়ের প্রতি আসুন, যা আমাদের এবং আপনাদের মধ্যে সমান। আমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করবো না। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবো না, আল্লাহ ব্যতীত কাউকে প্রভু হিসেবে স্বীকার করবো না। যদি কেউ এ বিশ্বাস গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়, তবে তাকে বলুন যে, সাক্ষী থাকো, আমি মুসলমান। যদি আপনি এ দাওয়াত গ্রহণ না করেন, তবে আপনার উপর আপনার কওমের নাছারাদের সমুদয় পাপ বর্তাবে।'-আর রাহীকুল মাখতুম

দাওয়াতের ক্ষেত্রে কৌশল

দ্বীনের প্রতি আহ্বান করার কাজটা খুব একটা সহজ নয়। আমাদেরকে পারস্পরিক হক কথা/কাজের পরামর্শ আর দ্বীনের প্রতি আহ্বান এর মধ্যকার পার্থক্য বুঝা দরকার। আল্লাহ তা'য়ালা সূরা আল-আসর এর তৃতীয় আয়াতে একজন অন্যজনকে হক কথা বলার ও সবর করার উপদেশ দেয়ার যে কথা বলেছেন, তা সম্পন্ন হয় দুজন ঈমানদার মানুষের মধ্যে। ফলে একজন অন্যজনের কাছে হক কথার উপদেশ দিলে, যেহেতু উপদেশ গ্রহীতার মধ্যেও ঈমান বিদ্যমান থাকে সে সহজে অনুধাবন করতে পারে এবং মন থেকে উপদেশ মেনে নেয়ার তাগিদ অনুভব করে। ফলে সে উপদেশ মেনে নেয়, ভুলের জন্য অনুতপ্ত হয়, অন্তত: নীরব থাকে। যেমন- কোনো একজন মুসলমান নামাজের বিষয়ে উদাসীন, তাকে নামাজের বিষয়ে যত্নশীল হওয়ার উপদেশ দেয়া। কোনো মুসলমান ঘুষ খাওয়ায় অভ্যস্ত, তাকে ঘুষ খাওয়া হতে বিরত থাকার উপদেশ দেয়া এবং সমাজের কোনো অন্যায় বন্ধ করার জন্য তৎপর হওয়ার উপদেশ দেয়া হলো হক কথা/কাজের উপদেশ।

হক কথা/কাজের উপদেশ দেয়ার কাজটি যতটা না কঠিন, তদপেক্ষা অধিক কঠিন হলো দ্বীনের প্রতি আহ্বান জানানো। কেননা আহ্বায়ক কোনো একটি বিষয়ে ঐসকল ব্যক্তিকে আহ্বান জানায়, যাদের মধ্যে ঐ বিষয়টি বিদ্যমান নেই।

যেমন–একজন অমুসলিমকে মুসলমান হয়ে যাওয়ার আহ্বান জানানো, একজন বস্তুবাদী ব্যক্তিকে তাওহীদের প্রতি আহ্বান জানানো, একজন সেক্যুলার রাজনীতিবিদকে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করার কাজে আত্মনিয়োগ করার মাধ্যমে দ্বীনের মধ্যে পূর্ণরূপে দাখিল হয়ে যাওয়ার আহ্বান জানানো।

আহ্বায়ক যে বিষয়ের প্রতি আহ্বান জানায়, আহুত ব্যক্তি হয়তো তার বিপরীত বিশ্বাস অন্তরে লালন করে। ফলে তার আহ্বানে সাড়া দেয়ার জন্য প্রথমে তাকে নিজস্ব বিশ্বাস ত্যাগ করতে হবে। একজন মানুষ দীর্ঘ সময় হতে যে বিশ্বাস লালন করে আসছে, তা তার মন হতে মুছে ফেলে, ঐ বিশ্বাসের প্রতি তার অনীহা/ঘৃণা/অনুতাপ তৈরি করে নতুন একটি বিষয়ে তাকে আগ্রহী করে তোলার কাজটি স্বাভাবিক কারণে সহজ হওয়ার কথা নয়। আর তাই আহ্বায়ককে এ কাজে সফল হতে হলে অতিশয় কৌশলী হতে হবে। মহান আল্লাহ কালামে হাকীমে বলেছেন :

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ١٢٥

‘হে নবী! তোমার প্রতিপালকের পথের দিকে দাওয়াত দাও হিকমত ও উত্তম নসীহতের সাহায্যে। আর লোকদের সহিত পরস্পর বিতর্ক করো এমন পন্থায় যা অতি উত্তম। তোমার প্রতিপালকই ভালো জানেন, কে তাঁর পথ হতে ভ্রষ্ট হয়েছে, আর কে সঠিক পথে আছে।’ -সূরা নাহল: আয়াত ১২৫

সুতরাং, দাওয়াতের কাজে হিকমত একটি অপরিহার্য বিষয়। তবে তা প্রয়োগের পূর্বে আমাদেরকে হিকমতের মর্মার্থ বুঝে নিতে হবে, অন্যথায় হিকমতের নামে কুটকৌশলের প্রয়োগ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যাবে। কেননা, এমনও দেখা গেছে, কিছু কাজ সুস্পষ্টভাবে হারাম হওয়া সত্ত্বেও তার প্রয়োগ করে তা দ্বীন কায়েমের ক্ষেত্রে কৌশল হিসেবে চালিয়ে দেয়া হয়েছে, যা কখনো কাঙ্খিত হতে পারে না।

বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ তাফহীমুল কুরআনে সূরা আন্ নাহ্ল এর ১২৫তম আয়াতের অনুবাদ করা হয়েছে-

‘হে নবী! প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা এবং সদুপদেশ সহকারে তোমার রবের পথের দিকে দাওয়াত দাও।’

এবং এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে-

‘অর্থাৎ দাওয়াত দেবার সময় দুটি জিনিসের প্রতি নজর রাখতে হবে। এক. প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা এবং দুই. সদুপদেশ। জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার মানে হচ্ছে, নির্বোধদের

মতো চোখ বন্ধ করে দাওয়াত প্রচার করবে না। বরং বুদ্ধি খাটিয়ে যাকে দাওয়াত দেয়া হচ্ছে তার মন-মানস, যোগ্যতা ও অবস্থার প্রতি নজর রেখে এবং এ সঙ্গে পরিবেশ পরিস্থিতি বুঝে কথা বলতে হবে। একই লাঠি দিয়ে সবাইকে তাড়িয়ে নেয়া যাবে না। যে কোনো ব্যক্তি বা দলের মুখোমুখি হলে প্রথমে তার রোগ নির্ণয় করতে হবে। তারপর এমন যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে তার রোগ নিরসনের চেষ্টা করতে হবে, যা তার মন-মস্তিষ্কের গভীরে প্রবেশ করে তার রোগের শিকড় উপড়ে ফেলতে পারে।

সদুপদেশের দু'টি অর্থ হয়। এক. যাকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে, তাকে শুধুমাত্র যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে তৃপ্ত করে দিয়ে ক্ষান্ত হলে চলবে না, বরং তার আবেগ-অনুভূতির প্রতিও আবেদন জানাতে হবে। দুস্কৃতি ও ভ্রষ্টতাকে শুধুমাত্র বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে বাতিল করলে হবে না। বরং মানুষের প্রকৃতিতে এসবের বিরুদ্ধে যে জন্মগত ঘৃণা রয়েছে, তাকেও উদ্দীপ্ত করতে হবে এবং সেগুলোর অশুভ পরিণতির ভয় দেখাতে হবে। ইসলামের দীক্ষা গ্রহণ ও সৎকাজে আত্মনিয়োগ শুধু যে ন্যায়সঙ্গত ও মহৎ গুণ, তা যৌক্তিকভাবে প্রমাণ করলে চলবে না। বরং সেগুলোর প্রতি আকর্ষণও সৃষ্টি করতে হবে। দুই. উপদেশ এমনভাবে দিতে হবে, যাতে আন্তরিকতা ও মঙ্গলাকাঙ্খা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। যাকে উপদেশ দান করা হচ্ছে, সে যেন একথা মনে না করে যে, উপদেশদাতা তাকে তাচ্ছিল্য করছে এবং নিজের শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতির স্বাদ নিচ্ছে। বরং সে অনুভব করবে উপদেশ দাতার মনে তার সংশোধনের প্রবল আকাঙ্খা রয়েছে এবং আসলে সে তার ভালো চায়।'

উল্লেখিত আয়াত সম্পর্কে তাফসীর গ্রন্থ মা'রেফুল কুরআনে যে ব্যাখ্যা রয়েছে তা নিম্নরূপ–

আলোচ্য ১২৫তম আয়াতে দাওয়াত ও প্রচারের পূর্ণাঙ্গ কর্মপন্থা, মূলনীতি ও শিষ্টাচারের পূর্ণ বিবরণ অল্প কথায় বিধৃত হয়েছে।

হিকমত (حِكْمَةٌ) শব্দটি কুরআনে অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ স্থলে কোনো কোনো তাফসীরবিদ হিকমতের অর্থ কুরআন, কেউ কুরআন ও সুন্নাহ এবং কেউ কেউ অকাট্য যুক্তি প্রমাণ স্থির করেছেন। রূহুল মা'আনী, বাহ্‌রে মুহীতের বরাত দিয়ে হিকমতের তাফসীর করেছেন। এমন বিশুদ্ধ বাক্যকে হিকমত বলা হয়, যা মানুষের মনে আসন করে নেয়। এ তাফসীরের মধ্যে সব উক্তি সন্নিবেশিত হয়ে যায়। রূহুল বায়ানের গ্রন্থকারও প্রায় এই অর্থটিই এরূপ ভাষায় বর্ণনা করেছেন : হিকমত বলে সে অর্ন্তঃদৃষ্টিকে বোঝানো হয়েছে, যার সাহায্যে মানুষ অবস্থার তাগিদ জেনে নিয়ে তদনুযায়ী কথা বলে। এমন সময় ও সুযোগ খুঁজে নেয় যে, প্রতিপক্ষের উপর বোঝা হয় না। নম্রতার স্থলে নম্রতা এবং কঠোরতার

স্থলে কঠোরতা অবলম্বন করে। যেখানে মনে করে যে, স্পষ্টভাবে বললে প্রতিপক্ষ লজ্জিত হবে, সেখানে ইঙ্গিতে কথা বলে কিংবা এমন ভঙ্গি অবলম্বন করে, যদ্দরূন প্রতিপক্ষ লজ্জার সম্মুখীন হয় না এবং তার মনে একগুয়েমিভাবও সৃষ্টি হয় না।

সুতরাং, আমরা উপরোক্ত আলোচনা হতে যা বুঝতে পারি তা হলো, হিকমত বলতে এমন একটি পদ্ধতিকে বুঝানো হয়েছে, যে পদ্ধতির মাধ্যমে দাওয়াত দিলে, যাকে দাওয়াত দেয়া হচ্ছে তার মনে সর্বাধিক প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু হিকমত বলতে এমন কোনো পন্থা অবলম্বন করাকে বুঝায় না, যে পন্থায় শরীয়তের কোনো মৌলিক বিষয় সম্পর্কে ছাড় দেয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় বা শরীয়তের সীমার বাইরে অবস্থান করে কোনো কিছু করতে হয়।
রাসূল আকরাম সা. এর দাওয়াতী কাজের কৌশল আমরা নির্ভরযোগ্য সীরাত গ্রন্থ হতে বুঝে নিতে পারি এবং তদনুসারে কৌশল প্রয়োগ করতে পারি।

দায়ীর অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য

দাওয়াতের কার্যকারিতা অনেকাংশে নির্ভর করে আহ্বায়কের ব্যক্তিগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপর। কেননা আহুত ব্যক্তি প্রথমে আহ্বায়কের কথা আর তার কাজের মধ্যে একটি মিল খুঁজে পেতে চায়। যদি উভয়ের মধ্যে তারতম্য পরিলক্ষিত হয়, তবে সে তার আহ্বানের প্রতি সামান্যতম গুরুত্ব দেয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। বরং আহ্বায়কের গায়ে ভন্ডামীর গন্ধ খুঁজে পায় এবং তাচ্ছিল্যের সাথে তার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে। অপরদিকে যদি আহ্বায়ক তার চারিত্রিক সৌন্দর্য দ্বারা আহুত ব্যক্তির মনের উপর একটি বিশ্বস্ততার, নির্ভরতার ছাপ ফেলে দিতে পারে, তবে তার উপস্থাপিত বিষয়টি সম্পর্কে আহুত ব্যক্তি চিন্তা করতে, বিবেচনা করতে আগ্রহী হয়। ফলে বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করার জন্য আহুত ব্যক্তির মন উন্মুক্ত হয় এবং সে এ নিয়ে ভাবতে শুরু করে। বিষয়টি তার মনপুত: হলে সে ধীরে ধীরে নিজের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে শুরু করে। অন্তর হতে পূর্বধারণা দূর করে নতুন বিষয় গ্রহণ করার জন্য মস্তিষ্ক তৈরি হতে থাকে।

রাসূল আকরাম সা. এর চারিত্রিক সৌন্দর্য, বলিষ্ঠতা, উন্নততর মানসিকতা, বিশ্বস্ততা, দৃষ্টি ভঙ্গির প্রসারতা এবং মানবিক উদারতা মানুষকে এতোটাই বিমুগ্ধ করেছে যে, মানুষ তাঁর আহ্বান শুনেছে আর বলেছে এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই এবং অনতিবিলম্বে তাঁর আহ্বানের প্রতি সাড়া দিয়েছে।

রাসূল আকরাম সা. এর উপর প্রথম ওহী নাযিল হওয়ার পর তিনি যখন বাড়ি ফিরে তাঁর সহধর্মীনী খাদীজা বিন্ত খুওয়াইলিদ রা. এর নিকট এসে সমস্ত ঘটনা

জানালেন, আর বললেন: আমি আমার জীবন সম্পর্কে আশংকাবোধ করতেছি তখন খদীজা রা. সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'কখনো নয়, আল্লাহ্‌র শপথ! তিনি কখনো আপনাকে অপমানিত করবেন না। কারণ আপনি নিজ আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখেন, দুর্বল ও অসহায়দের খেদমত করেন, অভাবীগণকে উপার্জনক্ষম করেন, মেহমানদারী করেন ও সত্য পথের পথিক এবং বিপদগ্রস্তদেরকে সাহায্য করেন।' রাসূল সা. যখন দাওয়াতে দ্বীনের কাজ শুরু করলেন তখন তিনি (খাদিজা রা.) নির্দ্বিধায় দাওয়াত কবুল করে নেন। -সীরাতে বিশ্বকোষ, ইফা

যায়দ ইবনে হারিছা রা. ছিলেন স্বচ্ছল পরিবারের সদস্য। তাঁর বয়স যখন আট বৎসর তখন দস্যু দ্বারা অপহৃত হন এবং গোলাম হিসেবে বিক্রি হয়ে বিভিন্ন হাত বদলের পর রাসূল সা. এর নিকট আসেন। নবুওয়াতী জিন্দিগীর পূর্বে মুহাম্মদ সা. তাঁকে গোলামী হতে মুক্ত করে পালক পুত্রের মর্যাদা দিয়েছিলেন। একসময় যায়েদ রা.এর পিতা হারিছা ইব্‌ন শুরাহ্‌বিল যায়েদ রা. এর এক চাচাসহ যায়েদ রা. এর খোঁজে রাসূল সা. এর নিকট উপস্থিত হন এবং যায়েদ রা.কে মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্ত করে দেয়ার আবেদন জানান। জবাবে রাসূল সা. তাদের বলেন, তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করুন। সে যদি আপনাদের সঙ্গ অবলম্বন করে নেয়, তবে সে আপনাদের সাথে যাবে, আর সে যদি আমার সাথে থাকতে চায়, তবে আমার সাথে থাকবে। আমি তাঁর ব্যাপারে জবরদস্তি করবো না। অতঃপর যায়েদকে রা. ডাকা হলে যায়েদ রা. তাঁর পিতা এবং চাচাকে চিনতে পারেন এবং রাসূল সা. তাঁকে পিতার সাথে যাওয়ার বা রাসূল সা. এর সাথে থাকার স্বাধীনতা দিলে যায়েদ রা. অসংকোচে বলে দিলেন 'আমি আপনাকে ছাড়া আর কাউকে অবলম্বন করতে পারবো না। আপনি আমার জন্য পিতা এবং চাচা।' তাঁকে যখন ইসলামের দাওয়াত দেয়া হয় তিনি তা প্রশ্নাতীতভাবে কবুল করে নেন।

রাসূল আকরাম সা. এর চাচা আবূ তালিব, যে ইসলাম গ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেনি, রাসূল সা. এর চারিত্রিক মাধুর্যের কারণে তাঁর প্রতি এতোটাই আস্থা রাখতেন যে, কোনো বিষয়েই তিনি রাসূল আরাম সা. এর কাছ থেকে কোনো অকল্যাণের আশংকা করতেন না। আবূ তালিব তার পুত্র আলী রা.কে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন 'শোনো! তিনি তোমাকে কল্যাণের পথেই দাওয়াত দিয়েছেন। সুতরাং, এতে অটল থাকো।'

স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু তা'য়ালা রাসূল আকরাম সা. এর স্বভাব এবং দাওয়াতের উপর তার প্রভাব সম্পর্কে কালামে হাকীমে ইরশাদ করেছেন:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَا نْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۪ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ١٥٩

'হে নবী, ইহা আল্লাহ্‌র বড় অনুগ্রহের বিষয় যে, তুমি এইসব লোকের জন্য খুবই নম্র স্বভাবের লোক হয়েছ। অন্যথায় তুমি যদি উগ্র-স্বভাব ও পাষাণ হৃদয়ের অধিকারী হতে, তবে এইসব লোক তোমার চর্তুদিক হতে দূরে সরে যেতো; অতএব এদের অপরাধ মাফ করে দাও, তাঁদের জন্য মাগফেরাতের দুআ করো এবং দ্বীন-ইসলামের কাজকর্মে তাঁদের সাথে পরামর্শ করো। অবশ্য কোনো বিষয়ে তোমার 'মত' যদি সুদৃঢ় হয়ে যায়, তবে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করো। বস্তুত: আল্লাহ্ তাঁদের ভালোবাসেন, যারা তাঁর উপর ভরসা করে কাজ করে।'

-সূরা আলে-ইমরান: আয়াত ১৫৯

সুতরাং, দায়ী'র চরিত্র এতোটা সুন্দর, এতোটা সুশোভিত হওয়া উচিত যার আকর্ষণে মানুষ তার দিকে দৌড়ে আসবে, তাকে অনুসরণ করতে প্রস্তুত হয়ে যাবে।

দায়ী'র দ্বীনি ও সমকালীন জ্ঞানও হতে হবে ব্যাপক, যেন সে আহুত ব্যক্তির জ্ঞান পিপাসা/অনুসন্ধিৎসা নিবারিত করতে পারে এবং দায়ী' হবে সমকালীন বাতিলের বুদ্ধি বৃত্তির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম।

দ্বীন কবুলকারী মুসলিমদের জন্য জ্ঞানার্জন এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা

দ্বীন প্রতিষ্ঠায় রাসূল সা. এর কর্মসূচীর অন্যতম বিষয় ছিল প্রশিক্ষণ। রাসূল আকরাম সা. এর পক্ষ থেকে দ্বীনের দাওয়াত গ্রহণ করে নেয়ার পর রাসূল সা. তাঁর সাহাবাগণকে রা. প্রশিক্ষিত করে তুলেছিলেন। প্রাথমিক অবস্থায় রাসূল সা. ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে তাঁর অনুসারীদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। হিজরতের পর মসজিদে নববীই ছিল রাসূলের সা. মূল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। তাছাড়াও চলাফেরার সময়ে, সফরে-গৃহে, যুদ্ধের ময়দানে এবং বিভিন্ন ক্ষণে রাসূল সা. মুসলমানদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। এ প্রশিক্ষণের বদৌলতেই রাসূল সা. এর সাহাবাগণ রা. সোনার মানুষে পরিণত হন। তাঁদের চরিত্রে পরিলক্ষিত হয় আমূল পরিবর্তন। সীমাহীন উগ্র মানুষটি হয়ে যান অপরিসীম বিনয়ী, হিংস্র মানুষটি হয়ে যান পূর্ণ নিরাপদ, জ্ঞানহীন মানুষটি পরিণত হন বিজ্ঞ শিক্ষকে, বিবেকহীন মানুষটি হয়ে যান ইনসাফের প্রতীক, অপরের সম্পদ লুণ্ঠনে ওৎ পেতে

থাকা মানুষটি হয়ে যান দানশীল, অহংকারী মানুষ নিজেকে নিয়োজিত করেছেন নিজ ভৃত্যের খেদমতে, কৈশোর না পেরুতেই দূরন্ত বেগে ছুটে চলে যুদ্ধের ময়দানে।

যখন কুরআনের আয়াত নাযিল হতো, রাসূল সা. তাঁর সাহাবাগণকে তা শিক্ষা দিতেন এবং তিনি বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর সাহাবাগণকে শিক্ষা দিতেন। সাহাবাগণও এ শিক্ষা গ্রহণে থাকতেন সর্বদাই উদগ্রীব। যাদের পক্ষে রাসূল সা. এর প্রশিক্ষণালয়ে সবসময় উপস্থিত থাকা সম্ভব হতো না, তারা পালা করে উপস্থিত হতেন এবং একজন অপরজন হতে না জানা বিষয় জেনে নিতেন। এ বিষয়ে উমর রা. বর্ণনা করেন, আমি এবং আমার এক আনসার প্রতিবেশি বনু উমাইয়া ইব্ন যাইদের পল্লীতে বাস করতাম। উক্ত পল্লী ছিল মদীনার আওয়ালী অঞ্চলে। আমরা পালাক্রমে রাসূল সা. এর কাছে আসতাম। একদিন তিনি আসতেন, একদিন আমি আসতাম। যেদিন আমি আসতাম সে দিনের ওহী ইত্যাদির খবর আমি তাঁকে দিতাম আর যেদিন তিনি আসতেন, তিনিও অনুরূপ করতেন।-সহীহ আল বুখারী

যুদ্ধের প্রক্কালেও থাকতো রাসূল সা. এর জ্ঞনগর্ভ আলোচনা যা থেকে তাঁর সাহাবাগণ রা. খুঁজে পেতেন পথের দিশা। বদর যুদ্ধের প্রক্কালে রাসূল সা. একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রথমেই তিনি আল্লাহর প্রশংসা করে বলেন, আল্লাহ তাআলা যার প্রতি তাদেরকে উৎসাহিত করেছেন আমিও তার প্রতি তোমাদেরকে উৎসাহিত করতেছি এবং যা করতে নিষেধ করেছেন আমিও তা নিষেধ করছি। আল্লাহ মহান, তিনি হকের নির্দেশ দেন, সত্য পছন্দ করেন, সৎকর্মপরায়নকে তার কর্ম অনুযায়ী মর্যাদা দান করেন। তোমরা হকের মনজিলে পৌঁছেছ। তিনি কেবল সে আমলই কবুল করেন যা তাঁর সন্তুষ্টির জন্য করা হয়। নিরাশার সময় ধৈর্য্যধারণ করলে আল্লাহ্ তার দ্বারা মুশকিল আসান করে দেন এবং দু:খ-কষ্ট হতে পরিত্রান দান করেন। আখিরাতে তার বিনিময়ে তোমরা মুক্তি পাবে। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নবী আছেন। তিনি তোমাদেরকে সতর্ক করেন এবং সৎ কাজের নির্দেশ দেন। তাই আজ তোমরা এমন কাজ করতে লজ্জাবোধ করো যা দেখলে তিনি রাগান্বিত হন। কারণ তিনি ইরশাদ করেছেন;

'তোমাদের প্রতি তোমাদের ক্ষোভ আপেক্ষা আল্লাহর অপ্রসন্নতা ছিল অধিক'
(৪০:১০)

আল্লাহ তাঁর কিতাবে যা নির্দেশ করেছেন তার প্রতি লক্ষ্য রেখ, উহা মজবুতভাবে ধারণ করো। তাহলে তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন এবং তোমাদের প্রতি রহমত ও মাগফেরাতের যে ওয়াদা করেছেন, তা তোমরা লাভ করবে। কারণ তাঁর ওয়াদা হক, তাঁর কথা সত্য এবং তাঁর শাস্তি

কঠোর। আমি ও তোমরা মহান আল্লাহ্‌র সাথে রয়েছি। তাঁর নিকটই আমরা আশ্রয় চাই, তাঁর উপরই ভরসা করি এবং তাঁর দিকে আমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আল্লাহ্‌ আমাদেরকে এবং সকল মুসলমানকে ক্ষমা করুন।

-সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ-সূত্র; সীরাত বিশ্বকোষ:ইফা

রাসূল আকরাম সা. তাঁর সাহাবাগণকে রা. যুদ্ধের প্রশিক্ষণও প্রদান করেছেন এবং কৌশল শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বদর যুদ্ধের প্রক্কালে ১৭ ই রমজান শুক্রবার প্রভাতে যুদ্ধের জন্য মুসলিম বাহিনীকে কাতারবন্দী করতে লাগলেন। তাঁর হাতে ছিল ছোট একটি তীর। তার দ্বারা তিনি কাতার সোজা করছিলেন। বানূ আদী ইবনুন নাজ্জার এর মিত্র সাওয়াদ ইবন গাযিয়্যা নামক জনৈক সাহাবী কাতার হতে একটু সামনে অবস্থান করছিলেন। রাসূল সা. তীর দ্বারা তাঁর পেটে মৃদু খোঁচা দিয়ে বললেন, সোজা হয়ে দাঁড়াও হে সাওয়াদ।

বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে রাসূল সা. সাহাবীগণকে যুদ্ধ কৌশল সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিয়ে বলেন, আমার অনুমতি ব্যতীত কেউ যুদ্ধ শুরু করবে না, আগে আক্রমন করবে না। তারা তোমাদের নিকটবর্তী হয়ে পড়লে তাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করবে। তোমাদেরকে ঘিরে না ফেলা পর্যন্ত তরবারী চালনা করবে না। তীরগুলোও সংরক্ষণ করে রাখবে।-ইবনে কাছীর-সূত্র; সীরাত বিশ্বকোষ:ইফা

অতএব দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য যে কর্মসূচী থাকবে, তার অন্যতম উপাদান হতে হবে প্রশিক্ষণ।

ঐক্য ও জামাতবদ্ধ মুসলিম উম্মাহ্‌

রাসূল আকরাম সা. এর সময়ে যারা দ্বীনের দাওয়াত কবুল করেছেন, তাঁরা নিরঙ্কুশভাবে রাসূল আকরাম সা. এর আনুগত্য মেনে নিয়ে তাঁর মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। রাসূল আকরাম সা. এর অনুমতি ব্যতীত তাঁরা কোনো মজলিশ ত্যাগ করতো না, যুদ্ধের ময়দানে অনুপস্থিত থকতো না, তাঁর নির্দেশ ছাড়া কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সমীচীন মনে করতো না। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে প্রত্যেক মুসলমান রাসূল আকরাম সা. এর নির্দেশ অনুসরণের মাধ্যমে একটি সুশৃঙ্খল, সুসংবদ্ধ উম্মাহতে পরিণত হন। এ উম্মাহর প্রতিটি সদস্য অপেক্ষমান থাকতেন কখন কোনো নির্দেশ আসে, আর তার পরিপালনে কে অগ্রগামী হতে পারেন।

রাসূল সা. কখনো কাউকে কোনো অভিযান পরিচালনার জন্য দায়িত্বশীল নিয়োগ করলে দলের সকলে তাঁর নির্দেশ অনুসরণ করেছেন। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর সকল মুসলমান রাষ্ট্র প্রধানের আনুগত্য করেছেন। এভাবে ইসলাম প্রচারের সূচনা লগ্ন থেকে শুরু করে দ্বীনের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার পর যতদিন খিলাফত

ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল, ততদিন মুসলমানগণ ঐক্যবদ্ধভাবে কার্য পরিচালনা করেছেন এবং সংঘবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ জীবনযাপন করেছেন। ফলে আল্লাহ তাঁদেরকে বিজয় দান করেছেন এবং দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ দান করেছেন। আল্লাহ কালামে হাকীমে বলেন :

وَ اعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّ لَا تَفَرَّقُوْا ۠ وَ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖۤ اِخْوَانًا ۚ وَ كُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ১০৩

'সকলে মিলে আল্লাহ্‌র রজ্জু শক্ত করে ধারণ করো এবং দলাদলিতে পড়িও না। আল্লাহ্‌র সেই অনুগ্রহকে স্মরণে রাখিও, যা তিনি তোমাদের প্রতি করেছেন। তোমরা পরস্পরের দুশমন ছিলে, তিনি তোমাদের মন মিলিয়ে দিয়েছেন এবং তাঁরই অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে। তোমরা আগুনে ভরা এক গভীর গর্তের কিনারায় দাঁড়িয়ে ছিলে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে তা হতে রক্ষা করলেন। আল্লাহ্ এইভাবেই তাঁর নিদর্শনসমূহ তোমাদের সম্মুখে উজ্জ্বল করে ধরেন, এই উদ্দেশ্যে যে হয়তোবা এই নিদর্শনসমূহ হতে তোমরা তোমাদের কল্যাণের পথ লাভ করতে পার।' -সূরা আলে-ইমরান: আয়াত ১০৩।

সুতরাং, দ্বীন প্রতিষ্ঠা এবং প্রতিষ্ঠা পরবর্তী সংরক্ষণের জন্য অন্যতম শর্ত হলো, সকল ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধভাবে কার্য পরিচালনা এবং সংঘবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ জীবনযাপন।

ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও তার সংরক্ষণ

এটা এক সাধারণ বিষয় যে আমরা কালেমা পাঠের মাধ্যমে যে ঘোষণা দেই, ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা ব্যতীত তার উপর পূর্ণাঙ্গ আমল করা সম্ভব নয়। কেননা একটি অনৈসলামিক রাষ্ট্রে শত শত ইসলাম বহির্ভূত আইন থাকে। ফলে একজন মুসলমানকে ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, সে আইন অনুসরণ করতে হয়। সে কালেমা পাঠের মাধ্যমে একমাত্র আল্লাহকে ইলাহ হিসাবে ঘোষণা দেয়া সত্ত্বেও হাজারো মানুষ তার কাছে ইলাহ দাবি করে। মুহাম্মদ সা.কে আল্লাহর রাসূল হিসেবে ঘোষণা দিয়ে তাঁর অনুসরণে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও হাজারো মানুষ অনুগত্য পাওয়ার দাবি করে। কোনো মানুষ আল্লাহ ব্যতীত কাউকে ইলাহ মানতে এবং মুহাম্মদ সা. ব্যতীত কারো অনুগত্য করতে অস্বীকার করলে, রাষ্ট্রব্যবস্থার সাথে সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। তাছাড়া রাষ্ট্রব্যবস্থা ছাড়া আল্লাহর সকল হুকুম কার্যকর করাও যায় না। যেমন–ফৌজদারী অপরাধের জন্য আল্লাহ নির্ধারিত শাস্তি কার্যকর করার জন্য রাষ্ট্র ক্ষমতা আবশ্যক। সুতরাং, মুসলমানদের জন্য কালেমা পাঠের পর তার নির্ভেজাল অনুসরণের সুযোগ সৃষ্টির জন্য প্রথম লক্ষ্য হবে একটি ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পর তা নিজে নিজেই টিকে থাকে না। তার সংরক্ষণের জন্যও সর্বদা সতর্কাবস্থা বজায় রাখতে হয়।

রাসূল সা. এর নবুওয়াতী জিন্দিগীর কাজের পরিপূর্ণতা আসে একটি ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এবং তাঁর ওফাত পরবর্তী সময়ে রাসূলের সা. চার জন নিকটতম সাহাবী, সকল সাহাবাগণের সম্মিলিত অংশগ্রহণে ও সমর্থনসহ, উক্ত ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা সংরক্ষণে আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন আর যখন নিখাঁদ ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় লাগলো বিকৃতির ছোঁয়া, তখন রাসূল সা. এর প্রিয়তম দৌহিত্র হোসাইন রা. ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার ক্ষত সাড়িয়ে সুস্থ করতে সংগ্রাম করতে গিয়ে অকাতরে পরিবার পরিজন-সাথীদেরসহ নিজের জীবনকে আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ করেছেন।

ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য কোনো একটি জনপদের অধিকাংশ মানুষকে ইসলামী আদর্শের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে এবং সংরক্ষণের জন্য মুসলমানদেরকে আদর্শের বিষয়ে সর্বদা শ্রদ্ধাশীল রাখতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন হলো ব্যাপক দাওয়াত ও তাবলীগ এবং ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যোগ্য নেতৃত্ব।

রাসূল সা. এর দাওয়াত গ্রহণ করে মদীনার মানবগোষ্ঠী ইসলামী আদর্শ ধারণ করে প্রিয় নবী সা.কে সাদরে নিজেদের নেতা হিসেবে গ্রহণ করে নেয়। হিজরত পরবর্তী সময়ে রাসূলকে সা. কেন্দ্র করে সেখানে একটি মুসলিম জনপদ তৈরি হয়। মুসলমানরা উক্ত জনপদে সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করে এবং ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হয়।

মক্কা তখন অমুসলিমদের দখলে থাকলেও সেখানে মূলত: মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। কেননা মক্কার মুসলমানরা বিভিন্ন স্থানে হিজরত করায় মূলত: সেখানে মুসলমানরা সংখ্যালঘু হয়ে পড়ে। মক্কায় মুসলমানদের প্রত্যাবর্তন সেখানেও মুসলিম সংখাগরিষ্ঠতার সৃষ্টি করে এবং মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে তাও ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়।

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান ছিলেন মুহাম্মদ সা.। একজন নবীর উপস্থিতিতে অন্য কারোর জন্য প্রধান হওয়ার কোনো সুযোগ এ কারণে নেই যে, আল্লাহর প্রত্যাদেশ নবীর নিকটই এসে থাকে, যা সাধারণ মানুষের কাছে আসে না। আর আল্লাহ স্বয়ং তাঁকে উম্মতের অনুসরণযোগ্য আদর্শ করেছেন।

রাসূল আকরাম সা. এর ওফাত পরবর্তী আবস্থায় উক্ত রাষ্ট্রের সংরক্ষণের দায়িত্ব অর্পিত হয় তাঁর সাহাবী, তথা সকল মুসলমানের উপর। তাঁরা রাসূল সা. কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থা সংরক্ষণের জন্য তাঁদের সামর্থের সর্বোচ্চ প্রয়োগ করেন। রাসূল সা. এর ওফাতের প্রেক্ষিতে ওমর রা. এতোটা শোকাহত হয়ে পরেন যে তিনি সাধারণ জ্ঞানও হারিয়ে ফেলেন। তিনি এ ঘোষণা দেন, যে ব্যক্তি বলবে রাসূল সা. মৃত্যুবরণ করেছেন, তিনি তাকে হত্যা করবেন। তিনি ঘোষণা করতে থাকেন, মুসা আ. যেমন আল্লাহর ডাকে পাহাড়ে গিয়েছিলেন এবং পুনরায় ফিরে এসেছেন, তেমনি মুহাম্মদ সা. ফিরে আসবেন।

সাহাবীগণের এ শোকাতুর আবস্থায়ও তাঁরা রাষ্ট্রের সংরক্ষণের বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় রাসূল আকরাম সা. এর দাফনের পূর্বেই রাষ্ট্রের জন্য একজন খলীফা নিয়োগ করেন।

পরবর্তীতেও বিভিন্ন সময়ে এ রাষ্ট্রের উপর অনেক ঘাত-প্রতিঘাত আসতে থাকে। এ সকল পরিস্থিতিতেও রাসূলুল্লাহ্ সা. এর সাহাবাগণ রা. সামান্য পরিবর্তন, আপোস বা বিকৃতি বরদাশত করেননি।

সাহাবা রা. যতক্ষণ পর্যন্ত এ বিষয়ে আপোসহীনভাবে রাসূল আকরাম সা. এর আদর্শ অনুসারে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার সংরক্ষণ করেছেন, ততদিন পেয়েছেন খিলাফতের মর্যাদা। যারা এ রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিকৃতি সাধন করেছে, তারা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও ইতিহাসে ধিকৃত হয়েছে।

সুতরাং, মুসলমানদের ঈমানের দাবি হলো, ঈমান গ্রহণের পর ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য দৃঢ় প্রত্যয়ে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পর তার সংরক্ষণে অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করা। মনে রাখতে হবে, সত্যিকার অর্থে ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের জন্য অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নোক্ত তিনটি বিষয় আবশ্যক:

১. একটি জনপদ।
২. ইসলামকে জীবন-বিধান হিসেবে গ্রহণ করে নেয়ার মতো ঈমানদার জনসাধারণ।
৩. ইসলামের উপর গভীর জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও তাকওয়া সম্পন্ন নেতৃত্ব।

নেতৃত্ব যদি তাকওয়া শূন্য হয় বা তাকওয়ার ঘাটতি থাকে, তবে উক্ত নেতৃত্ব ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় এবং ইসলামী রাষ্ট্র সংরক্ষণে কখনো সক্ষম হতে পারে না। আর নেতৃত্ব কেমন হবে, তাও অনেকটা নির্ভর করে জনসাধারণ বা জনশক্তির বৈশিষ্ট্যের উপর। কেননা জনশক্তি বা জনসাধারণ যদি সৎ, তাকওয়া সম্পন্ন এবং ধী শক্তিসম্পন্ন হয়, তারা তাঁদের জন্য যোগ্য নেতৃত্ব বাছাই করবে, আর ব্যতিক্রম ক্ষেত্রে নিজেদের স্বার্থ যাদেরকে দিয়ে রক্ষা পাবে, তাদের হাতে নেতৃত্ব তুলে দেবে। জনশক্তি বা জনসাধারণকে কেবলমাত্র নেতার আনুগত্য করলে চলবে না, মাঝে মধ্যে নেতার বৈশিষ্ট্যের দিকেও তাকাতে হবে। কোনো ইসলামী দলের মূল নেতৃত্ব বা ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান যদি কোনো না কোনোভাবে লোভী, অহংকারী বা লোক দেখানোর প্রবণতাসম্পন্ন হয় এবং উক্ত দল বা রাষ্ট্র তার নেতৃত্বকে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিয়ে চলতে থাকে, তবে উক্ত দলের বা ইসলামী রাষ্ট্রের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। নেতৃত্ব উক্ত নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী কিনা, তা পরীক্ষা করার একটি মিটার আছে, তা প্রয়োগে প্রায় সঠিক অবস্থা বুঝা যায়।

নেতার মধ্যে যদি উক্ত নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যসমূহ থাকে, তবে দেখা যাবে নেতা ধীরে ধীরে পূর্বাপেক্ষা সম্পদশালী হয়ে উঠছে। দলীয় বা রাষ্ট্রীয় পদের পরিচয়টা নিজের পার্থিব ভাগ্য উন্নয়নে ব্যবহার করছে। নিজের পদমর্যাদার বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠছে। কেউ তাকে পদের কারণে প্রাপ্য মর্যাদা হতে সামান্য কম মর্যাদা দিলে সে সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে থাকে। আচরণে বিনয়ের ভাবটা ধীরে ধীরে কমতে থাকবে। তার কোনো কাজ বা অন্য কোনো বিষয়ে কেউ প্রশংসা করলে উক্ত নেতার মন দারুনভাবে সাড়া দেয়। তিনি উক্ত প্রশংসা শোনার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেন, বক্তার প্রতি মনোযোগী হন এবং এ ধরনের আলোচনা বেশ পছন্দ করতে থাকেন। নেতার পরিবারের সদস্যরা তার পরিচয়ে বিভিন্ন অসাধারণ সুবিধা

ভোগ করতে থাকবে এবং সম্মানের অংশিদার হওয়ার বিষয়ে চেষ্টা করবে। ইসলামী বিভিন্ন নীতির বিষয়ে তার মধ্যে নমনীয়তা দেখা যাবে। পদ রক্ষায় যে ধরনের নীতি গ্রহণ করা দরকার, তিনি তাই করতে থাকবেন।

ইসলামী দলের কোনো নেতা বা ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধানের মধ্যে যদি উপরোক্ত সকল বা কোনো কোনো বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, তবে ধরে নিতে হবে তিনি বিপথের দিকেই এগুচ্ছেন। এ অবস্থায় তার সংশোধন বা অপসারণ আবশ্যক। অন্যথায় তার অবশ্যম্ভাবী ফল হলো ইসলামী দলের বা ইসলামী রাষ্ট্রের নিশ্চিত অবক্ষয়।

কেউ কেউ বলে থাকেন বৈধভাবে সম্পদ বৃদ্ধি পেলে সমস্যা কোথায়? এটা সত্যি যে বৈধভাবে সম্পদ বৃদ্ধি পেলে কোনো সমস্যা নেই। তবে তা সাধারণ মুসলমানের জন্য, ইসলামী নেতার জন্য নয়। কেননা ইসলামী দলের নেতা বা ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধানের জন্য এ সুযোগ নেই। সাধারণ মুসলমানের জন্য যাকাত ওশর ব্যতীত কোনো দানের বিষয়ে বাধ্যবাধকতা আরোপ করা যায় না। কিন্তু একজন নেতা বা ইসলামী রাষ্ট্রের নেতার উপর তার জনশক্তি বা জনসাধারণের দায়িত্ব নিহিত রয়েছে। তিনি তার দলের জনশক্তি বা দেশের জনসাধারণকে দরিদ্র রেখে নিজে সম্পদশালী হতে পারেন না। তাছাড়া নেতা যদি সম্পদ অর্জনের বিষয়ে মনোনিবেশ করেন, তবে আন্দোলন বা ইসলামী রাষ্ট্র রক্ষার কাজ ব্যহত হওয়া স্বাভাবিক। নেতার মধ্যে যদি লোভের অনুপ্রবেশ না ঘটে, তবে তার পক্ষে ব্যক্তিগত সম্পদ পুঞ্জিভুত করার বিষয়ে মনোনিবেশ করার সুযোগ নেই। রাসূল আকরাম সা. এর সাহাবাগণের দিকে তাকালে দেখা যাবে, তাঁরা দান করে ধনী থেকে দরিদ্র হয়ে গেছেন। খলীফাগণ দেশের জনসাধারণকে অভুক্ত রেখে নিজে বা পরিবারের সদস্যগণ শান শওকতে থাকেননি।

অতএব নিজেদের মধ্যে এ ধরনের প্রবণতা পরিলক্ষিত হলে নেতাকে তা অনতিবিলম্বে পরিত্যাগ করতে হবে অথবা তার অপেক্ষা ভালো কোনো ব্যক্তির অনুকূলে দায়িত্ব ন্যস্ত করতে হবে। জনশক্তি বা দেশের জনসাধারণকে এ ধরনের বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন নেতা বা রাষ্ট্র প্রধানের পরিবর্তে তাকওয়া ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন, নির্লোভ, নিরহংকার এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির অন্বেষণকারী ব্যক্তিদেরকে নেতা বানাতে হবে। তবেই আন্দোলন সফলকাম হওয়া এবং ইসলামী রাষ্ট্র রক্ষা করা সম্ভব।

প্রতিরোধমূখর পরিবেশে আহবায়কের কৌশল

ধর্মহীন রাষ্ট্রের মানুষ দ্বীনের আহবায়ককে অভিবাদন, সাদর সম্ভাষন জানাতে উদগ্রীব থাকবে–এমনটি এক আশাতীত বিষয়। বরং এ পথ বড়ই বন্ধুর, কণ্ঠকাকীর্ণ, নির্মম জুলুমের সুনিশ্চত আলিঙ্গন। আহবায়ক যে সমাজের মানুষকে ইসলাম গ্রহণ করার আহ্বান জানাবেন, সেখানে হয়তো বর্তমানে অন্য একটি জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তা হতে পারে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র বা পুঁজিবাদী ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা বা অন্য কিছু। সমাজের অধিকাংশ মানুষই হয়তো তার অনুসারী আর এর প্রবক্তা বা লালনকারীরা তার সুবিধাভোগী। যেমন- গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় অধিকাংশ জনসাধারণ যাদের সমর্থক, তারা সে সমাজের কর্ণধার, প্রভুর আসনে সমাসীন। এ সকল সমাজপতিদের মধ্যে যাদের হৃদয় আল্লাহ্‌র ভয় স্পর্শ করবে, যারা আখিরাতের জীবনের দিকে তাকিয়ে দ্বীনি আন্দোলনে সামিল হয়ে যাবে, তাদের ছাড়া অবশিষ্ট কর্ণধারদের সকলে নিজেদের বড়ত্ব, প্রভুত্ব তথা অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রত্যয়ে আহবায়কের কাজে ব্যাপক প্রতিরোধ গড়ে তুলবে। যদি আহবায়ক সঠিক পথের দিকে আহ্বান করেন, কায়েমী স্বার্থবাদীদের সাথে আহবায়কের সংঘাত অভিসম্ভাবী।

এরূপ প্রতিরোধমূখর পরিবেশে আহবায়কের কৌশল কী হবে, আহবায়ক কি সংঘর্ষ-সংঘাতে জড়িয়ে পড়বেন, না অন্য কোনো কৌশল অবলম্বন করবেন, তা একটি মৌলিক সিদ্ধান্তমূলক বিষয়। আমরা আগেও উল্লেখ করেছি, দ্বীন প্রতিষ্ঠার পথে প্রতিটি বাকে বাকে রাসূল সা. এর দেখানো মডেল বা সূত্রের প্রয়োগ করতে হবে। দ্বীনি আন্দোলন যদি সঠিক পথ ধরে এগোয়, রাসূল সা. যে পথ অতিক্রম করেছিলেন উক্ত আন্দোলনও সে ধরনের একটি পথ, এমন কি প্রতিটি বাকের মুখোমুখি হবে। সে ক্ষেত্রে রাসূল সা. এর প্রদর্শিত দিক নির্দেশনা হলো একমাত্র সমাধান। সুতরাং, ঐ পরিস্থিতিতে আল্লাহর রাসূল সা. ঠিক যে ধরনের কৌশল অবলম্বন করেছেন আজকের আহবায়কের কৌশলও হতে হবে তার অনুরূপ।

রাসূল সা. মক্কা নগরীতে দ্বীনের প্রতি যে আহ্বান করেছিলেন, তা ছিল মক্কা নগরীতে প্রতিষ্ঠিত পৌত্তলিকতা, সামাজিক রসম-রেওয়াজ, পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসরণসহ তাদের মৌলিক বিশ্বাস ও কর্মের বিপরীত। ফলে দ্বীন প্রচারের শুরুতে তাদের পক্ষ হতে হৈচৈ শুরু হওয়া এবং বাধার মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। রাসূল সা. দাওয়াতের শুরুটা করেছিলেন গোপনীয়তার সাথে। তিনি তাঁর আপনজন ও বিশ্বস্ত মানুষগুলোর কাছে প্রথম দাওয়াত পৌঁছে দেন। গোপন দাওয়াতের মাধ্যমে রাসূল সা. এর কিছু সহচর তৈরি হওয়ার পর তিনি প্রকাশ্যে

দাওয়াত দেয়া শুরু করেন। তিনি তাওহীদ, রিসালাত, কিয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানালেন এবং পাশাপাশি পৌত্তলিকতার ভ্রান্ততা ও অকল্যাণসমূহ, মূর্তিসমূহের অসাড়তা, শক্তিহীনতা ও রসম-রেওয়াজের বিভৎস দিকগুলো তুলে ধরেন। এ সকল পন্থা-প্রক্রিয়া অনুসরণ করে যে মানুষ সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় নিমগ্ন রয়েছে, তা তিনি খোলামেলা প্রকাশ করেন। ফলাফল হলো- রাসূল সা. এর মুখে নিজেদের পথভ্রষ্টতার কথা শুনে এবং নিরঙ্কুশভাবে মানুষকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের হাতে ন্যস্ত করার আহ্বান শুনে ঐ সমাজের সর্দার-কর্ণধাররা ক্রোধ-আক্রোশে দিশেহারা হয়ে পড়লো। তারা সত্যের এ আহ্বান স্তব্ধ করে দেয়ার মানসে ব্যাঘ্রসম হিংস্রতায় নও মুসলিমদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। তারা রাসূল সা. এর উপর বিভিন্ন ধরনের অপবাদ আরোপ করলো। শারীরিক, মানসিক নির্যাতন বৃদ্ধি করলো। রাসূলের সা. সাহাবিগণকে রা. নিশংস নির্যাতনে ক্ষতবিক্ষত করলো, শহীদ করে দিলো। কিন্তু রাসূল সা. এর কৌশল ছিল অত্যাচারীদের প্রতিশোধ গ্রহণ না করা, সম্ভবত যাতে তাদের অত্যাচারের গতি অরও বৃদ্ধি না পায়। তিনি দ্বীনের দাওয়াত অব্যাহত রাখেন এবং ক্রমশ গতি বৃদ্ধি করেন, কিন্তু তাদের উপহাসের জবাবে উপহাস করেননি, মন্দ অপবাদের জবাবে অপবাদ আরোপ করেননি, শারীরিক নির্যাতনের জবাবে সংঘর্ষে জড়াননি, হত্যার জবাবে হত্যা করেননি। এমনকি তাদের এতসব অন্যায়ের কোনো প্রতিশোধও নেননি।

হাজারো ঘটনার মধ্যে একটি ছিল এমন 'আম্মার ইবনে ইয়াসের রা. ছিলেন বনু মাখযুমের ক্রীতদাস। তিনি এবং তাঁর পিতামাতা ইসলাম গ্রহণের পর তাঁদের উপর ভয়াবহ নির্যাতন শুরু করা হলো। আবু জেহেলের নেতৃত্বে পৌত্তলিকরা তাঁদেরকে উত্তপ্ত রোদে বালুময় প্রান্তরে শুইয়ে রেখে কষ্ট দিতো। একবার তাদের এভাবে শাস্তি দেয়া হচ্ছিলো, এমন সময় রাসূল সা. সে পথে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, হে ইয়াসের পরিবার, ধৈর্য্য ধারণ করো, তোমাদের ঠিকানা হচ্ছে জান্নাত।'

তবে বিষয়টা এমনও ছিল না যে, শাহাদাত লাভের মানসে মুসলমানরা নিজেদেরকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিলেন। বরং সংঘর্ষ-সংঘাত এড়িয়ে চলে দ্বীনের প্রচার অব্যাহত রেখেছিলেন। সতর্ক থাকার পরও যখন নির্যাতনের মুখোমুখি হয়েছিলেন, নিজেকে আল্লাহর নিকট সোপর্দ করে পরম ধৈর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছিলেন। শা'বে আবু তালেবে প্রায় তিন বছর অবরুদ্ধ থেকে মানবেতর জীবন যাপন করেছেন।

মুসলিম উম্মাহ যতক্ষণ না যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় সম্পন্ন করেছে, ততক্ষণ নির্যাতনের মুখে ধৈর্য্য ধারণ করেছেন স্বাভাবিক সহ্যক্ষমতার সীমা ছাড়িয়ে। পৌত্তলিকদের প্রচণ্ড অত্যাচার ও লাঞ্ছনার মুখে জনৈক সাহাবী আরজ করলেন 'হে আল্লাহর রাসূল সা., আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করলেই পারেন।' এ কথা শুনে আল্লাহর রাসূল সা. শায়িত অবস্থা থেকে উঠে বসলেন, তাঁর চেহারা মোবারক রক্তিম হয়ে উঠলো, তিনি বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী সময়ে ঈমানদারদের অবস্থা এমন হয়েছিল যে, লোহার চিরুনী দিয়ে তাঁদের গোশত খুলে নেয়া হতো, দেহে থাকতো শুধু হাড়, এরূপ অত্যাচারও তাঁদেরকে আল্লাহ্‌র দ্বীনের উপর বিশ্বাস থেকে সরাতে পারেনি।

নির্যাতনের মুখে এ ধৈর্য্য ধরনের ফলাফল হলো চূড়ান্ত বিজয়। এ ধরনের নির্যাতনের কারণে ঈমানদারদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া নিরীহ মানুষের উপর অত্যাচার সৎপ্রবন মানুষের মধ্যে দরদ-সহানুভূতি ও সুবিচারবোধ সৃষ্টি করে। অত্যাচারিতের আপনজন বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করে এবং অনেক ক্ষেত্রে তাদের অন্ত:দৃষ্টি খুলে যায়। এতে সত্যের প্রতি মানুষের সমর্থন বৃদ্ধি পায়। আক্রমন একপক্ষীয় হওয়ায় তার তীব্রতা অপেক্ষাকৃত সীমিত থাকে। অত্যাচারের মাত্রা যখন চূড়ান্ত সীমা অতিক্রম করে, মানুষের আয়ত্বের বাইরে চলে যায়, তখন আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে সাহায্য আসে। পক্ষান্তরে অত্যাচারের জবাবে পাল্টা আক্রমন করা হলে সংঘাত-সংঘর্ষ ব্যাপকতা লাভ করে। মানুষ এ অবস্থাকে ভালো ভাবে গ্রহণ করে না এবং সহানুভূতিশীল হওয়ার পরিবর্তে প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠে। এতে আন্দোলনের মর্মার্থ বুঝার সুযোগ তাদের জন্য অবারিত থাকে না।

এ কারণে আন্দোলন চূড়ান্ত সফলতায় পৌছার পূর্ব পর্যন্ত নির্যাতন সহ্য করার মানসিক প্রস্তুতি এবং ধৈর্য্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার দৃঢ় সংকল্প থাকতে হবে। উল্লেখ্য, নির্যাতন সহ্য করার কৌশল গ্রহণ করা সত্যেও দাওয়াতে দ্বীনের পাশাপাশি আরও দুটি কাজ অব্যাহত থাকতে হবে, তার একটি হলো সৎ কাজ ও সৎ কাজের আদেশ এবং অপরটি হলো অসৎ কাজের নিষেধ ও প্রতিরোধ। দাওয়াতে দ্বীনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত না করেও এ কাজ দুটি করা সম্ভব। কেননা আহবায়ক সে সমাজের একটি অংশ। সাধারণত: সমাজের সব লোক একসাথে অসৎপ্রবণ হয় না। যাদের মধ্যে সৎপ্রবণতা আছে, তারা দাওয়াতে দ্বীনের বিষয়ে সকল সময় একমত না হলেও, এ জাতীয় কাজে সমর্থন ও সহযোগিতা দিয়ে থাকে, আর তাই এ কাজটি অব্যাহত রাখা যায়। এ কাজ দু'টি অব্যাহত রাখলে একদিকে সমাজের অসৎপ্রবণ লোক অসীম ক্ষমতায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে না, অপরদিকে এ কাজে অংশগ্রহণকারীদের সামাজিক ভিত্তি

মজবুত হয়। ফলে আন্দোলনের সফলতা তরান্বিত হয়। রাসূল সা. ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ অবস্থায়ও এ সকল সামাজিক কাজ অব্যাহত রেখেছেন।

আরও একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন, ইসলামী মদিনা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পর রাসূল সা. উক্ত রাষ্ট্র রক্ষায় প্রয়োজনে প্রতক্ষ্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হন।

অতএব আজও যদি কেউ ইসলামী আন্দোলনকে সফল করতে চায়, প্রাথমিক অবস্থায় নির্যাতিত জীবনকে মেনে নেয়ার মানসিকতা মেনে নিয়ে আন্দোলন-সংগ্রমে আসতে হবে।

বাংলাদেশে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ্

সূচনা পর্ব : বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলন তথা জিহাদের ইতিহাস বেশ প্রাচীন। এ দেশে প্রথম জিহাদ শুরু হয় আরব বণিকদের দ্বারা। তাঁরা এ উপমহাদেশের সাথে পূর্ব থেকে বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। ইসলামী যুগে প্রতিটি মুসলমান ইসলাম প্রচারকে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন। ফলে মুসলমান বণিকগণ এ দেশে ইসলাম প্রচারেরও দায়িত্ব পালন করেন। তাঁদের দাওয়াতী কাজের ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্ এ দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার একটি পরিবেশ সৃষ্টি করেন। বণিকদল কর্তৃক ইসলাম প্রচারের সূচনার মাধ্যমে পরিবেশ সৃষ্টির পর আল্লাহ্র আরও কতিপয় বান্দাহ কেবল দ্বীন প্রচারের জন্য এ দেশে আসেন এবং দ্বীন প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এ সকল নেক বান্দাহদের মধ্যে শাহ্ সুলতান বলখী, শাহ্ মুহাম্মদ সুলতান রুমী, মাখদুম শাহদৌলা শহীদ, জালালুদ্দীন তাবরিজী, শাহ্ মাখদুম রুপোশ, বায়েজিদ বোস্তামী, শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামাহ, শায়খ আবদুল্লাহ কিরমানী, আমীর খান লোহানী, আব্বাস আলী মক্কী, শাহ্ বদরুদ্দীন, শাহ্ জালাল, আহমদ কল্লা শহীদ, আবুল খায়ের আরাবী প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

একসময় বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা মুসলমানদের হস্তগত হয় এবং প্রায় সাড়ে পাঁচশত বছর স্থায়ী থাকে। মুসলমান শাসন আমলে যদিও পরিপূর্ণ খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়নি, ইসলামী আইন প্রচলিত ছিল, যা একজন মুসলমান সাধারণ মানুষকে ব্যক্তিগত জীবনে পূর্ণমাত্রায় ইসলাম অনুসরণের অধিকার ও সুযোগ সৃষ্টি করে; কিন্তু একসময় সেই মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে, ইংরেজ শোষণ চেপে বসে মুসলমানদের ভাগ্যে নেমে আসে এক বিরাট বিপর্যয়। আর তখন আল্লাহ্র কিছু বান্দাহ ও মুজাহিদ এ দেশের জমিনে জিহাদের বীজ বপন করেন, যার শক্তিশালী শিকড় আজও বিদ্যমান। আল্লাহ্র দ্বীনের এ মুজাহিদদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একজন হলেন, ফরিদপুর জেলার বন্দর পরগনার হাজী শরীয়তুল্লাহ। এই মুজাহিদ পথহারা মুসলমানদেরকে পুনরায় পথের দিশা দিয়ে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন কায়েমের লক্ষ্যে আমরন জিহাদরত ছিলেন। দ্বীনের আরেক মুজাহিদ হলেন সৈয়দ মীর নিসার আলী তিতুমির। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের জবর দখলের পর বৃটিশরা যখন দেশের তৃণমূল পর্যায়ে আধিপত্য পর্যন্ত হিন্দু জমিদারদের হাতে তুলে দিল, আর জমিদাররা যখন মুসলমানদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও সামাজিক রীতি-নীতিতে সুক্ষ্ম আঘাত হেনে মুসলমানদেরকেও অর্ধ হিন্দুতে পরিণত করার

চেষ্টায় আংশিক সফলতা লাভ করলো, তখন দ্বীনের অনন্য মুজাহিদ সাইয়েদ নিসার আলী (তিতুমীর) বাংলায় দ্বীন প্রতিষ্ঠার জিহাদে আত্মনিয়োগ করেন। যেহেতু দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথমে জিহাদের মূল উপাদান তাক্ওয়া ও জ্ঞান সমৃদ্ধ মুজাহিদ তৈরি করা আবশ্যক, সেহেতু তিনি বৃটিশ ও হিন্দু আধিপত্যবাদীদের তৈরি করা অন্ধকার সমাজের ক্ষীণ দৃষ্টি সমৃদ্ধ মুসলমানদের কাছে দ্বীনের আলো ছড়িয়ে তাদেরকে জাগ্রত করতে তৎপর হন। তাঁর গভীর জ্ঞান ও তীক্ষ্ম প্রজ্ঞা সমেত কর্ম-প্রচেষ্টার কারণে জিহাদের অগ্রগতি অল্প সময়ে উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে পৌঁছে। কিন্তু দ্বীন বিরোধী ষড়যন্ত্রে কুফর সর্বদাই সর্বক্ষেত্রে তৎপর থাকে। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। হিন্দু আধিপত্যবাদী ও ইংরেজরা হাত মিলিয়ে ভারী কামান সমৃদ্ধ প্রশিক্ষিত সৈনিক দ্বারা চালায় প্রচণ্ড আক্রমন। শহীদ তিতুমীর বাঁশের কঞ্চি দ্বারা আক্রমন প্রতিহত করার প্রচেষ্টা চালান। আল্লাহ্ তো তাঁর কতিপয় বান্দাহকে শহীদ হিসেবে গ্রহণ করেই থাকেন। এ অসম যুদ্ধে পঞ্চাশজন মুজাহিদসহ দ্বীনের এ অনন্য মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেন, আর উত্তরসূরীদের জন্য রেখে যান শিক্ষা।

যুগশ্রেষ্ঠ আরো এক মুজাহিদের নাম সাইয়েদ আহমেদ বেরেলভী র.। তিনি উপমহাদেশে দ্বীন প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে জিহাদ করতে একটি সুসংগঠিত দল গঠন করেন। তাঁর গঠিত মুজাহিদ বাহিনী পাঞ্জাবের অধীনে প্রতিষ্ঠিত মুসলমান নিধনকারী শিখ রাষ্ট্রের শিখদেরকে পরাজিত করে বিজয় অর্জন করে বৃহত্তম বিজয়ের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। তাঁর সাফল্য অবলোকন করে প্রায় লক্ষাধিক মুজাহিদ তাঁর জিহাদে যোগদান করেন। এক সময় এক বৃহৎ অঞ্চলে কায়েম হলো দ্বীন। তাঁদের অভিযাত্রা যখন সাফল্যের দোড় গোড়ায় তখনই কতিপয় মুনাফিকের বিশ্বাসঘাতকতা তাঁর আন্দোলনকে বাধাগ্রস্ত করে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের প্রাণশক্তি ভন্ডদের দ্বারা নিহত হয়। আর কোনো সুযোগ বিদ্যমান না থাকায় বালাকোটে হিযরতকালে তিনি প্রায় শত মুজাহিদসহ যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।

পূর্বসূরীদের ধারাবাহিকতায় এ উপমহাদেশে আজও চলছে জিহাদ ফি সাবিলল্লাহ্র কাজ। বাংলাদেশে বর্তমানে মুসলমানরা বিভিন্ন শিরোনামে দল গঠন করে জিহাদ অব্যাহত রেখেছে। বিভিন্ন বিষয়ে মতপার্থক্য থাকার কারণে জিহাদরত মুসলমানগণ একদলভুক্ত হওয়ার পরিবর্তে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে জিহাদ অব্যাহত রেখেছে। যার সুযোগে সাধারণ মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করার লক্ষ্যে ইসলাম বিদ্বেষীদের প্রথম প্রশ্ন হলো ইসলামের নামে এতোদল কেন?

এ স্থানে তাদের এ প্রশ্নের জবাবদান সমীচীন মনে করছি। যদি ইসলামী দলসমূহের মূল লক্ষ্য হয় পূর্ণাঙ্গ ইসলাম প্রতিষ্ঠা, তবে একাধিক দল থাকার মধ্যে কল্যাণ ছাড়া কোনো অকল্যাণ নেই। এর কারণসমূহ নিম্নরূপ-

১. কোনো একটি সত্যকে অজ্ঞাত মানুষের কাছে সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে ও অধিক গ্রহণযোগ্য করে তুলতে সাক্ষ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোনো বিষয়ে সাক্ষীর সংখ্যা যত অধিক হবে, তাঁর বিশ্বাসযোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতাও হবে তত বেশি শক্তিশালী। ইসলামী দলসমূহের প্রথম ঘোষণা হলো 'আল্লাহ্‌র জমিনে আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করার জিহাদ করা বিকল্পহীন ফরয।'

সুতরাং, দলের সংখ্যা যত বেশি হবে এ বিষয়টির ঘোষণাকারীর সংখ্যা তথা জিহাদ ফরয হওয়ার বিষয়ে সাক্ষীর সংখ্যাও বেশি হবে। ফলে দ্বীন সম্পর্কে স্বল্প শিক্ষিত ও সাধারণ মানুষের মনে জিহাদ করা ফরজ হওয়ার বিষয়ে সংশয় থাকবে না। ফলে যারা সত্যিকার অর্থে মুসলমান হতে ও থাকতে চায়, তাঁরা সকলে জিহাদে অংশগ্রহণ করবে।

দ্বিতীয়ত: কোনো একটি বিশেষ দলের দুর্বলতা থাকার অজুহাতে জিহাদ থেকে বিরত থাকার অবকাশ বিনষ্ট হওয়ার কারণে সকলে জিহাদে শরীক হতে বাধ্য হবে। একটি সংগঠনের কিছু না কিছু দুর্বলতা থাকা স্বাভাবিক বিষয়। দলের সংখ্যা একটি হলে এর দুর্বলতার অজুহাতে অনেকে জিহাদ থেকে বিরত থাকার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। দলের সংখ্যা অধিক হলে একটির দুর্বলতা চোখে পড়লে এবং এর কারণে ঐ দলের অন্তর্ভুক্ত হতে না চাইলে অপর দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারবে। ফলে অপেক্ষাকৃত অধিক মুসলমান জিহাদে অংশগ্রহণ করবে।

তৃতীয়ত: দ্বীনের দাওয়াত দানকারী দায়ী'র সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। ফলে দ্রুত দাওয়াতের প্রসার ঘটবে।

চতুর্থত: যদি সকল দলসমূহের লক্ষ্য হয় ইসলাম প্রতিষ্ঠা, তবে ইসলাম প্রতিষ্ঠার স্বার্থে সময়মত সকল দলের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি হবে। আর তখন ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার দ্বারা ইসলাম প্রতিষ্ঠা হবে সহজতর।

সুতরাং, ইসলামী দল অধিক থাকার মধ্যে কোনো অকল্যাণ নেই, যাদি সকলের সংকল্প হয় ত্রুটিহীন। তাই বলে যখন যার ইচ্ছে তখন সে একটি করে নতুন দল গঠন করবে, তা-ও সঠিক ধারণা নয়। তখনই একটি নতুন দল গঠন করা যেতে পারে, যখন এমন একটিও দল পাওয়া যাবে না, যেটি ত্রুটিমুক্ত এবং দল গঠনে ইচ্ছুক ব্যক্তির যোগ্যতা, দক্ষতা ও অবস্থান এ নিশ্চয়তা দেবে যে, সে বিদ্যমান দল অপেক্ষা উত্তম দল গঠন করতে সক্ষম হবে।

নিজের অর্জিত জ্ঞান দ্বারা বিচার বিবেচনাপূর্বক যে দলটিকে উত্তম মনে হবে, সে দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে জিহাদ করা সাধারণ লোকদের জন্য অধিক নিরাপদ। বাংলাদেশে বর্তমানে অনেকগুলো দল ইসলামী আন্দোলনের ব্যানারে কাজ করছে। কোনো কোনো দল বেশ প্রসার লাভ করলেও অধিকাংশ অনেকটা প্রাথমিক সময় অতিক্রম করছে। ইসলামী ব্যানারে কাজ করা দলগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দল সম্পর্কে স্বল্প পরিসরে আলোকপাত করা হলো;

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনরত দলসমূহের মধ্যে জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস সব থেকে পুরাতন ও ঐতিহ্যবাহী। মাওলানা আবুল আ'লা মওদূদী র. ১৯৪১ সালে এ দলটির সূচনা করেন। তিনি ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের নৈতিক মান উন্নয়ন ও জ্ঞান সমৃদ্ধ করার জন্য যেমনি গড়ে তুলেছেন যথেষ্ট সাহিত্য সম্ভার, তেমনি যথার্থ কর্মী গড়ে তোলার জন্য দিয়েছেন ট্রেনিং এর পরিকল্পনা। আধুনিক যুগে যে নব নব সমস্যার উদ্ভব হয়েছে, ইসলামী আইনের আওতার মধ্যে থেকে সে সমস্যার সমাধানের পথ তিনি দেখিয়েছেন যুক্তি ও দালিলিক উপস্থাপনার মাধ্যমে। তিনি জিহাদের জন্য প্রয়োজনীয় সাহিত্য উপকরণসমূহের সন্নিবেশ করতে সক্ষম হয়েছেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর কিছুকাল জামায়াতে ইসলামীর প্রকাশ্য কার্যক্রম বন্ধ থাকে। তবে শাসকদের চোখের আড়ালে কর্মী তৈরির কাজ চলতে থাকে, যদিও খুব ধীর গতিতে। পরবর্তীতে একটা সময় আসলো যখন দেশের আমূল রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয় এবং জামায়াতে ইসলামী পুনরায় প্রকাশ্যে কার্যক্রম শুরু করলো। যেহেতু নিষিদ্ধ সময়ের দিনগুলোতেও তাঁদের কার্যক্রম নি:শেষ হয়ে যায়নি, সেহেতু প্রকাশ্যে কাজ শুরু করার দিন থেকে তাঁদেরকে পুনরায় নতুন করে শুরু করতে হয়নি। বরং ইতিমধ্যে এমন সব পরীক্ষিত নেতা-কর্মী তৈরি হয়েছিল, যারা কঠিনতম বিক্ষুব্ধ ময়দানেও থাকবে দৃঢ়পদ। ফলে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ প্রকাশ্যে কাজ শুরু করার অল্প সময়ের মধ্যে ভালো প্রসার লাভ করে। সেই ধারাবাহিকতায় ইসলামী আন্দোলনের প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহের সহজলভ্যতা, কর্মীদের দক্ষতা ও যুগোপযোগী কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামী একটি প্রতিষ্ঠিত শক্তিতে পরিণত হয়েছে।

ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রথম শর্ত হলো ইসলামী গভীর জ্ঞান, প্রজ্ঞা, তাকওয়া ও সাহস সমৃদ্ধ মুজাহিদ তৈরি করা। আবেগ এমন একটি বিষয়, যা সহজে দুর্দমনীয় আগুনেপরিণত হয়, আবার পরক্ষণে হয় নিস্প্রভ, নির্লিপ্ত, শান্ত। এ আবেগ দ্বারা খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে একটি বড় ধরনের ঘটনা ঘটিয়ে দেয়া সম্ভব। কিন্তু ইসলাম প্রতিষ্ঠার মতো একটি চিরস্থায়ী বিষয়ের গোড়াপত্তন সম্ভব নয়।

রাসূল আকরাম সা. দাওয়াত দিয়েছেন সকল মানুষকে, যারা সে দাওয়াত কবুল করেছেন, তাঁদেরকে তিনি নিকটে রেখেছেন, প্রশিক্ষণ দিয়েছেন, হৃদয়মধ্যে তৈরি করেছেন ঈমানের অনির্বাণ শিখা। তাঁরা যখন এ জ্ঞানটুকু লাভ করলেন এ পৃথিবী ও জীবন নেহায়েতই একটি নশ্বর বিষয়, তার বিপরীতে জিহাদের মাধ্যমে

লাভ করা যাবে চিরস্থায়ী চিরসুখের জান্নাত, তখন তাঁদের মধ্যে জিহাদের প্রবল আকাঙ্খা তৈরি হয়।

এ বিষয়টি বিবেচনায় রেখে মাওলানা মওদূদী র. জামায়াতের কর্মীদেরকে অর্জিত মানের ভিত্তিতে একাধিক পর্যায়ে ভাগ করেছেন এবং একটি মান অর্জনের পর মূল সদস্যের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কোনো ব্যক্তি ইসলাম প্রতিষ্ঠায় জিহাদ করার বিষয়ে ইচ্ছুক হওয়ার পর তাকে জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ দান এবং চর্চা করতে উদ্বুদ্ধ করে একটি পর্যায়ে উপনীত করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মূল সদস্য হিসেবে গণ্য করা হয়। ফলে মূল সদস্যের ভবিষ্যত গতিবিধি সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব হয় এবং সদস্যের সংখ্যানুপাতে পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক কর্মসূচী গ্রহণ করা সম্ভব হতে পারে।

নেতা নির্বাচনের বিষয়ে জামায়াতে ইসলামীর একটি সুন্দর, সুগঠিত নীতিমালা আছে। এর ফলে কৌশল করে নেতৃত্ব বা দলীয় পদ দখল করা যে কারোর পক্ষে প্রায় অসম্ভব। বরং এ জাতীয় চেষ্টাকারী দলে অযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। ফলে দলে নেতৃত্বের কোন্দলের কোনো সুযোগ নাই। এটি ইসলামী আন্দোলনের সাফল্যের একটি অন্যতম শর্ত।

এ দলটি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা দেশের মানুষের নৈতিক মান ও মানসিকতার উপর বেশ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম। যে ছোট শিশুটি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ইসলামী সংস্কৃতির স্পর্শ হতে বঞ্চিত হয়ে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে লালিত, তাকে পরিবর্তন করে ইসলামী আন্দোলনে নিয়োজিত করা অপেক্ষাকৃত কঠিন। তাই দেশে স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলামী সংস্কৃতির প্রসার ঘটিয়ে ইসলামী মন-মানসিকতা সম্পন্ন মানুষ তৈরি করা ইসলামী আন্দোলনের জন্য জরুরি। জামায়াতে ইসলামী পরোক্ষভাবে হলেও এই কাজটিতে অবদান রাখার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে এবং ইতিমধ্যে আংশিক সফলতা অর্জন করতে সক্ষমও হয়েছে।

তাছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইসলামী পরিবেশ তেরি ও সংরক্ষণে তাঁদের ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র শিবির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যে সাংস্কৃতিক ও নৈতিক অবক্ষয় শুরু হয়েছে, ইসলামী ছাত্র শিবির তার লাগাম কিছুটা হলেও টেনে ধরতে সক্ষম হয়েছে।

জামায়াতে ইসলামীর উপরোক্ত কর্মপদ্ধতির কারণে এর শক্তির একটি স্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

আমার মনে হয় এটি সংকল্পগত দিক থেকে একটি ইসলামী আন্দোলনরত দল এবং বাংলাদেশের প্রতিটি মুসলমানের পক্ষ হতে জামায়াতে ইসলামী সহযোগিতা

পাওয়ার দাবী রাখে। জামায়াতে ইসলামীকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করা যেতে পারে। যেমন–এর কার্যক্রমসমূহকে সফল করার জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা বা এর মধ্যে যদি এমন কোনো বিষয় পরিলক্ষিত হয়, যা ইসলামী আন্দোলনের জন্য ক্ষতিকর, তা পরিহারের পরামর্শ দেয়া, সংশোধনের প্রচেষ্টা চালানো।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীকে সহযোগিতার অংশ হিসেবে এ দলের প্রতি আমার ব্যক্তিগত অভিমত হলো নিম্নোক্ত বিষয়ে তাঁদের মনোনিবেশ করা প্রয়োজন :

১. মূল নেতৃত্বে যারা থাকবেন, অর্থাৎ, কেন্দ্র হতে থানা পর্যায় পর্যন্ত যারা মূল দায়িত্বশীল থাকবেন, তাঁদের মনে রাখতে হবে বৈধ পন্থায় ব্যাপক সম্পদ সমাবেশ জায়েজ হওয়া সত্ত্বেও নেতৃবৃন্দের জন্য এ কাজে জড়িত হওয়া ইসলামী আন্দোলনের সফলতার অন্তরায়। কেননা সম্পদ সমাবেশ লক্ষ্যে পরিণত হলে বিভিন্ন কারণে দায়িত্ব পালন ও নৈতিকমান বাধা প্রাপ্ত হয় ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যার কিছু বাস্তব নমুনা ইতিমধ্যে পরিলক্ষিত হয়েছে।

২. কোনোভাবেই ছোট খাট সুন্নাহ্‌র বিষয়ে অবহেলা প্রদর্শন করা উচিত নয়। ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে মুহসিন পর্যায়ে উন্নীত হতে হবে। তাঁরা ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত, হালাল-হারাম, মাখরুহ- সকল বিষয়ে নিবিড়ভাবে যত্নবান হবেন।

৩. মনে রাখতে হবে, ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ শর্তহীন আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী নয়। কর্মীদের প্রতি কোনোরূপ কঠিন নির্দেশ বা অযৌক্তিক ও অপ্রয়োজনীয় নির্দেশ চাপিয়ে দেয়া উচিত নয়। আনুগত্যের বিষয়টি সামনে রেখে নিজের বাড়তি মর্যাদা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের জন্য শোভনীয় নয়।

৪. যারা নেতৃত্ব দেবেন, তাঁদেরকে প্রশ্নাতীত সততার গুণ অর্জন করতে হবে। যখন এ গুণ প্রশ্নবিদ্ধ হবে, তখনই স্বেচ্ছায় নেতৃত্বের পদ হতে সরে দাঁড়াতে হবে। নীতির বিষয়ে সামান্য আপোস করা, কোনোরকম স্বজনপ্রীতি, পদ ধরে রাখার সুপ্ত বাসনা, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য পরিস্থিতির অজুহাতে ইসলামী বিধান হতে সামান্যতম বিচ্যুতি, কোনো বিষয়ে সরলতা পরিহার করে কুটকৌশল অবলম্বন- এ সবকিছু সততার মানকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

৫. নেতৃত্ব গঠনের ক্ষেত্রে যথাযথ ফিল্টারিং এর ব্যবস্থা থাকতে হবে। যারা সংগঠনে ভূমিকা রাখবেন, তাঁদের সংগঠন করার উদ্দেশ্যের দিকে খেয়াল দিতে হবে। নিয়ত সংক্রান্ত সহীহ আল বুখারীর প্রথম হাদীসটি প্রায় সকলের জানা আছে। হিজরতকারীদেরকে নিয়তের ভিত্তিতে পৃথক করার একটা বড়

কারণ আছে। একমাত্র উদ্দেশ্য যদি ইসলাম প্রতিষ্ঠা না হয়ে এর সাথে অন্য কোনো উদ্দেশ্য যুক্ত হয়, তবে তাঁদের দ্বারা আন্দোলন শক্তিশালী না হয়ে আরো ক্ষতিগ্রস্ত হবে। একটু পরিস্কার করে বললে বলতে হয়, যখন সংগঠন একটু বড় হয় তখন তার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের জন্য বিভিন্ন ধরনের সুযোগ তৈরি হয়, যেমন- ব্যবসা-বাণিজ্য, পদ-পদবী, সামাজিক মর্যাদা, বিভিন্ন লাভজনক কর্ম ইত্যাদি। যখনই দেখা যাবে কোনো ব্যক্তি দলীয় পরিচয় কাজে লাগিয়ে এ ধরনের সুবিধার বিষয়ে মনযোগী হয় এবং সংগঠনে বড় ধরনের আর্থিক অনুদান দিয়ে তা প্রকাশ করে তৃপ্তি পায়, তখন বুঝতে হবে উক্ত ব্যক্তির উদ্দেশ্যের মধ্যে সংমিশ্রণ আছে। তাকে সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে এবং সংগঠনের যে কোনো দায়িত্ব হতে দূরে রাখতে হবে। কথা বলার সুযোগ কম দিতে হবে। উদাহরণ টানতে চাইলে অসংখ্য অপ্রীতিকর ঘটনা আছে, যার উল্লেখ প্রাসঙ্গিক মনে করছি না।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, সংস্কার আর সংশোধন অব্যাহত রেখে তৎপরতা আরও বৃদ্ধি করলে, সফলতার দিকে এগিয়ে যাবে বলে আশা করা যায়।

ইসলামী ঐক্য জোটভুক্ত ও অন্যান্য সমমনা ইসলামী দলসমূহ

১৯৯০ সালে সাতটি ইসলামী দলের (খিলাফত মজলিশ, নেজামে ইসলাম, ফারাএজী জামাত, ইসলামী মোর্চা, উলামা কমিটি) সমন্বয়ে ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার প্রত্যয়ে ইসলামী ঐক্য জোট গঠিত হয়। প্রতিটি দল হতে পাঁচজন করে সদস্য নিয়ে একটি মজলিশ এ শুরা এবং একটি উপদেষ্টা কাউন্সিল গঠন করে তারা কার্য পরিচালনা করে।

বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের ক্ষেত্রে ইসলামী ঐক্য জোটভুক্ত দলসমূহ একটি বিশেষ ফ্যাক্টর হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। আর এ সকল ছোট দলসমূহ তখনই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়, যখন একই ছাতার নিচে অবস্থান নিয়ে আন্দোলন করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলো। জাতীয় রাজনীতিতে তাঁদের গুরুত্ব হ্রাস পায় অনৈক্য ও মতভেদের কারণে। এ দলসমূহের অতীত ইতিহাস ও কতিপয় অবস্থা এ ইঙ্গিত বহন করে যে, যদি এ দলসমূহ পার্থিব সকল স্বার্থের উর্ধ্বে থেকে একমাত্র আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে সুক্ষ্ম চিন্তা ও বুদ্ধির প্রয়োগের মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলন অব্যাহত রাখতে পারে, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে তাঁরা জাতীয় রাজনীতিতে গুরুত্বর্পূ স্থান দখল করে নিতে সক্ষম হবে। এর অন্যতম কারণ হলো কওমী মাদ্রাসাসমূহের সাথে ইসলামী ঐক্যজোটভুক্ত ও সমমনা দলসমূহের সংশ্লিষ্টতা। ইসলামী ঐক্যজোটভুক্ত ও সমমনা দলসমূহের প্রায় সকল নেতৃবৃন্দ কওমী মাদ্রাসার সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে কওমী মাদ্রাসাসমূহের উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে এ সকল মাদ্রাসাসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল জনশক্তি তথা ছাত্র-শিক্ষক সকলকে আন্দোলনে নামিয়ে দেয়া যেতে পারে। এ সকল মাদ্রাসার সকল ছাত্র-শিক্ষক এক সাথে ইসলামী হুকুমত কায়েমের জন্য তৎপর হলে বাংলাদেশের মুসলমানদেরকে ইসলামী হুকুমতের গুরুত্ব বুঝানো এবং এর পক্ষে জনমত তৈরি করা সহজ হবে। কারণ এ সকল কওমী মাদ্রাসা দেশের সাধারণ জীবন যাত্রার সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত। শিশু জন্মের পর তাদের নাম রাখা, আকিকা দেয়া, বিয়ে ইত্যাদি থেকে মৃত ব্যক্তির জানাজা, কবর দেয়া পর্যন্ত এবং মসজিদে সালাতের নেতৃত্ব দেয়া ও বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পরিপালনের মাধ্যমে তাঁরা সমাজের সকল স্তরের মানুষের আত্মার সাথে মিশে আছে। ফলে দেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের উপর তাঁদের কথার বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া এদেশের মুসলমানদের মধ্যে যে ইসলামী ঐতিহ্যপূর্ণ ভাবধারা লক্ষ্য করা যায়, তাতেও কওমী মাদ্রাসার আবদান শীর্ষে। মৃতপ্রায়

মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাস যেমন লাইফ সাপোর্টের মাধ্যমে সচল রাখা হয়, তেমনি উপনিবেশ আমলে বাংলার মুসলমানদের ঈমান, শিক্ষা, সংস্কৃতি এ সকল কওমী মাদ্রাসার মাধ্যমে সচল রাখা হয়েছিল। বৃটিশ শাসিত বাংলায় মুসলমানদের মাথার উপর হিন্দু জমিদারদেরকে প্রভুস্বরূপ বসিয়ে দেয়া হয়। তারা মুসলমানদের উপর বিভিন্নভাবে নির্যাতন চালিয়েছিল। মুসলমানদের গাছের প্রথম ফল, গাভীর উৎকৃষ্ট দুধ, বাগানের প্রথম তরকারী ইত্যাদি তাদেরকে নজরানা হিসেবে দিতে হতো। তাদের সামনে কথা বলার সময় হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকতে হতো। তাদের সাথে দেখা হলে দরিদ্র মুসলমানরা তাদেরকে ভয়ে প্রণাম করতে হতো। হিন্দুদের ভয়ে মুসলমানরা গরু জবাই করতে পারতো না। এভাবে হিন্দু জমিদারদের অন্যায় প্রভাবের কারণে বাংলার মুসলমানদের জীবনে অনেক হিন্দু সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটে। সে সময়ে শহীদ তিতুমীরের মতো অনেককে মুসলিম সংস্কৃতি পুনরুদ্ধারে জীবন দিতে হয়েছিল। ঐ সময়টাতে বর্তমান সময়ের মতো ইসলামী আন্দোলন করা কঠিন ছিল। তখন এ সকল কওমী মাদ্রাসাসমূহ মুসলমানদের ছেলেদেরকে মাদ্রাসায় শিক্ষা দান, মসজিদ মক্তব এর মাধ্যমে কুরআন শিক্ষাদান, ওয়াজ-মাহফিল, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং ইসলামী আইনগত মতামত (ফতুয়া) দানের মাধ্যমে সমাজে ইসলামের চর্চা অব্যাহত রেখে ছিল। কওমী মাদ্রাসাসমূহ যদি দ্বীনের এ খেদমত করতে না পারতো বাংলাদেশের মুসলমানদের ধর্মীয় অবস্থা হয়তো খুব একটা ভালো অবস্থায় থাকতো না। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, কওমী মাদ্রাসাসমূহের নিরলস খেদমতের কারণে মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতি শক্তিশালী অবস্থায় রয়েছে। আর মুসলমানদের মধ্যে ঐতিহ্যগতভাবে ধর্মীয় অনুভূতি বিদ্যমান থাকার কারণে এ দেশের মানুষকে ইসলামী আন্দোলন বুঝিয়ে ইসলামী আন্দোলনমুখী করা গেছে।

বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের বীজ আরব বনিক শ্রেণি ও শাহজালাল র. সহ অতীতের সেই আল্লাহ্‌র মুজাহিদদের দ্বারা রোপিত হয়েছিল এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সময়ে সেই বীজকে কওমী মাদ্রাসার খেদমতের দ্বারা আল্লাহ্ রক্ষা করেছেন, আজ সে বীজ পুনরায় বাগানে পরিণত হচ্ছে। অতএব বর্তমানে ইসলামী আন্দোলনের যে অগ্রগামী ধারা লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তাতে কওমী মাদ্রাসার ভূমিকা অনস্বীকার্য। এ সকল কওমী মাদ্রাসাসমূহ বৃটিশ আমলের প্রতিকূল পরিস্থিতিতে অসুস্থ দেহকে বাঁচিয়ে রাখতে লাইফ সাপোর্ট হিসেবে কাজ করেছে, বর্তমানে তাঁদেরকে সুস্থদেহের চঞ্চল প্রাণ হিসেবে কাজ করতে হবে। আজকে যদি তারা এ কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণে এগিয়ে আসে, তাহলে আন্দোলনের দাওয়াতের কাজ অল্প সময়ের মধ্যে পূর্ণতা লাভ করবে। আর তাই ইসলামী

ঐক্যজোটভুক্ত ও সমমনা দলসমূহের প্রথম কাজ হলো কওমী মাদ্রাসাসমূহকে ইসলামী আন্দোলনের কাজে পূর্ণমাত্রায় সক্রিয় করা। উল্লেখ্য যে, ইসলামী ভাবধারা জাগ্রত রাখার ক্ষেত্রে কওমী মাদ্রাসাসমূহের ভূমিকা অগ্রগণ্য হলেও ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তাঁদের অংশগ্রহণ খুব একটা প্রাচীন নয়। বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতির কারণে তাঁরা দীর্ঘ সময় প্রত্যক্ষ ইসলামী আন্দোলন থেকে দূরে থাকে। সেই থেকে অনেক আলেমদের মধ্যে এ ধারণা জন্ম নিয়েছে যে, ইসলামী হুকুমত কায়েমের আন্দোলন খুব একটা জরুরি বিষয় নয়। কেউ কেউ এ-ও মনে করেন যে, এটি নেহায়েত একটি পার্থিব উপকরণ বৈ কিছু নয়। এ কারণে তারা কেবল শিক্ষকতা, মিলাদ-মাহফিল এর মাধ্যমে যে দ্বীনের খেদমত করছেন, তাকে যথেষ্ট মনে করছেন। যদিও তাঁদের বর্তমান খেদমতও অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ, তাঁদের এ খেদমতের দ্বারা পূর্ণাঙ্গ দ্বীন প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। এ অবস্থায় ইসলামী ঐক্যজোট ও সমমনা দলসমূহ এ সকল মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে ইসলামী আন্দোলনের গুরুত্ব প্রচার করার মাধ্যমে তাঁদের মধ্যে দায়িত্বানুভূতি জাগ্রত করে, তাঁদের মাধ্যমে সমগ্র দেশব্যাপী একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে পারে।

বাংলাদেশে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠায় ইসলামী ঐক্যজোটকে আরও শক্তিশালী হওয়ার জন্য যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি মনে করছি তা হলো:

১. ইসলামী ঐক্যজোটের উদ্যোগে বাংলাদেশের কওমী মাদ্রাসাসমূহের যাবতীয় তথ্য সম্বলিত একটি পরিসংখ্যান রিপোর্ট তৈরি করে নিয়ে সকল মাদ্রাসার মধ্যে একটি যোগসূত্র স্থাপন করতে হবে। অত:পর বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য আলেমদেরকে এ সকল মাদ্রাসা প্রধানদেরকে নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বৈঠক করে তাঁদের মধ্যে ইসলামী আন্দোলন করার আবশ্যকতা জানিয়ে এ বিষয়ে তাঁদের মধ্যে যথার্থ দায়িত্বানুভূতি জাগ্রত করতে হবে। এ সকল বৈঠকসমূহের স্থান, সময় ও অবস্থা ভেদে নির্ধারিত হতে পারে। নেতৃবৃন্দকে প্রয়োজনে অসীম ধৈর্য্য সহকারে লম্বা সফরেও সময় ব্যয় করতে হতে পারে। যেহেতু মাদ্রাসার শিক্ষকগণ একমাত্র কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা দানের মাধ্যমে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করছেন, সেহেতু তাঁদেরকে ইসলামী হুকুমত কায়েমের জন্য কাজ করা ফরজ হওয়ার বিষয়টি আবশ্যকীয় কর্তব্য হওয়া সম্পর্কে অবহিত করা গেলে তাঁরা এ কাজকে নিজেদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করে নেবে বলে আশা করা যায়।

২. মাদ্রাসা প্রধানদেরকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করা গেলে, পরবর্তীতে তাঁদের মাধ্যমে মাদ্রাসার সাধারণ শিক্ষকদেরকে আন্দোলন সম্পর্কে অবহিতকরণ এবং তাঁদের

মধ্যেও অনুরূপ দায়িত্বানুভূতি জাগ্রত করা যেতে পারে। আর শিক্ষকতার সাথে জড়িত আলেমদেরকে এ সম্পর্কে সজাগ করা গেলে, তাঁদের মাধ্যমে এ দেশের সকল মাদ্রাসা শিক্ষিত আলেম ও মাদ্রাসা ছাত্ররা দাওয়াত পেয়ে যাবে। এ প্রক্রিয়ায় যদি সকল আলেমদেরকে ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে অবহিত করা যায়, তবে ইসলামী আন্দোলন প্রবল হওয়ার গতি অনেক বেশি বৃদ্ধি পাবে। কওমী মাদ্রাসার আলেমগণ বিভিন্নভাবে শহর ও গ্রাম-গঞ্জের মানুষের সাথে সম্পর্কিত। মসজিদে ইমাম হিসেবে সালাত পড়ানো থেকে শুরু করে মিলাদ-মাহফিল, বিয়ে-শাদী, মাসলা-মাসায়েল জানানো, জানাজাসহ বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সাথে তারা নিবিড় সম্পর্ক রক্ষা করে থাকেন। এ সকল আলেমগণের মধ্যে ইসলামী হুকুমত কায়েম করার বিষয়টি ফরজ হওয়া সর্ম্পকে দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি করা সম্ভব হলে, তাঁরা জুম্মার সালাতের খুতবায়, মিলাদ-মাহফিলে, বিয়ের অনুষ্ঠানে, যেখানে সাধারণের সাথে মেলা-মেশার সুযোগ হয়, মানুষের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিতে পারে। ফলে দেশের তৃণমূল পর্যায়ের সকল মানুষ দীর্ঘ সময় ধরে এই বিষয়টি আলেমদের কাছ থেকে শোনার ফলে তাঁদের মধ্যেও ইসলামী হুকুমত সম্পর্কে ধারণা স্বচ্ছ হবে এবং এর আবশ্যকতা জানার পর সালাত সিয়ামের মত এ ইবাদতটিও করতে থাকবে। ফলে আমাদের প্রাণাকাঙ্খিত ইসলামী হুকুমত এর বাস্তব রূপ দেখার সৌভাগ্য লাভ হতে পারে। তবে কওমী মাদ্রসার আলেমদেরকে এ কাজে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত করতে হলে নিম্নোক্ত বিষয়ে সর্বাগ্রে দৃষ্টি দিতে হবে:

১. প্রথমে কওমী মাদ্রাসাসমূহকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করতে হবে। এ সকল মাদ্রাসা সাধারণত: জনসাধারণের আর্থিক সাহায্যে পরিচালিত। আর এর সাহায্যকারীদের মধ্যে এমন প্রভাবশালী লোকদের অবদান বেশি যারা সমাজের ধর্মহীন রাজনীতির সাথে জড়িত। আলেম সমাজের পক্ষ হতে ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াত দিলে, তা প্রথমে আঘাত হানবে ঐ সকল সাহায্যদাতাদের স্বার্থের উপর। ফলে তারা সাহায্য বন্ধসহ বিভিন্ন ধরনের বিরোধিতায় লিপ্ত হতে পারে। তাদের বিরোধিতার মুখে টিকে থাকতে হলে এ মাদ্রাসাসমূহকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে হবে। এর জন্য কারিগরী প্রশিক্ষণমূলক প্রকল্পসহ বিভিন্ন বাণিজ্যিক উৎপাদনমূখী প্রকল্প বাস্তবায়ন করা গেলে মাদ্রাসার ছাত্ররা খন্ডকালীন কাজ করার মাধ্যমে নিজেদের খরচ নিজেরা নির্বাহ করার সুযোগ পাবে। এতে করে ছাত্রদের মধ্যে হক কথা বলার মতো যথার্থ ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠবে এবং কর্মজীবনে নিজেকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী

করার মতো যোগ্যতাও অর্জিত হবে। কওমী মাদ্রাসাসমূহকে যদি আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করা যায় এবং আলেমদেরকে সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তবে যারা কায়েমী স্বার্থে এ সকল মাদ্রসায় সাহায্য সহযোগিতা করে, আলেমদেরকে হাদিয়া দেয়ার মাধ্যমে সহযোগিতা করে এবং স্বার্থে ব্যঘাত ঘটলে রক্তচক্ষু প্রদর্শন করে, তাদের উপর থেকে নির্ভরশীলতা হ্রাস করা যাবে। মাদ্রাসাসমূহ আল্লাহর সাহায্য, ইসলাম প্রিয় মানুষের অনুদান, লিল্লাহ বর্ডিং-এর ছাত্রদের জন্য যাকাত তহবিল এবং তালেবে ইলমদের পরিশ্রমে ইনশাআল্লাহ ভালোভাবে পরিচালিত হবে। অতএব সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে ধীর গতিতে হলেও মাদ্রাসাসমূহকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলতে হবে।

২. ইসলামী আন্দোলন উপযোগী বিশাল সাহিত্য ভান্ডার গড়ে তুলতে হবে। মনে রাখতে হবে, কুরআন সকল যুগে মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের প্রতিটি বিষয়ের সমাধান দেয়ার মতো স্বয়ংসম্পূর্ণ আল্লাহর বাণী। কিন্তু এই কুরআন হতে সকল যুগের সকল বিষয়ের সমাধান পাওয়ার জন্য কুরআন বুঝার মতো যথেষ্ট জ্ঞান থাকতে হবে। আর এতো গভীর জ্ঞান সাধারণ মানুষের সকলের নেই। অপরদিকে সাধারণ মানুষকে আন্দোলনমুখী করার পর তাঁদের মধ্যে বাতিলের সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার মতো যোগ্যতা তৈরি এবং সমকালীন বাতিলের অসাড়তা মানুষের মাঝে তুলে ধরার মতো যোগ্যতা তৈরি করার জন্য তাঁদেরকে কুরআন ও হাদীসের জ্ঞানে জ্ঞানী করে গড়ে তুলতে হবে। কুরআনকে বোধগম্য করে তোলার জন্য এবং চলমান সমাজের সমস্যার সমাধান দেখানোর জন্য কুরআনের তাফসীর এবং ইসলামী সাহিত্যের বিকল্প নেই। সুতরাং, পূর্বতন ইসলামী সাহিত্যের প্রকাশ, নতুন সাহিত্য লিখন বা অনুবাদের মাধ্যমে আন্দোলনমুখী ইসলামী সাহিত্যের বিশাল ভান্ডার গড়ে তুলতে হবে। এদিক থেকে ইসলামী ঐক্যজোটভুক্ত দলসমূহ এখন পর্যন্ত অনেক পিছিয়ে আছে। অচিরেই এ অবস্থা কাটিয়ে উঠতে হবে। এর জন্য বিদ্যমান সাহিত্য ভান্ডারের প্রতি অহেতুক ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে পরিত্যাগ করার মানসিকতা পরিহার করে, তা থেকে কল্যাণ লাভের চেষ্টা করার বিষয়ে উদার হতে হবে। মাওলানা মওদুদী র. এ উপমহাদেশের উপযোগী ইসলামী সাহিত্য ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। কওমী মাদ্রাসার জনশক্তির মধ্যে মাওলানা মওদুদী র. সম্পর্কে ভুল ধারণা সৃষ্টি করা ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র বলে আমি বিবেচনা করি।

৩. ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাপকভাবে ঐক্যমত গড়ে তুলতে হবে। বিভেদ যেমন আলাদাভাবে প্রতিটি ইসলামী দলের ক্ষতি করে, তেমনি সামগ্রিকভাবে দেশের ইসলামী আন্দোলনকে দুর্বল করে দেয়। মনে রাখতে হবে, এ বিভেদ এর মূল উদ্যোক্তা হলো বিতাড়িত শয়তান। শয়তানই বিভিন্নভাবে মানুষের মনে বিভেদ সৃষ্টি করে ইসলামী আন্দোলনের গতি স্তব্ধ করে দিতে চায়। লক্ষ্য করা যায়, যদিও প্রতিটি ইসলামী দলের মূল লক্ষ্য ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা, তথাপিও এক দলের সাথে আর এক দলের বিরোধ রয়েছে। এমনকি একই দলের মধ্যেও নেতৃবৃন্দের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ের বিরোধ প্রকাশ্যে রূপ নিয়ে থাকে। এ বিরোধিতার কারণে মানুষ দ্বিধান্বিত হয়ে যায়, ফলে সে কোনো দলের সাথে সম্পৃক্ত হবে বা কার নেতৃত্ব মেনে নেবে, এ বিষয়ে সহজে সিদ্ধান্তে আসতে পারে না। তাছাড়া এক দল আরেক দলের বিরোধিতা করার কারণে বিরোধপূর্ণ উভয় দলের বিষয়ে মানুষের খারাপ ধারণা সৃষ্টি হয়। ফলে প্রতিটি দলই পিছিয়ে পরে। আর দলসমূহ যদি বিরোধ পরিহার করে মানুষকে শুধুমাত্র দ্বীন বুঝার জন্য ও খিলাফত প্রতিষ্ঠার দিকে আহ্বান করে, তবে দেশের প্রতিটি মুসলমান, যারা পরকালে নাজাত আশা করে, খিলাফত প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সক্রিয় হবে।

যদি ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা লক্ষ্য হয়, তবে আকারে ইঙ্গিতেও কোনো ইসলামী দলের প্রতি মানুষের খারাপ ধারণা সৃষ্টি হতে পারে, এ ধরনের কিছু প্রকাশ করা যাবে না। প্রচারণা হবে নিজের দলের প্রতি আর অন্যান্য ইসলামী দলের বিষয়ে সহনশীল থাকতে হবে, ঠিক যেমন আপনার দল আপনার নিজের পরিবার এবং অন্যান্য ইসলামী দল আপনার নিজ ভাইয়ের পরিবার। যখন অন্য ইসলামী দল সম্পর্কে কেউ জিজ্ঞাসিত হবে, তখন উত্তর এটুকুই হতে হবে যে, ঐটিও ইসলামী দলের অন্তর্ভুক্ত, আপনার বিবেচনায় ঐটি উত্তম হলে আপনি ঐ দলের সাথেও কাজ করতে পারেন। এ পদ্ধতিতে সকল দল কাজ করলে দল দুর্বল হওয়ার পরিবর্তে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে প্রতিটি ইসলামী দল অনেক শক্তিশালী হয়ে উঠবে। সুতরাং, প্রতিটি ইসলামী দল অপর দলকে সহযোগিতা করার এবং ঐক্যমতে কাজ করার মানসিকতা তৈরি করতে হবে।

৪. দেশ পরিচালনার উপযোগী পেশাদার লোকের নেতৃত্ব তৈরি করতে হবে। কেননা, জনসাধারণ বুঝতে চায় তাদেরকে দিয়ে দেশ চলবে কিনা।

৫. সকল ইসলামী দলকে এক সময় বৃহত্তর ঐক্য গড়ার লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। এমন একটা সময় আসবে, যখন ইসলামী প্রতিটি দল প্রসার লাভ করবে। তখন হয়তো এককভাবে প্রতিটি দলই ইচ্ছা করলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে

পারবে না। তবে সব কয়টি ইসলামী দল এক হয়ে গেলে বৃহত্তর শক্তিতে পরিণত হতে পারবে। তখন সকল মত পার্থক্যের বিষয়গুলোতে সমন্বয় করে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করলে সফলতা আসতে পারে। আর চূড়ান্ত পর্যায়ে ঐক্য সৃষ্টির জন্য পরিবেশ বজায় রাখতে এখন থেকে একে অপরের বিষয়ে সহনশীল ও সহযোগী হতে হবে।

বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের সংকট ও সম্ভাবনা

আগেও উল্লেখ করা হয়েছে, এ দেশে ইসলামী আন্দোলনের শুরু নতুন নয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে থেকে এ দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চলমান ছিল, স্বাধীনতা উত্তর এ দেশে ইসলামী আন্দোলন আরও গতি লাভ করে। কিন্তু সুদীর্ঘ সময় আন্দোলন অব্যাহত রাখার পরও এর উল্লেখযোগ্য সাফল্য দৃশ্যমান হচ্ছে না। এমনকি অদূর ভবিষ্যতেও সফলতার লক্ষণ পরিদৃষ্ট হচ্ছে না। অথচ আল্লাহ্ বলেছেন,

وَ لَا تَهِنُوْا وَ لَا تَحْزَنُوْا وَ اَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ١٣٩

আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দু:খ করো না। যদি তোমরা মুমিন হও, তবে তোমরাই জয়ী হবে। -আলে ইমরান, আয়াত-১৩৯

মুসলমানদের অব্যাহত ইসলামী আন্দোলন এবং আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি এ দুটির অভিসম্ভাবী ফল হলো ইসলামের বিজয়। অথচ ফলাফল মিলছে না। তাহলে সমস্যা কোথায়?

ইসলামী আন্দোলনের সফলতা চাইলে আমাদেরকে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে সার্বিক বিষয় পর্যালোচনা করে প্রথমেই এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করতে হবে, তারপর অবস্থানুপাতে ব্যবস্থা নিতে হবে। অন্যথায় কয়েক দশকেও হয়তো সফলতা চক্ষু শীতল করবে না।

অনুসন্ধানে লেখকের কাছে প্রতিভাত হয়েছে গভীর সংকটে আবর্তিত বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলন। নেতৃবৃন্দ ও ইসলাম প্রিয় মানুষগুলোর জন্য এখন সবথেকে জরুরি হলো এ সংকট চিহ্নিতকরণ ও নিরসনে মনোনিবেশ করা। সংকটসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু হলো;

১. বাংলাদেশে ইসলামী অন্দোলনের একটি কঠিন সংকট হলো, ইসলামের প্রতিনিধিত্বকারী, আন্দোলনকারী বা ইসলাম প্রিয় মানুষগুলোর মধ্যে পারস্পরিক আস্থা, শ্রদ্ধা, ঐক্যের মনোভাবের চরম অভাব, আর অতি আত্মবিশ্বাসের কারণে একমাত্র নিজেদেরকে পরিশুদ্ধ আর শ্রেষ্ঠ মনে করার প্রবণতা।

   বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী এবং এর ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র শিবির সব থেকে অগ্রসর দল। এ দলটি

পরিকল্পিত কর্মসূচীর মাধ্যমে প্রচলিত ধারার বা সাধারণ শিক্ষিত মানুষের মধ্যে ব্যাপক কাজ করে একটি শক্ত অবস্থান সৃষ্টি কারতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশসহ বহিঃবিশ্বে বাংলাদেশের ইসলামিক দল বলতে অনেকটা এ দলটিকে বুঝানো হয়।

অপরদিকে সাধারণ মুসলমানদের কাছে ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করছেন এ দেশের কওমী মাদ্রাসায় শিক্ষিত ওলামাগণ। বাংলাদেশের ৯০% এর অধিক মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও ইসলাম সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা আছে এ ধরনের মুসলমানের সংখ্যা বোধ করি ৫-১০% এর বেশি হবে না। এ সকল সাধারণ মুসলমান দৈনন্দিন জীবনে ধর্মীয় সকল বিষয়ে কওমী মাদ্রাসায় শিক্ষিত মসজিদের ঈমাম-মুয়াজ্জিন, মক্তব-মাদ্রাসার ওস্তাদদের উপর একান্ত নির্ভরশীল। সাধারণ মুসলমানরা তাঁদের উপর আস্থাশীল এবং তাঁদের বক্তব্যকে ইসলামের বক্তব্য হিসেবে গ্রহণ করতে অভ্যস্ত।

আর বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী এবং উক্ত কওমী আলেমদের মধ্যে সুদীর্ঘকাল হতে চলে আসছে এক বিরাট ভুল বুঝাবুঝি। কওমী মাদ্রাসায় শিক্ষিত অধিকাংশ আলেম মনে করেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মওদূদী র. ইসলামের অপব্যাখ্যা করেছেন, সুতরাং, তাদের আকিদায় সমস্যা আছে এবং তাদের মাধ্যমে প্রকৃত ইসলামী হুকুমত আসা সম্ভব নয়। ফলে তাঁরা জামায়তে ইসলামীকে নূন্যতম সহযোগিতা করতে মানসিকভাবে প্রস্তুত নন। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর বিষয়ে কওমী আলেমদের এ অবস্থান সংগঠনটির পক্ষে ব্যাপক জনসমর্থন তৈরির ক্ষেত্রে একটি বড় অন্তরায়।

অপরদিকে বাংলাদেশের সাধারণ মুসলমানগণ কওমী আলেমদের প্রতি ধর্মীয় ইবাদত-মোয়ামেলাতের মাসালা-মাসায়েল এর বিষয়ে আস্থা স্থাপন করলেও রাজনৈতিক মেন্ডেট দেয়া সমীচীন মনে করেন না। দেশের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেতৃবৃন্দ গ্রহণ করলেও তার বাস্তবায়নের দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে রাষ্ট্রের আমলা বা কর্মচারীদের উপর। দেশের আমলা বা কর্মচারীগণ হলেন সাধারণ ও বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত। তাঁদের অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও প্রকৌশলগত শিক্ষা ও দক্ষতা রয়েছে। অপরদিকে কওমী আলেমদের ইসলামের বিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপত্তি থাকলেও অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও প্রকৌশলগত এ সকল বৈসয়িক বিষয়ে পারদর্শিতা না থাকায় তারা রাষ্ট্রের মতো একটি স্পর্শকাতর বিষয় চালাতে সক্ষম হবেন, এ ভরসা জনসাধারণ করতে পারছেন না। এ কারণে সর্বজন শ্রদ্ধেয় হাফেজ্জী হুজুর, সাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক

এর মতো বিজ্ঞজন ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োগ করা সত্বেও কোনো উল্লেখযোগ্য অবস্থান তৈরি করতে পারেননি। বর্তমানেও কওমী আলেমদের বেশ কয়টি ইসলামী সংগঠন রয়েছে, যেগুলো রাজনৈতিক মাঠে তেমন কোনো সাড়া ফেলতে সক্ষম হয়নি।
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী এবং উক্ত কওমী আলেমদের মধ্যেকার মতপার্থক্যের কারণে সৃষ্ট সংকট অনেক বড়। অথচ যে বিষয়টি নিয়ে মতপার্থক্য তা অতিনগণ্য।

কওমী আলেমদের দাবি অনুসারে মাওলানা মওদূদীর লেখনীতে কোনো ভুল থাকলে তা সংশোধনের উদ্যোগ নিলে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর বড় ধরনের কোনো ক্ষতি হবে না। আবার লেখনিতে যদি ভুল থাকে আর তা সংশোধন করা হয়, তবে কওমী আলেমদেরও কোনো বিরোধ রাখা উচিত নয়। তবে এ পুস্তকের লেখক, মাওলানা মওদূদীর অনুবাদকৃত অধিকাংশ লেখা পড়েছে এবং উল্লেখযোগ্য কোনো ভুল চোখে পড়েনি। বরং মাওলানা মওদূদী চমৎকার যুক্তি ও বাস্তবতার নিরিখে আল্লাহ্‌র দ্বীনকে আরও বোধগম্য করে উপস্থাপন করেছেন বলে মনে হয়।

মানসিকতার কিছু পরিবর্তন করে উভয়ের পক্ষ হতে এ সংকট নিরসন আশু প্রয়োজন বলে লেখক মনে করে। এ বিষয়ে ঐক্য তৈরি করার ক্ষেত্রে কুরআনের নিচের নির্দেশনাদ্বয় পরিপালিত হলে সকল পক্ষের মধ্যে নমনীয়তা আসতে পারে;

اِنَّ هٰذِهٖۤ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۖ وَّ اَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ ٩٢ ۔ وَ تَقَطَّعُوْۤا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ؕ كُلٌّ اِلَيْنَا رٰجِعُوْنَ ٩٣

তারা সকলেই তোমাদের ধর্মের; একই ধর্মে তো বিশ্বাসী সবাই এবং আমিই তোমাদের পালনকর্তা, অতএব আমার বন্দেগী করো এবং মানুষ তাদের কার্যকলাপ দ্বারা পারস্পরিক বিষয়ে ভেদ সৃষ্টি করেছে। প্রত্যেকেই আমার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। -সূরা আল আম্বিয়া- ৯২-৯৩

وَ اعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّ لَا تَفَرَّقُوْا ۪

আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আলে ইমরান: ১০৩

সত্যিকার অর্থে যারা ঈমানদার তাঁদের মূল লক্ষ্য হলো–আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে পরকালীন মুক্তি অর্জন। যেহেতু আল্লাহ্‌ পছন্দ করেন তাঁর বান্দাহরা ঐক্যবদ্ধ থাকুক, সম্মিলিতভাবে দ্বীনকে আকড়ে ধরুক এবং আল্লাহ্‌র দ্বীনকে বিজয়ী করুক, সেক্ষেত্রে কোনো মুমিন ব্যক্তির জন্য এ সুযোগ নেই যে, তিনি নিজের অহংবোধকে প্রাধান্য দিয়ে মুসলিম উম্মাহ্‌কে বিভক্ত করবে, নিজে বিচ্ছিন্ন থাকবে। তাদের জন্য সেই ঘটনায় বিরাট শিক্ষা আছে, যখন কিছু ইয়াহুদ রাসূল সা. এর নিকট থেকে জানলো বার্তাবাহক জিবরীল আ. আর তারা ইসলামকে সত্য দ্বীন হিসেবে স্বীকার করার পরও জিবরীল আ. এর সাথে শত্রুতাবসত ইসলাম গ্রহণ হতে বিরত থাকলো এবং শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র শত্রু বলে পরিগনিত হয়েছিল।

২. ইসলামী আন্দোলনের আরও একটি সংকট হলো, ইসলামী শক্তির আর্থিক দৈন্যতা। বিষয়টি শুনতে খারাপ শোনালেও এটাই বাস্তবতা। রাসূল সা. এর সময়েও প্রথমদিকে মুসলমানদের আর্থিক দৈন্যতা ছিলো। তখনও আল্লাহ্‌র রাসূল সা. সহ তাঁর পরিবার পরিজন এবং সাহাবাগণ বহু দিন বহু রাত না খেয়ে থেকেছেন। ইসলামের জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন। তবে তখন তাঁদের তাকওয়ার মানগত কারণে দ্বীনি দায়িত্ব পালনের গুরুত্ব ছিল সে কষ্টের তুলনায় অনেক বেশি। ফলে হাজারো কষ্ট তাঁদেরকে দ্বীনি দায়িত্ব পালনের বিষয়ে সামন্যতম অমনোযোগী করতে পারেনি। কিন্তু বর্তমানে তাকওয়ার সে মান না থাকায় দ্বীনি দায়িত্ব পালনে সে রকম ত্যাগ স্বীকার অধিকাংশের পক্ষে সম্ভব নয়। ফলে নূন্যতম আর্থিক স্বচ্ছলতা বজায় রাখার জন্য হলেও দ্বীনি দায়িত্বের বিষয়ে আপোস করতে হচ্ছে আর পরিস্থিতির অজুহাতে শান্তনা নিচ্ছেন। বর্তমানে দ্বীনি প্রতিষ্ঠানসমূহ সাধারণ মুসলমানদের আর্থিক সাহায্য সহযোগিতা এবং প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে। এ সকল সাধারণ মুসলমানদের অনেকেই আবার প্রচলিত রাজনীতির সাথে জড়িত। তাছাড়া অধিকাংশ মসজিদের মোতওয়াল্লি বা কমিটির সভাপতি-সেক্রেটারি এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ, যারাও বিভিন্নভাবে প্রচলিত রাজনীতির সাথে জড়িত। এমতাবস্থায় মাদ্রাসাগুলোর সবকয়টিতে প্রচলিত রাজনীতির বিপক্ষে কথা বলা শুরু করলে, যিনি কথা বলবেন, তাকে মাদ্রাসা হতে চাকুরিচ্যুত করবে এবং যে সকল ইমাম তাঁদের খুতবায় প্রচলিত রাজনীতির বিপক্ষে কথা বলবেন, তাঁদেরকে বিভিন্ন অপবাদ মাথায় নিয়ে ঈমামের পদ হতে বিতাড়িত হওয়ার ঝুঁকি বহন করতে হবে। এ সকল ঝুঁকি হতে বেঁচে থাকার স্বার্থে

তাঁদেরকে নিজেদের দ্বীনি দায়িত্ব, মসজিদে নামাজ পড়ানো, মাদ্রাসায় ছাত্র পড়ানো, ইসলামী ইতিহাস ঐতিহ্যের ওয়াজ নসিহত, নামাজ, রোজা, হজ্জ যাকাতের মাসয়ালা মাসায়েল বলার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হয়। সামাজে স্রোতের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠার বিষয়ে ন্যয়সঙ্গত কথাটি বলা সম্ভব হয় না। বিষয়টি এমন নয় যে, দেশের আলেমবর্গ রাজনৈতিক বিষয়ে ইসলামের দাবি বা দিক নির্দেশা অবহিত নয়।

এ সকল মাদ্রাসায় কোরানের তাফসির পড়ানো হয়। সিহাহ সিত্তার হাদীস গ্রন্থগুলো পড়ানো হয়। একজন আলেম কুরআনের তাফসীর এবং সিহাহ সিত্তার হাদীস গ্রন্থগুলো পড়ার পর ইসলামিক রাজনৈতিক দর্শন, দাওয়াতে দ্বীনের গুরুত্ব, সেক্যুলার রাজনীতিতে জড়িত থাকার পরিনাম জানেন না, এ ধারণা করা যায় না। বরং আজ সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে তাঁদেরকে দায়িত্বের সীমা কমিয়ে নিতে হয়েছে। অবশ্য মাঝে মধ্যে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। এক্ষেত্রে অধুনিককালে আল্লামা মুহাম্মদুল্লাহ্ হাফেজ্জী হুজুর র., শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক র. এবং খতীব মাওলানা উবাইদুল হক র. এর কথা স্মরণযোগ্য। আমার মনে হয়, যতদিন পর্যন্ত এ সকল দ্বীনি প্রতিষ্ঠান এবং আলেম সমাজ এ দেশের প্রভাবশালী সমাজপতিদের উপর থেকে নির্ভরতা কমাতে না পারবেন, অথবা দ্বীনি কারণে নিগৃহীত হওয়ার কষ্ট মেনে নেয়ার মানসিকতা ধারণ করতে না পারবেন, ততদিন সংকট থেকেই যাবে।

৩. ইসলামী আন্দোলনের অপর সংকট হলো ইসলামী আলেম সমাজের যুগোপযোগী জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, কলা-কৌশল, রাষ্ট্র-প্রশাসন সম্পর্কে ধারণা ও দক্ষতার স্বল্পতা। ষড়যন্ত্রমূলকভাবে তাঁদেরকে দূরে রাখা হোক বা নিজেরা দূরে থাকুক, সত্যটা হলো তাঁরা একটি রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার উপযোগী জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে পারেননি। ফলে জনসাধারণ তাঁদেরকে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করা সত্ত্বেও রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব দেয়ার বিষয়ে ভরসা করতে পারছেন না। এ বিষয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী অনেকটা এগিয়ে থাকলেও কথিত মওদূদীবাদের ধুয়া তুলে আলেম সমাজকে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী হতেও দূরে রাখা হয়েছে। যতদিন বাংলাদেশের আলেম সমাজ যুগোপযোগী জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি-কলা-কৌশল, রাষ্ট্র-প্রশাসন সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা ও দক্ষতা অর্জন করতে না পারবেন বা ইসলামী আন্দোলনকারীদের যারা এ গুণটি অর্জন করতে

পেরেছেন তাঁদের সাথে একাকার হয়ে কাজ করতে প্রস্তুত না হবেন, ততদিন এ সংকট হয়তো থেকে যাবে।

৪. সামাজিক অবক্ষয় ইসলামী আন্দোলনের জন্য একটি বড় ধরনের প্রতিবন্ধক। বর্তমানে বিশেষ করে একবিংশ শতাব্দির শুরু থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মানুষের নৈতিক মানের চরম অবনতি ঘটেছে এবং তা অব্যাহত আছে। মানুষ ব্যাপক আকারে আর্থিক দুর্নীতি, নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনা, পারস্পরিক প্রতিহিংস, লোভ ও অধিকার হরণ, অন্যায় প্রভাব প্রতিপত্তির প্রতিষ্ঠা, দায়িত্ব জ্ঞানের অবনতি, নির্মমতা, দস্যুতা, ঠকবাজী ও প্রতারণার মতো অভ্যাসে জড়িয়ে গিয়ে মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। এ ধরনের একটি অনৈতিক পরিবেশে ইসলামের প্রচার ও প্রসার অনেকটাই কঠিন। কারণ বিবেক যদি ভালোভাবে কাজ করে, মানুষ সত্যকে সহজে গ্রহণ করে নিতে পারে। মানুষের মধ্যে যখন এ সকল বদঅভ্যাস বাসা বাধে, তাদের বিবেকের মৃত্যু ঘটে এবং তারা সত্যকে সহজে উপলব্ধি করতে পারে না। যার কারণে যে সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড হতে অথবা যে দলের সাথে থেকে তাদের মনের এ সকল আকাঙ্খা পুরণ হবে, তারা সে দিকে ধাবিত হবে। স্বার্থের বিপরীতে খুব কম সংখ্যক মানুষ সত্যকে অবলম্বন করবে। আমাদের সমাজের এ ধরনের একটি চিত্র সত্যিই ইসলামী আন্দোলনের জন্য একটি বড় ধরনের সংকট।

৫. বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের আরও একটি সংকট হলো খিলাফতের উপযুক্ত নেতৃত্বের গুণাবলীসম্পন্ন মানুষের অভাব। যারা ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাঁদেরকে নৈতিকতার দিক থেকে প্রচলিত রাজনৈতিক দলের নেতাদের সাথে তুলনা করলে ইসলামী আন্দোলনের নেতারা নিঃসন্দেহে উত্তম হবেন। কিন্তু এ তুলনামূলক ভালো হওয়া বা শ্রেষ্ঠত্ব খিলাফতের দায়িত্ব নেয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। একটি বিষয় মনে রাখতে হবে, খলিফা হলেন স্বয়ং আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি এবং আল্লাহ্‌র প্রত্যক্ষ রহমত ছাড়া খিলাফত আসা সম্ভব নয়। তবে আল্লাহ্‌র রহমত পাওয়ার জন্য নিজেদেরকে উপযুক্ত করে নিতে হবে। আল্লাহ্‌র ঘোষণা হলো :

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ١۪ وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا١ؕ يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْـًٔا١ؕ وَ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ٥٥.

তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাঁদের ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাঁদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসনকর্তৃত্ব দান করবেন। যেমন তিনি শাসনকর্তৃত্ব দান করেছেন তাঁদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাঁদের ধর্মকে, যা তিনি তাঁদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাঁদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাঁদেরকে শান্তি দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। এরপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে, তারাই অবাধ্য। –সূরা আন নূর-৫৫

এখানে আল্লাহ্র ঘোষণা হলো দুটি শর্ত পূরণ করা হলে আল্লাহ্ পৃথিবীতে শাসনকর্তৃত্ব দান করবেন। তার একটি হলো আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস আর দ্বিতীয়টি হলো সৎকর্ম সম্পাদন।

দ্বিতীয়ত: যখন ইসলামী আন্দোলন এবং খলিফার ধারণা উপস্থাপন করে জন সমর্থন চাওয়া হয়, তখন জনসাধারণ তাঁদের মানসপটে উক্ত নেতার এমন একটি চিত্র দেখতে চান, যেমনটি পুস্তকে লিখা রয়েছে খিলাফতে রাশেদার যুগের চার খলিফা সম্পর্কে। এর কিছু ব্যত্যয় ঘটলেই জনসাধারণ ব্যাপক সমালোচনার ঝড় তোলেন এবং আস্থা স্থাপন করতে প্রস্তুত হন না। দেশের অধিকাংশ মানুষ প্রকৃতার্থে শিক্ষার আলো হতে বঞ্চিত হওয়ায় তারা বাস্তব অবস্থা অনুধাবন করার চেষ্টা করেন না। তারা তুলনামূলক ভালোটি গ্রহণ করার পরিবর্তে নৈতিকতার দিক থেকে ইসলামী আন্দোলনের নেতাদের বৈশিষ্ট্য ভালো হওয়া সত্ত্বেও কিছু ত্রুটি থাকার অজুহাতে স্বয়ং সেক্যুলার রাজনৈতিক দলের আরও বেশি অনৈতিক নেতাদেরকে সমর্থন দিয়ে বসেন। কারণ হিসেবে বলতে চান তাদেরকে দিয়ে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে না। ফলে জাগতিক নিয়মেও আন্দোলনকারীরা প্রতিষ্ঠিত হতে পারছেন না।

পরিতাপের সাথে বলতে হয়, আমাদের দেশের ইসলামী আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের অধিকাংশ খিলাফতের দায়িত্ব নেয়ার মতো নৈতিকতার কাঙ্খিত মানে উন্নীত হতে পারেননি। এটা আমার পক্ষ থেকে ঢালাওভাবে অভিযোগ উত্থাপন করা নয়। বরং নিরুপায় হয়ে দু:খ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সংশোধানের লক্ষ্যে একটি বাস্তবাতার উল্লেখ। নেতৃবৃন্দের অনেকে যদি সত্যিকার অর্থে আত্মসমালোচনা করেন, তবে দেখতে পাবেন তাদের অনেকে কতোগুলো কঠিন সমস্যায় আক্রান্ত। যেমন-

- নেতাদের অনেকে নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধির বিষয়ে একটি সুক্ষ্ম আকর্ষণ অনুভব করেন। বৈধ পন্থায় সম্পদ অর্জনে ইসলামী শরীয়ায় নিষেধ নাই, তা সত্য।

তবে একজন নেতা যখন দ্বীন আর দুনিয়া দুটিকে একসাথে লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেন, তখন আসলে দ্বীন কায়েম বাধাগ্রস্ত হয়। তাছাড়া সকল সময় যে সম্পদ অর্জনে পরিপূর্ণ শরীয়া অনুসরণ করেন, তাও অনেক ক্ষেত্রে হয় না। ইতিহাস বলে যাদের দ্বারা দুনিয়াতে দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাদের সম্পদশালী লোকগুলো দ্বীনের প্রয়োজনে অর্থ ব্যয় করে দরিদ্র হয়ে গিয়েছিলেন। আর আজকের নেতাদের দিকে তাকালে দেখা যাবে তারা নেতৃত্বের পরিচয় কাজে লাগিয়ে নিজেদের দারিদ্রতা ঘুচিয়ে স্বচ্ছল বা ধনীতে পরিণত হয়েছেন, বাড়ি-গাড়ী-ফ্ল্যাটের মালিক হয়েছেন। এক্ষেত্রে পরিস্থিতির অযুহাতে কিছু কিছু ঘুষ দেয়া এবং তদবির করার নজির যে একেবারে নেই তাও নয়। ফলে তারা ক্ষমতায় গেলে এ অভ্যাস আরও প্রবল হতে পারে। আর তখন ইসলামের প্রকৃত কল্যাণ মানুষ প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পাবে না। এক্ষেত্রে অনেকগুলো বাস্তব উদাহরণ উল্লেখ করা যায়। নাম উল্লেক না করলেও তাদেরকে চিহ্নিত কারতে কারো কারো অসুবিধা হয় না। তাই ব্যক্তিগত আক্রমন করা হতে বিরত থাকার স্বার্থে উদাহরণ দেয়া হতে বিরত থাকা সমীচীন।

- ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে মুসলমানরা পারস্পপরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে নিজের উপর অন্যকে আগ্রাধিকার দিয়েছে। বর্তমানে দলীয় কর্মসূচী হিসেবে এ জাতীয় কিছু কাজ করা হলেও ব্যক্তিগতভাবে এ ধরনের সহযোগিতা করা, অন্যের কল্যাণে নিজে বড় ধরনের ত্যাগ স্বীকার করার অভ্যাস নেতাদের মধ্যে খুব একটা লক্ষ্য করা যায় না। স্বাভাবিক কারণে সমাজ ও জনতা তাদেরকে কল্যাণকামী হিতৈষী বন্ধু ভাবার কোনো কারণ থাকে না।
- নেতৃবৃন্দের মধ্যে আরও একটি ত্রুটি দেখা যায় তা হলো, হিকমতের নামে ইসলামী শরীয়া অনুমোদন করে না, এ জাতীয় কাজ করা। তাছাড়া আনুগত্যের ধারণা প্রচার করে অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের মতামত চাপিয়ে দেয়া, নেতৃত্বের স্বাদ অনুভব করা এবং নিজেকে প্রকাশ করে আত্মতৃপ্তি লাভ করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এটি মারাত্মক একটি ত্রুটি।
- সমালোচনা এবং সংশোধন মূলক পরামর্শ অনুধাবনের পরিবর্তে নিজের মতের পক্ষে যুক্তি খোঁজা এবং উপস্থাপন করা।

৬. মুসলিম সামাজ ও সাংস্কৃতিক প্রচলনগুলোর ক্রমাবনতি ইসলামী আন্দোলনের প্রসারের ক্ষেত্রে আরো একটি বড় সংকট হিসেবে দেখা দিয়েছে। একটা সময় আমরা অতিক্রম করেছি যখন সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ কোনো না

কোনোভাবে ইসলামী ঐতিহ্যপূর্ণ ঘটনাবলীর সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেতো। মক্তবের ইসলামী শিক্ষা এবং পারিবারিক আচরণগত শিক্ষার মধ্যে শিশুরা বড় হতো, যার কারণে শৈশব থেকে ন্যায় অন্যায়, রুচিবোধ, লজ্জাবোধ, শালিনতা, পরকালীন বিশ্বাস ও ভয় ইত্যাদি বিষয়ে মানুষের মধ্যে একটা বিবেকবোধ কাজ করতো। মানুষের মধ্যে ভালো-খারাপ, সত্য-মিথ্যার বিষয়ে বিবেচনা শক্তি কাজ করতো। ফলে তাদের পক্ষে সহজে ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াত গ্রহণ করা সম্ভব ছিল। বর্তমানে প্রযুক্তির উন্নতির ফলে ভিনদেশি সংস্কৃতির সহজ লভ্যতা, প্রাতকালীন স্কুল সংস্কৃতির কারণে মক্তবসমূহের গুরুত্ব কমে যাওয়া, ভিনদেশী ষড়যন্ত্রের অংশিদার হয়ে ক্ষমতাশীনদের কতৃক স্কুল সিলেবাসের মধ্যে শালিনতা বিনষ্টকারী উপকরণের অন্তর্ভুক্তি, পরিবারের লোকজনের অযাচিত ব্যস্ততার কারণে শিশুদের বিষয়ে অমনোযোগিতা ইত্যাদি কারণে কৈশোর থেকে মানুষগুলো বিপথগামী হয়ে যাচ্ছে। ফলে ইসলামকে ধারণ করার বিষয়ে তাদের মধ্যে এক ধরনের অনিহা ও তাচ্ছিল্যভাব তৈরি হয়েছে। মানুষ নিজেকে সুন্দর চরিত্র ও উন্নত মানবিকতায় তৈরি করা অপেক্ষা বিত্ত-বৈভব, প্রাচুর্যের অধিকারী হওয়াকে অধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। এটা একটা মারাত্মক সামাজিক ব্যধি হিসেবে ছড়িয়ে পরেছে। আর এই সামাজিক অবক্ষয় ইসলামী আন্দোলনের অগ্রগতিকে সীমিত করে দিচ্ছে। ইসলামী আন্দোলনের সফলতা দেখতে চাইলে আমাদেরকে শিশু-কিশোরদের জন্য শৈশব থেকে উন্নত চরিত্র ও শক্তিশালী নৈতিক মূল্যবোধ নিয়ে বেড়ে উঠার পরিবেশ তৈরি করতে হবে।

ইসলামী আন্দোলনের বহুবিদ সংকটের মধ্যে উপরোক্ত বিষয়গুলো সবথেকে ভয়াবহ বলে আমার মনে হয়। সত্যিকার অর্থে ইসলামের প্রতি ভালোবাসা থাকলে, দেশে আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার আকাঙ্খা থাকলে সর্বাগ্রে এ সকল সংকট নিরসনে কাজ করতে হবে। এ সংকট নিরসন না হওয়া পর্যন্ত আমরা আল্লাহ্‌র জমিনে আল্লাহ্‌র কানুনের শীতলতা লাভের আশা করতে পারি না।

তবে আশার আলো হলো শত সংকটের মাঝেও বিভিন্ন কারণে সম্ভাবনাও দেখা যায়। মুসলমানদের যারা ইসলামী আন্দোলন করছেন, তাঁরা সকলে ইসলাম প্রতিষ্ঠা চায়, যদিও চায় তা নিজের বা নিজেদের নেতৃত্বে হোক। যখন তাঁরা কঠিন সমস্যায় পড়েছেন, তখন ঐক্যবদ্ধও হয়েছেন। এ যাবৎ বাংলাদেশের ইসলামী

আন্দোলনকারী নেতাগণ একাধিকবার কিছু ইস্যুতে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন, যা নির্দেশ করে ঐক্য একেবারে অসম্ভব নয়। তবে সমস্যা থাকতে পারে কে কার নেতৃত্ব মেনে নেবেন? এ বিষয়েও একটি সূত্র তৈরি করা যেতে পারে। বাইতুল্লাহ্‌র পাথর স্থাপনের বিষয়ে নবী সা. এর ফরমুলা এখানে বিবেচনা করা যেতে পারে। আর বর্তমানে আলেম সমাজ প্রযুক্তির গুরুত্ব অনুভব করতে পারছেন বলে মনে হচ্ছে। তাছাড়া ইসলাম বিরোধী শক্তির মাত্রাহীন নির্যাতনও এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখছে বলে মনে হচ্ছে। সবকিছুর পরও সংকট নিরসন হবে, এ আকাশ হতে আধারকারী মেঘ কেটে যাবে বলে আমরা আশা করছি। তবে তার জন্য তওবা ও সংশোধনের কাজ অতি তাড়াতাড়ি শুরু করতে হবে।

সেক্যুলার দলের সাথে কোয়ালিশন করে সরকার গঠন

স্বাধীনতা উত্তর সময়ে বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যদিও বলা হতো ধর্মনিরপেক্ষ, রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তগুলো দেখে দেশের মানুষ ঐ ব্যবস্থাকে মূলত ইসলাম বিপক্ষ ব্যবস্থা হিসেবে মনে করতে থাকে। মূলত: ১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজিত হওয়ায় এ দেশের মানুষগুলোর সিংহভাগ হলো মুসলমান। তাদের কৃষ্টি, কালচার, বিশ্বাস ও নি:শ্বাসে কেবল ছিল ইসলামের প্রেরণা। ফলে দেশের প্রতিটি পরতে পরতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল ইসলামী ঐতিহ্যের প্রতিকগুলো। নিজেদেরকে ধর্মনিরেপেক্ষ ও এ রাষ্ট্রকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রমাণে একটু অতিমাত্রায় তৎপর হয়ে পড়েন স্বাধীনতাত্তোর জাতীয় নেতৃবৃন্দ। তারা ইসলামের চিহ্নগুলো একে একে মুছে ফেলতে থাকে। রাষ্ট্রীয় শক্তির প্রতিকূলে নিরীহ মুসলিম জনসাধারণ তাদের এ তৎপরতা মুখ বুঝে সহ্য করলেও এক অস্ফুট ক্রন্দনে হৃদয় ভারী হয়ে উঠে । তাই অত্যন্ত নৃশংস ও বিভৎস হওয়া সত্ত্বেও ১৯৭৫ সালে তাদের তিরোধানে এ দেশের মানুষ কোনো প্রতিবাদ করেনি। বরং অনেক স্বস্তি পেয়েছিল এবং শুকরিয়া জ্ঞাপন করেছিল। কিন্তু এ দেশের মানুষ অনেকটা আবেগতাড়িত ও কোমল হৃদয়। যখনই তাদের উত্তরসূরীরা ক্ষমার হাত প্রসারিত করার জন্য দেশের মানুষের কাছে আবেদন জানালো, দেশের মানুষ তাদেরকে ক্ষমা করলো এবং ৯০ দশকের শেষার্ধে ক্ষমতায় বসিয়ে দিল। অবশ্য একই দশকের প্রথমার্ধের বিদায়ী সরকারের ব্যর্থতা ও অব্যবস্থাপনাও মানুষকে এ সমর্থন দানের বিষয়ে উৎসাহিত করেছিল। সে যাইহোক, ক্ষমতা লাভের পর তাদের সহজাত স্বভাবের পুন:প্রকাশ ঘটে। তারা পূনরায় তাদের পূর্বসূরীদের করুন পরিণতির বিষয়টি ভুলে গিয়ে পূর্বসূরীদের নীতি অনুসরণ ও বাস্তবায়ন শুরু করে। পূর্ববর্তী সময়ে ইসলামী ভাবধারায় গড়ে উঠা এদেশের সকল স্থান থেকে আল্লাহ্ ও ইসলামের নাম মুছে দেয়ার জন্য কাজ করেছিল। পুনরায় ক্ষমতা গ্রহণের পর ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাকে মুছে ফেলার জন্য ইসলামী শিক্ষা খাতে সরকারি অনুদান বন্ধ করা, শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক সাহেবের মতো একজন বয়োবৃদ্ধ মানুষকে কারা নির্যাতন, বোমা হামলার মিথ্যা অভিযোগে আলেমদেরকে হয়রানি করা, দেশের সর্ব্বোচ্চ মসজিদ বায়তুল মুকাররমের খতিব সাহেবের সাথে ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ, জনৈক মাওলানাকে প্যান্ট-শার্ট পরিয়ে হাতে পিস্তল দিয়ে ছবি তুলে তার মান-ইজ্জত বিনষ্ট করা, দাড়ি-টুপিওয়ালাদের প্রতি নির্যাতন, সশস্ত্র জঙ্গী ট্রেনিং দেয়ার মিথ্যা অভিযোগে কওমী মাদ্রাসাসমূহকে অভিযুক্ত করাসহ লাখো

ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তারা মুসলমানদের জীবনকে বিষময় করে তোলে। তখন এমন আশংকা দেখা দেয় যে, তারা পুনরায় ক্ষমতার মসনদে আরোহন করতে সক্ষম হলে ইসলামের শিক্ষাকে নির্বাপিত করার প্রয়াস পাবে। দেশের ইসলামী আন্দোলনের গতি রুদ্ধ হবে। অনিশ্চিত হবে মুসলমানদের ইসলামী জীবন।

স্বাভাবিক কারণে ঐ দলটিকে রাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে নামিয়ে আনা এ দেশের মুসলমানদের জন্য কর্তব্য বলে পরিগণিত হয়। আর এ লক্ষ্যে তৈরি হয় চার দলীয় ঐক্যজোট। যে জোটের মধ্যে দুটি প্রচলিত (অনৈসলামিক) রাজনৈতিক দল আর দুটি ছিল ইসলামী দল।

পরিস্থিতির আলোকে চারদল গঠন ও একসাথে নির্বাচনে যাওয়ার মাধ্যমে ঐ ধর্মনিরপেক্ষ তথা ইসলামবিরোধী দলকে ক্ষমতা থেকে নামিয়ে আনা পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামী এবং ইসলামী ঐক্যজোটের কার্যক্রম সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন নেই। অধিকাংশ বিষয়ের ভালো ফলাফলের সাথে কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া থাকে, আবার খারাপ বিষয়ের মধ্যেও কিছু কিছু উপকারিতা থাকতে পারে। এক্ষেত্রে সাধারণ নীতি হলো কোনো বিষয়কে ভালোর জন্য গ্রহণ করার ক্ষেত্রে এর খারাপের মাত্রাটা বিবেচনা করা। যেক্ষেত্রে খারাপের মাত্রা গ্রহণযোগ্য মাত্রায় না থাকে সেক্ষেত্রে তা পরিত্যাগ করা ও বিকল্প অনুসন্ধান অধিক বুদ্ধিমত্তা। তেমনি প্রচলিত দলের সাথে কোয়ালিশন করে মন্ত্রীত্ব গ্রহণের মধ্যেও কিছু সুফল ও কিছু বিরূপ প্রতিক্রিয়া রয়েছে। একটি ইসলামী সংগঠন কোয়ালিশনের মাধ্যমে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করবে, না তা থেকে বিরত থাকবে বা কী ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, তা নির্ভর করে মন্ত্রীত্ব গ্রহণের সুফল ও কুফল এসেসম্যান্ট করে তার মাত্রা নিরূপন এবং মাত্রানুসারে ভবিষ্যৎ কার্যপরিকল্পনা গ্রহণ এর উপর। এ লক্ষ্যে মন্ত্রীত্ব গ্রহণের বিষয়টির একটি পর্যালোচনা প্রয়োজন। কেননা, এ ধরনের অবস্থার পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা রয়েছে।

একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে দেশের শীর্ষ আলেমদের মতামত গ্রহণ করে বাংলাদেশের ইসলামী দলসমূহ একবিংশ শতকের প্রথম দশকে একবার সেক্যুলার পন্থি দলের সরকারের মন্ত্রী সভায় যোগ দান করেছিল। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় তা সমীচীন হবে কিনা, তা বিবেচনার দাবি রাখে। ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণের পূর্বাহ্নে মন্ত্রীত্ব গ্রহণের সুফল এবং প্রতিফলসমূহ অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে মন্ত্রীত্ব গ্রহণের সুফল এবং ক্ষতিকর দিকসমূহ নিম্নে আলোচনা করালাম–

সুফল :

১. ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য অনুকুল পরিবেশ তৈরি করার সুযোগ তৈরি হতে পারে।আমরা ইতিমধ্যে জোট গঠনের প্রেক্ষাপট আলোচনা করেছি। জোট গঠনকালীন আওয়ামী সরকারের আমলে এ দেশের পরিবেশ এতোই উত্তাল ছিল যে, ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে কিছু মানুষের নিরাপদে চলাচল কঠিন হয়ে পরেছিল। তখন ইসলামের কথা বলা ছিল মানুষের জীবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। এ ধরনের একটি পরিস্থিতি ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের জন্য অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতিকর। জোট সরকারের মন্ত্রী পরিষদে যোগ দিয়ে তাদের উপর এতোটা প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব হতে পারে যে, তারা ইসলামী দাওয়াতী কাজের অন্তরায় সৃষ্টি করা হতে বিরত থাকবে। ফলে একটি অনুকূল পরিবেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজ সহজভাবে করা যেতে পারে। ইসলাম প্রতিষ্ঠার ইতিহাসের দিকে তাকালেও দেখা যাবে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির পর ইসলামের প্রসার লাভ করে এবং বিজয় অর্জিত হয়। হিজরত পূর্ব মক্কা ছিল মুসলমানদের প্রতি চরম নির্যাতনমুখী। সে সময়ে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো ছিল অনেক কঠিন। নির্যাতনের মুখে মুসলমানদেরকে এক সময়ে হিজরত করে দেশ ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল। অপরদিকে হিজরত পরবর্তী সময়ে মদিনায় অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং ইসলামের বিজয় সূচিত হয়।

বাংলাদেশ চারদলীয় জোট নির্বাচিত হওয়ার অল্প কিছুকাল আগেও এমন একটি সময় অতিক্রম করেছে, যখন এ দেশের ইসলাম ধর্মীয় পোষাক ও অবয়বের কারণে অনেক ধরনের নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। মানুষের অবস্থা এরকম যে, যতক্ষণ শরীরে আঁচড় না লাগবে ততক্ষণ ইসলামের কথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করবে। শরীরে আঁচড় খেয়ে ইসলামী আন্দোলনের কাজ করার মতো মানসিক শক্তিসম্পন্ন লোকের সংখ্যা কম। তাছাড়া চরম প্রতিকূল অবস্থায় বাংলাদেশের মানুষ যে অন্য কোনো দেশে হিজরত করবে, এমন সুযোগও খুব কম। ফলে অনুকূল পরিবেশ তৈরি ও রক্ষা করা বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনকারী দলের জন্য বেশি জরুরি। আর এ কারণে ইসলামের বিষয়ে এলার্জি রয়েছে, এমন দলকে রাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে সরিয়ে অপেক্ষাকৃত সহনশীল দলকে ক্ষমতায় বসিয়ে পরিবেশ অনুকূল রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। মূলত: পরিবেশ অনুকূল রাখার স্বার্থে আপেক্ষাকৃত সহনশীল একটি দলের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এখানেও প্রশ্ন আসতে পারে, মন্ত্রীত্ব গ্রহণ না করে তাদেরকে সরকার গঠনে সাময়িক সমর্থন দানের মাধ্যমেও সুসম্পর্ক রক্ষা করা যেতো। এ প্রশ্নটি অবান্তর নয়। তবে আমার মনে হয় অতীতের অভিজ্ঞতাকে এক্ষেত্রে বিবেচনায় আনা হয়েছে। ১৯৯১ সালের নির্বাচনের পরেও জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমীর

মরহুম আব্বাস আলী খান র. তাদেরকে দলের পক্ষ থেকে নি:শর্ত সমর্থন দিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে এর সুফল পাওয়া যায়নি, এমনকি তাদের সাথে সম্পর্কও টিকে থাকেনি। মন্ত্রীত্ব গ্রহণের মাধ্যমে তাদের কাছাকাছি থেকে উক্ত অবস্থা এড়ানো যেতে পারে।

সুতরাং, মন্ত্রীত্ব গ্রহণের একটি সুফল হলো, দাওয়াতের কাজ করার মতো অনুকূল পরিবেশ বজায় রাখা।

২. মন্ত্রীত্ব গ্রহণের আরও একটি সুফল হলো, এর মাধ্যমে নির্যাতন প্রতিরোধে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করা যায়। ইতিহাস থেকে দেখা যায় দ্বীনের দাওয়াতের কাজ করার সময় বিভিন্ন ধরনের প্রতিরোধ ও নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হয়। এ নির্যাতনের মুখে শক্তিশালী ঈমানদারদের ঈমানের শিখা আরও বেশি মাত্রায় প্রজ্জ্বলিত হলেও দুর্বল ঈমানের লোকজন সুপ্ত হয়ে পরে। বাংলাদেশে ইংরেজ শাসন আমলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ইংরেজরা সংখ্যায় ছিল কম। অপরদিকে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল বেশি। তথাপিও তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকার কারণে মুসলমানরা মাথা তুলে শক্তভাবে দাঁড়াতে পারেনি। সে আমলে শরীয়তুল্লাহ্-তিতুমীরের মতো দীপ্ত ঈমানের মুজাহিদ তৈরি হলেও সাধারণ মানুষের মধ্যে ইসলাম চর্চায় শিথীলতা দেখা দেয়। মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজ ও হিন্দু সংস্কৃতির প্রসার লাভ করে। অনেক মুসলমানের সন্তানকে দেখা যায় হিন্দুদের অনুকরণে ধূতি পরিধান করতে। হিন্দু জমিদারদের খুশি করতে, তাদেরকে প্রণাম করতে। ইংরেজ এবং তাদের ছত্রছায়ায় আশ্রিত হিন্দু জমিদারদের নির্যাতনের ভয়ে ইসলামের দাওয়াত বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফলে বাংলাদেশের প্রাচীন ইসলামী সংস্কৃতিতে হিন্দু ও ইংরেজ সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটে এবং মুসলমানরা শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে পিছিয়ে পরে এবং মুসলমানদের অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। এতে দেখা যায়, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ইসলাম বিদ্বেষীদের হাতে থাকলে ইসলাম প্রচারে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশ আমলেও দেখা গেছে বিভিন্ন সময়ে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের উপর বিভিন্নমুখী নির্যাতন করা হয়েছে। মন্ত্রীত্ব গ্রহণের মাধ্যমে সরকারের অংশীদার হয়ে এ সকল নির্যাতন প্রতিরোধে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রয়োগ করা যেতে পারে। এটিও মন্ত্রীত্ব গ্রহণের একটি সুফল।

৩. মন্ত্রীত্ব গ্রহণের ক্ষেত্রে অপর একটি সুবিধা হলো, এর মাধ্যমে সরকারের কাছাকাছি থেকে তাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো এবং তাদেরকে ইসলামের দিকে প্রভাবিত করে ইসলাম বিরোধী আইন প্রণয়নে বিরত রাখা যায়।

অনৈসলামিক সরকারের উপর ইসলামী আন্দোলনকারী দলসমূহের কোনো প্রভাব না থাকায় সরকারে অবস্থানকারী ব্যক্তিদের কাছে ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াত পৌঁছানো কঠিন হয়। তাছাড়া সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারাও সরকারের ভয়ে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে কাছে ঘেঁষতে দেন না। ফলে তাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছানো কঠিন হয়ে পরে। মন্ত্রীত্ব গ্রহণের মাধ্যমে সরকারে প্রভাব সৃষ্টি করে এ সকল বাধা দূরীভূত করা যেতে পারে। অধিকন্তু অনৈসলামিক সরকার আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে ইসলামী ভাবধারার বিষয়টি প্রায়ই বিবেচনায় আনেন না। মন্ত্রীত্ব গ্রহণের মাধ্যমে সরকারের উপর প্রভাব সৃষ্টি করে ইসলাম বিরোধী, তথা ইসলাম প্রতিষ্ঠার অন্তরায় আইন প্রণয়নে সরকারকে বিরত রাখা সম্ভব হতে পারে।

৪. আরো একটি সুবিধা হলো, মন্ত্রীত্ব গ্রহণের মাধ্যমে ইসলামী দলের সক্ষমতা, দক্ষতা ও সততার বিষয়টি জনগণের সামনে উপস্থাপনের একটি সুযোগ তৈরি হয়েছিল। বাংলাদেশে একবারই চার দলীয় জোট সরকারের সময় জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ হতে দু'জন মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেছিলেন। বাংলাদেশের মানুষ আলেম-ওলামাদেরকে পছন্দ করলেও মন্ত্রণালয় বা দেশের শাসনভার চালানোর ক্ষেত্রে তাঁদের দক্ষতা ও সক্ষমতার বিষয়ে পরিপূর্ণ আস্থা রাখতে পারেনি। জামায়াতের পক্ষ হতে মনোনীত দু'জন মন্ত্রী তাঁদের দায়িত্ব পালনে যথেষ্ট দক্ষতা ও সততা প্রদর্শন করেছেন বালে জনশ্রুতি আছে। উক্ত দুই জন মন্ত্রী কথিত যুদ্ধ অপরাধের অভিযোগে বিচারিক হত্যার শিকার হলেও তাঁদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি বা নৈতিক স্খলনের কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হয়নি। ফলে এর মাধ্যমে জনগণের সামনে এ বিষয়টি স্পষ্ট করা সম্ভব হয়েছে যে, ইসলামী দলের কাছে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হলে, তারাও দক্ষতার সাথে দেশ পরিচালনা করতে সক্ষম হবেন। আর অতিরিক্ত সুবিধা হবে দেশের বিদ্যমান দুর্নীতির ক্ষেত্রে ক্ষমতাশীনদের পৃষ্ঠাপোষকতার পরিবর্তে কঠোরতা আরোপিত হবে। এতে দেশে সুশাসন আসার সম্ভাবনার দ্বার উম্মুক্ত হবে।

ক্ষতিকর দিক

মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করার কারণে কতিপয় দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতি এবং নীতিগত ভুল হয়ে থাকে, যেগুলো সমগ্র আন্দোলনের জন্য ক্ষতি হিসেবে পরিগণিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো পুনরায় এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে যখন সেক্যুলারদের মন্ত্রী সভায় অংশগ্রহণের ডাক আসতে পারে। এমন পরিস্থিতি তৈরি হলে মন্ত্রীত্ব গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে কুরআন, সুন্নাহ্ এবং রাসূল সা. এর সিরাত এর ভিত্তিতে যে সকল বিষয়সমূহের বিষয়ে সমাধানে আসতে হবে তা নিম্নরূপ:

১. ধর্মহীন রাজনীতিকে সাধারণ মানুষ জায়েজ বলে বিবেচনা করবে: একটি বিষয় সুস্পষ্ট, কোনো মানুষ বাতিল আকিদা ও জীবন ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং সংরক্ষণের সংগ্রামে নিয়োজিত থাকলে সত্যিকার অর্থে সে আর পূর্ণ মুসলমান থাকে না। ইসলামী আন্দোলনের মূল লক্ষ্যও হলো এ ধরনের প্রচলিত ব্যবস্থার মূলোৎপাটনের মাধ্যমে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। প্রচলিত রাজনৈতিক দলের সাথে একাকার হয়ে মন্ত্রী সভায় যোগ দেয়ার পর, উক্ত প্রচলিত রাজনৈতিক দলের বাতিল আকিদা হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করে উক্ত দলে যোগ দেয়ার কারণে মুসলমানিত্ব হারানোর বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে জনগণের সামনে ঘোষণা দেয়া বা ব্যাপক প্রচার করা ইসলামী দলের পক্ষে সম্ভব নয়। বরং বিভিন্ন মিটিং ও প্রোগ্রামে দেখা যাবে, উক্ত দলের নেতৃবৃন্দের বিভিন্নমুখী প্রশংসা করতে এবং উক্ত দলকে ইসলাম বান্ধব হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিতে। ইসলামী দলের এ ধরনের আচরণ সাধারণ মুসলমানের মনে এ ধারণা জন্ম দিতে পারে যে, প্রচলিত রাজনীতি করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েজ। আর এ মনে করে, অনেক মুসলমান প্রচলিত রাজনৈতিক দলসমূহে যোগ দেয়া শুরু করতে পারে, যা ইসলামী আন্দোলনের জন্য মোটেও কল্যাণজনক নয়। মন্ত্রীসভায় যোগ দেয়ার পরিবর্তে তাদের থেকে এ অঙ্গীকার গ্রহণ করা সম্ভব ছিল যে, স্বাধীনভাবে সাংগঠনিক কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনো বাধা বিপত্তির সৃষ্টি হলে বাধার প্রতিরোধে উক্ত দল সহযোগিতা করবে। অত:পর বাতিলপন্থী দলসমূহের যোগ দেয়ার পরিণাম এবং জিহাদ করার আবশ্যকতার ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি করা সম্ভব হতো ।

২. ইসলামী নীতি ও আদর্শের পরিপন্থী: তাগুত বা সেক্যুলার দলের সাথে কোয়ালিশন করা ইসলামী আকিদা, নীতি ও আদর্শের সুস্পষ্ট পরিপন্থী। কুরআন, সুন্নাহ ও সীরাত পর্যালোচনায় দেখা যায় ইসলামী আন্দোলনরত বা জিহাদরত মুজাহিদদের জন্য এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সমীচীন নয়। কারণ-
(ক) আল্লাহ্ কালামে হাকীমে বলেছেন–

وَ مَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ۴۴

আর যারা আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই কাফের। –সূরা আল-মায়েদা; ৪৪

وَ مَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۴۵

আর যারা আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই জালিম। –মায়েদা; ৪৫

وَ مَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ٤٧

আর যারা আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই ফাসেক। মায়েদা; ৪৭

কালামে হাকীমের এ সকল আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয়, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র বিধান উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও ভিন্ন কোনো বিধান দ্বারা ফায়সালা করে, তারা একাধারে কাফির, জালিম ও ফাসিক। এ ফায়সালা হতে পারে বাদী-বিবাদী দু'পক্ষের কোনো মোকদ্দমার ফায়সালার ক্ষেত্রে, আবার এও হতে পারে, দেশের জনসাধারণের জন্য কোনো আইন-কানুন, নিয়ম-নীতি ও কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ সংক্রান্ত বিষয়ে। এখন খুব খেয়াল দিয়ে কতিপয় পরিস্থিতি পর্যালোচনা করুন।

প্রথমত: ইসলাম প্রষ্টিটিউট সম্পর্কে কী ফায়সালা দেয়? ইসলাম কি ভবিষ্যতের কোনো এক সময়ে প্রসদেরকে পূণর্বাসন করার চিন্তা করে পূণর্বাসন না করতে পারা পর্যন্ত সময়ের জন্য তাদেরকে পতিতাবৃত্তিতে লিপ্ত থাকার অনুমতি দেয়? নিশ্চয়ই এর উত্তর আসবে কোনো অবস্থায়ই নয়। যদি কোনো মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন প্রাপ্ত কোনো প্রষ্টিটিউট বিদ্যমান থাকে, কোনো নতুন মন্ত্রী তিনটি পন্থার যে কোনো একটি অবলম্বন করতে পারেন–

১. উক্ত অনুমোদন অনুসমর্থন দিয়ে উক্ত নিয়মটি বহাল রাখা।

২. প্রস্তাব আনার মাধ্যমে পূর্ববর্তী অনুমোদন বাতিল করে প্রষ্টিটিউট নিষিদ্ধ করা।

৩. তার প্রস্তাব অনুসারে নিষিদ্ধ না হলে অনুকূল সিদ্ধান্তকে মেনে নিয়ে অনুসমর্থন দান অথবা পদত্যাগ করে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ছেড়ে দেয়া।

যদি কোনো ব্যক্তি ২নং পন্থা অবলম্বন করেন অথবা ৩নং পন্থার দ্বিতীয়টি গ্রহণ করেন, তবে তিনি আল্লাহ্‌র আইনের অনুগামী হলেন। আর যদি প্রথমটি অথবা তৃতীয়টির প্রথম অংশের অনুসারী হন, তবে আল্লাহ্‌র আইন পরিপালনের পরিবর্তে নিজের খেয়ালের অনুসারী হলেন। সুতরাং, তার ফায়সালা হলো নিজের ইচ্ছাধীন। অর্থাৎ তিনি আল্লাহ্‌র বিধান অনুসারে ফায়সালা করলেন না।

দূর্ভাগ্যবশত: দেশের স্বীকৃত প্রষ্টিটিউটসমূহ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন প্রাপ্ত। যে কয়টি ইতিমধ্যে বন্ধ হয়েছে, তা দেশের জনসাধারণ কর্তৃক। সরকার কর্তৃক নয়।

দ্বিতীয়ত : দেশের সরকার কৃষিখাতের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকে। তার মধ্যে কৃষি ঋণ একটি। বাংলাদেশের কৃষি ঋণ সম্পূর্ণরূপে সুদভিত্তিক। আর সুদ ইসলামে সুস্পষ্ট হারাম। সুদভিত্তিক ঋণের পরিবর্তে সরকার কৃষকদেরকে কর্জে হাসানা বা আগাম ক্রয়ের শর্তে পণ্যমূল্য পরিশোধ করতে পারে। কিন্তু এর পরিবর্তে দিয়ে থাকে ইসলাম নিষিদ্ধ পন্থায় সুদভিত্তিক কৃষি ঋণ। এই ঋণের পরিমান ও সুদের হার যৌথভাবে কৃষি মন্ত্রণালয় ও অর্থমন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত। কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকার অর্থই হলো সুদ ও সুদভিত্তিক ঋণের প্রতি সমর্থন দেয়া, যা আল্লাহ্‌র ফায়সালার একশত ভাগ পরিপন্থী ফায়সালা।

তৃতীয়ত : হারাম পণ্য ভোগ করা যেমন- হারাম, হারাম পণ্যের ব্যবসা করাও হারাম। মদ একটি হারাম পণ্য। এর উৎপাদন ও ব্যবসা করা সম্পূর্ণরূপে হারাম। এ বিষয় দু'টি শিল্প মন্ত্রণালয় ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে। দেশে মদ আমদানী ও বিক্রয় সীমিত আকারে হলেও বৈধ। যে সরকার এ সকল অবৈধ পণ্যের ব্যবসার অনুমতি দিয়ে থাকে, তার মন্ত্রণালয়ে যোগ দেয়া আর এর এ সকল অবৈধ কাজে অনুমোদন, সমর্থন ও সহযোগিতা করা একই কথা।

চতুর্থত : ইসলামে মূর্তিপূজা চূড়ান্তভাবে হারাম। এর সাথে নিকট সম্পর্ক রয়েছে এমন কাজ করাও হারাম। কোনো জড় পদার্থের প্রতি (যেমন- বৃক্ষ, স্তম্ভ, চন্দ্র, সূর্য, আগুন) সম্মান প্রদর্শন সুস্পষ্ট কুফরী। এ দেশের সরকার বিশেষ বিশেষ দিনে কিছু জড় পদার্থের পদতলে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে, সামান্য সময় নীরবতা পালন করে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে থাকে। আবেগ ও জাতীয়তাবোধ থেকে এর গুরুত্ব যত বেশি হোক না কেন, মুসলমান হিসেবে এ কাজ করা অপেক্ষা যে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়া শ্রেয়, তা আমাদের জাতির পিতা ইব্রাহীম আ. আমাদেরকে দেখিয়ে গেছেন।

সুতরাং, মন্ত্রীত্বের বিনিময়ে পূজা মন্ডপে গিয়ে পুষ্পমাল্য গলায় ধারণ এবং বিশেষ বিশেষ দিনে জড় স্তম্ভের সামনে দাঁড়িয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও নীরবতা পালন করা কোনোভাবেই ঈমানের অনুকূল হতে পারে না। মনে রাখতে হবে, অমুসলিমদের জন্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করা আর তাদের পুঁজা-অর্চণায় সহযোগিতা করা এক কথা নয়। সুতরাং, মন্ত্রীত্ব গ্রহণের কারণে যদি এ সকল কাজে বাধ্য হতে হয় তাহলে প্রচলিত রাজনৈতিক দলীয় সরকারের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ ইসলামী আদর্শ ও নীতির পরিপন্থী।

৩. মন্দ কাজে সহযোগিতা : মন্দ কাজে সহযোগিতা করা ইসলামে সুস্পষ্ট হারাম। আল্লাহ্ কালামে হাকীমে বলেন–

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

'সৎকর্ম ও তাকওয়ার কাজে তোমরা পরস্পরকে সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অপরকে সাহায্য করবে না। –সূরা আল-মায়েদা-২

সরকারের প্রতিটি মন্ত্রী সরকারের সকল কাজের সমর্থক ও সহযোগী। দেশের সরকার অনৈসলামিক আইন প্রণয়ন, অনৈসলামিক শিক্ষা ব্যবস্থা, অন্যায় পর্যায়ে করারোপের মাধ্যমে জনসাধারণের উপর জুলুম, সুদের বৈধতা দান, পতিতালয়ের বৈধতা দান, জনসাধারণের অর্থের অপব্যবহার তথা লুটতরাজসহ হাজারো অপকর্মে লিপ্ত। যারা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত সকলে এ সরকার প্রধানের আনুগত্য স্বীকার করে পদ গ্রহণ করেছেন এবং সরকারের এ সকল অপকর্মের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগী। সুতরাং, একজন মুসলমানের পক্ষে জুলুম ও মন্দ কাজে লিপ্ত সরকারের মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ কাঙ্খিত হতে পারে না।

৪. রাসূল সা. এর নির্দেশের লঙ্ঘন: রাসূল সা. এর হাদীস হতে তাগুত সরকারের সাথে সম্পর্ক কিরূপ হওয়া উচিত তার সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়। যেমন–

কা'ব ইবনে উজরা রা. বলেন, একদা রাসূল সা. আমাকে লক্ষ্য করে বলেন: 'আমি তোমাকে অর্বাচীন, নির্বোধ শাসকদের নেতৃত্ব হতে আল্লাহ্‌র হিফাজতে দিলাম। তিনি বললেন, উহা কীরূপে হবে ইয়া রাসূলুল্লাহ সা.! উত্তরে তিনি বললেন অচিরেই আমার পরে তাদের আবির্ভাব ঘটবে। যে ব্যক্তি তাদের কাছে যাবে, তাদের মিথ্যাকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে এবং অন্যায় কাজ-কর্মে সাহায্য ও সহযোগিতা করবে, আমার সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নাই এবং তাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নাই। অবশেষে হাউজে কাওসারে তারা আমার কাছে আসতেও পারবে না। বস্তুত: যারা তাদের কাছে ঘেষবে না, তাদের মিথ্যাকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে না এবং তাদের অন্যায় কাজে সহযোগিতাও করবে না, সেই সমস্ত লোকেরা হবে আমার দলভুক্ত এবং আমিও হব তাঁদের দলভুক্ত। উহারা হাউজে কাওসারে আমার সাথে মিলিত হবে।'

–তিরমিযী ও নাসায়ী: মিশকাত ৩৫৩১

প্রকৃতপক্ষে সে-ই সব থেকে নির্বোধ, যে নিজের ও অপরের কল্যাণ বোঝে না এবং সত্যকে চিনতে সক্ষম নয়। একমাত্র আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সা. এর নির্দেশ তথা ইসলামই হলো সত্য এবং কেবলমাত্র ইসলাম অনুসরণের মধ্যেই রয়েছে ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ ও মুক্তি। এর বিপরীতে যত বিধান রয়েছে, তার সবই অন্যায় ও মিথ্যা, অকল্যাণ ও ধ্বংসের মূল কারণ। আমাদের দেশের

শাসকগণ নিজেদের স্বার্থে অথবা সীমিত জ্ঞানের কারণে এ সকল মিথ্যা বিধান রচনা করছে এবং জনগণের উপর অন্যায়ভাবে চাপিয়ে দিচ্ছে। এ সকল শাসকদের অন্যায় ও কুফরী বিধানসমূহ মন্ত্রী ও আমলাদের দ্বারা অনুমোদিত ও কার্যকর করা হয়ে থাকে। সুতরাং, বর্তমান সরকারের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করা রাসূল সা. এর নির্দেশের লঙ্ঘন বৈ কিছু নয়।

অপর এক হাদীসে দেখা যায়-

শেষ জমানায় জালিম শাসক, ফাসিক মন্ত্রী ও কর্মধ্যক্ষ, বিশ্বাস ঘাতক বিচারপতি এবং মিথ্যাবাদী ফকীহ্‌র প্রাদূর্ভাব হবে। তোমাদের মধ্যে যারা এ যুগ পাবে, তারা যেন ঐসব লোকের রাজস্ব সংগ্রহকারী নিযুক্ত হতে প্রস্তুত না হয়। তাদের তরফ হতে কোনো মাতব্বরী কিংবা সরদারীও যেন কেউ গ্রহণ না করে এবং তাদের কোনো সম্মানিত ও দায়িত্বপূর্ণ পদ দখলকারীও যেন কেউ না হয়।'

–বর্ণনাকারী: আবূ হুরায়রা রা. সূত্র: তাবরানী

হাদীসটি পর্যালোচনায় দেখা যায় বর্ণিত হাদীসটি বর্তমানে প্রচলিত বিভিন্ন দেশের সরকারের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ প্রযোজ্য। কেননা, জালিম বলতে ঐ ব্যক্তিকে বুঝায় যে, অত্যাচারী, সীমালঙ্ঘনকারী, অবিচারক, যে বাড়াবাড়ি করে। একজন শাসক দুই দিক হতে জালিম হতে পারে। এক মানুষের প্রতি জালিম হওয়া, দুই আল্লাহ্‌র প্রতি জালিম হওয়া। যখন কোনো শাসক তার প্রজা সাধারণের উপর জুলুম করে, তখন সে হয় মানুষের প্রতি জুলুমকারী। একজন শাসক বিভিন্নভাবে মানুষের উপর জুলুম করতে পারে। যেমন–অসহনীয় পর্যায়ে করারোপ, বিভিন্ন বিষয়ে মতের অমিল হওয়ার কারণে নিষ্পেষণ, নির্যাতন, প্রতিপক্ষকে অন্যায়ভাবে শাস্তি প্রদান, আল্লাহ্‌র গোলাম হওয়ার সুযোগ দানের পরিবর্তে নিজেদের গোলামে পরিণত করা, ইসলামের পূর্ণ অনুসরণে বাধা প্রদান করা ইত্যাদি।

বাংলাদেশে বর্তমানে যে সরকারব্যবস্থা প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, তা হলো গণতন্ত্র নামক একটি মতবাদের ভিত্তিতে পরিচালিত সরকার ব্যবস্থা। এখানে গণ অর্থ জনগণ এবং তন্ত্র হচ্ছে একটি নিয়ম-নীতি, একটি মতবাদ, জীবন ব্যবস্থা, কর্মনীতি বা কর্মপদ্ধতি, অর্থাৎ জনগণ তথা মানুষের তৈরি করা নিয়ম-নীতি, মতবাদ ও কর্মপদ্ধতির ভিত্তিতে বর্তমান সরকার পরিচালিত। এ পদ্ধতিতে বিশ্বাস করা হয় যে, দেশের ভূমি বা সার্বভৌমত্বের একমাত্র মালিক দেশের জনসাধারণ এবং জনসাধারণ বা তাদের প্রতিনিধিগণ, যা কিছুকে বৈধ মনে করবে বা বৈধতা দেবে কেবলমাত্র তাই বৈধ এবং যা কিছুকে অবৈধ বলে ঘোষণা করবে তাই অবৈধ। জনগণের আইন দ্বারাই জনগণ পরিচালিত হয়, ফলে মানুষ মানুষের

আদেশে পরিচালিত হওয়ার কারণে মানুষ মানুষের গোলামে পরিণত হয়। পক্ষান্তরে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস ও নীতি ঠিক তার বিপরীত। ইসলামের মূলনীতি হলো সার্বভৌমত্বের একমাত্র অধিপতি আল্লাহ্। আল্লাহ্ই মানুষের কর্মপদ্ধতি ও কর্মনীতি নির্ধারণের একমাত্র অধিকারী। তিনি কালামুল্লাহ্র মাধ্যমে এবং তাঁর রাসূলের মাধ্যমে যা কিছু বৈধ করেছেন, তাই একমাত্র বৈধ এবং যা কিছু অবৈধ বলেছেন, তাই অবৈধ। কোনো কিছু বৈধ বা অবৈধ ঘোষণা দেয়ার অধিকার কোনো মানুষের নেই। মানুষ একমাত্র আল্লাহ্র আদেশের অধীন হয়ে আল্লাহ্র গোলামে পরিণত হবে। যারা ইসলামের এই নীতিমালা মেনে নিতে অস্বীকার করে, তারা তাগুত।

যেহেতু বাংলাদেশ সরকার এ নীতিমালার অনুসারী নয়, সেহেতু এ দেশের বর্তমান সরকার ব্যবস্থা তাগুতী সরকার ব্যবস্থা।

পক্ষান্তরে আল্লাহ্ বলেছেন–

'সৎকর্ম ও তাক্ওয়ার কাজে তোমরা পরস্পরকে সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অপরকে সাহায্য করবে না।' –সূরা আল-মায়েদা: -২

সুতরাং, বর্তমান কুফরী সরকারের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করার অবকাশ রাসূল আকরাম সা. এর কোনো উম্মতের জন্য অবশিষ্ট নেই।

রাসূল সা. এর আদর্শ পরিপন্থী : রাসূল আকরাম সা. এর নবুওয়াতী জীবনে দু'বার অনুরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, যখন বেদ্বীনদের কাছ থেকে সমঝোতার প্রস্তাব পাঠানো হয়। রাসূল সা. ঐ সকল প্রস্তাবসমূহের প্রেক্ষিতে যে সিদ্ধান্ত ও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন, প্রচলিত রাজনৈতিক দলীয় সরকারের সাথে কোয়ালিশন, তার পরিপন্থী।

রাসূল আকরাম সা. এবং তাঁর সাহাবাগণের রা. উপর কাফেরদের দ্বারা সংগঠিত অত্যাচার নির্যাতন ও জুলুমের চিত্র নতুন করে উল্লেখ করার কিছু নেই, কেননা মুসলমান মাত্রই ঐ নির্যাতনের বিভৎস চিত্রের সাথে পরিচিত। সেই কঠিনতম সময়ে কাফিরদের পক্ষ হতে রাসূল সা. এর কাছে দ্বীন প্রচার ছেড়ে দেয়ার বিনিময়ে নিম্নোক্ত সুবিধা দেয়ার প্রস্তাব করা হয়–

১. আপনার যদি ধন সঞ্চয়ের বাসনা থাকে, এখন আমরা আপনাকে আরবের সর্বপ্রধান ধনকুবের করে দিচ্ছি।

২. যদি সম্মান লাভের ইচ্ছা থাকে, তা-ও খুলে বলুন, আমরা আপনাকে নিজেদের প্রধান বলে স্বীকার করে নেই।

৩. রাজত্ব করার আকাঙ্খা হয়ে থাকলে, তাও স্পষ্ট করে বলুন, আমরা আপনাকে সমগ্র আরব দ্বীপের রাজা বলে বরণ করে নেই।

৪. আর আপনি যা দেখে শুনে থাকেন, তা যদি কোনো ভূত-প্রেত বা উপসর্গের উপদ্রব হয়, তা জানতে পারলে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করে আমরা শ্রেষ্ঠ গুণীন ডেকে আপনার ঝাড়ান-কারান (চিকিৎসা) করে নিতে পারি।

কাফিরদের উপরোক্ত প্রস্তাবে রাসূল সা. কী কৌশল হিসেবে ক্ষমতা, সম্মান ও অর্থবিত্ত গ্রহণ করেছিলেন? তিনি তাদের ঐ সকল প্রলাপোক্তি প্রসূত প্রস্তাবসমূহ প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে দ্বীন গ্রহণ করে নেয়ার জন্য দাওয়াত দিয়েছেন। কাফিরদের দ্বিতীয় প্রস্তাবটি ছিল রাসূল আকরাম সা. এর চাচা আবূ তালিব যিনি রাসূল সা. কে পরম স্নেহে আগলে রেখেছিলেন, তার মৃত্যুকালে। আবূ তালিবের মৃত্যু যখন নিকটবর্তী হলো, তখন কুরাইশ প্রধানগণ সেখানে উপস্থিত হয়ে আবূ তালিবকে বলেছিলো, 'আপনার সময় ক্রমশ: নিকটবর্তী হয়ে আসছে, তা আপনিও বুঝতে পারছেন। পক্ষান্তরে আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের সাথে আমাদের বাদ-বিসংবাদের বিষয়ও আপনি অবগত আছেন। এখন আমাদের বিশেষ অনুরোধ, আপনি বেঁচে থাকতে তাঁর সাথে আমাদের একটা রফা-নিষ্পত্তি করে দিন। তিনি প্রতিজ্ঞা করুন, আমাদের ধর্মের নিন্দা করবে না, আমরা যা করি তার কোনো প্রতিবাদ করবে না; আমারও প্রতিজ্ঞা করবো যে, ভবিষতে আমরাও তার কোনো কাজ-কথার প্রতিবাদ করবো না। কুরাইশ দলপতিদের প্রস্তাব শুনে আবূ তালিব মুহাম্মদ সা. কে ডেকে পাঠালেন এবং মুহাম্মদ সা. কে সম্বোধন করে তাঁর নিকট কুরাইশ দলপতিদের প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। কিন্তু রাসূল সা. দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলেন, যা সত্য বুঝেছি, তার প্রচার করতে আমি কোনো অবস্থায় বিরত থাকতে পারবো না। সত্য-মিথ্যার মধ্যে, শিরক ও তাওহীদের সাথে রফা-নিষ্পত্তি হওয়া কোনো মতেই সম্ভবপর নয়। তারা এক আল্লাহ্‌কে স্বীকার করে নিক, তাহলে আমার আর কোনো কথা থাকবে না।'

উল্লেখ্য, এ প্রস্তাবকেও রাসূল সা. কোনো কৌশল হিসেবে গ্রহণ না করে দৃঢ়তার সাথে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, যদিও সেই সময়টা ছিল খুবই সংকটাপন্ন।

অতীত সব কয়টি জিহাদই পরিচালিত হয়েছিল প্রতিষ্ঠিত তাগুত শাসনব্যবস্থার বিপক্ষে। সুতরাং, ঐ শাসনব্যবস্থার কর্ণধারদের সাথে একাকার হয়ে যাওয়ার সুযোগ ছিল না। বর্তমানে যদি মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করা হয়, তবে যে বিষয়সমূহ বিবেচনা করা উচিত, তা হলো–

১. তারা তাদের কার্যাদী কোন বিধান দ্বারা সম্পন্ন করছেন, অর্থাৎ মানুষের বিধান দ্বারা না আল্লাহ্‌র বিধান দ্বারা।

২. মন্ত্রীত্ব নেয়ার পর উক্ত ধর্মহীন দলের কুফর হওয়ার বিষয়ে প্রকাশ্য প্রচার-প্রচারণা চালানো সম্ভব হচ্ছে কিনা?

৩. যাদের সাথে একাকার হয়ে দেশ পরিচালনা করছেন, তারা আল্লাহ্‌র আইন বাস্তবায়নের পক্ষে না বিপক্ষে?

৪. কুফর নীতিতে দেশ পরিচালনার শর্তে ইতিপূর্বে কোনো জিহাদকারী দল কুফরী সরকারের ক্ষমতার অংশীদার হয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠায় সফল হয়েছে কিনা? যদি এ সকল বিষয়ের উত্তর নেতিবাচক হয়, তবে মন্ত্রীত্ব গ্রহণের পরিবর্তে দ্বীনের সত্যতার ঘোষণা এবং ইসলামী দৃষ্টিকোণ হতে এ সকল কুফরী দলসমূহের স্বরূপ উন্মোচন করে মানুষকে কুফরী আন্দোলন হতে বিরত থাকার প্রকাশ্য আহ্বান জানানো উচিত।

কোন কোন কারণে একটি ইসলামী আদর্শবাদী দলের জন্য কুফরী সরকারের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করা সমিচীন নয়, তার কিয়দাংশ উল্লেখ করা হলো। আলোচনা দীর্ঘায়িত করতে চাইলে দীর্ঘ হবে। আর আল্লাহ্‌র একান্ত অনুগত বান্দাহর জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একটি কারণ যথেষ্ট।

তবে মন্ত্রীত্ব গ্রহণের পক্ষেও বেশ কিছু মতামত লক্ষ্য করা যায়। যেমন- পক্ষের মতাবলম্বীগণ কুরআনের একটি আয়াতের উল্লেখ করে থাকেন।

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

'ডাক তোমার রবের পথের দিকে হিকমত ও উত্তম নসীহতের সাথে।'

–সূরা আন নাহল: আয়াত ১২৫

আর উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করা হয় হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তি এবং ঐতিহাসিক মদীনা সনদ। অথচ গৃহীত পদক্ষেপের সাথে এ তিনটির রয়েছে অনেক বৈসাদৃশ্য। এ সকল বৈসাদৃশ্যসমূহ বিবেচনায় আনলে এ সিদ্ধান্তের অনুকূলে উক্ত যুক্তি উপস্থাপন যথার্থ নয়।

সদয় অনুধাবন ও বিবেচনার জন্য বিষয়টি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো–

প্রথমে আলোচনা করছি হুদায়বিয়ার সন্ধি সম্পর্কে। বাতিল পন্থি দলের সাথে একাকার হয়ে সরকারে যোগ দেয়ার বিষয়ে প্রশ্নের অবতারণা হলে অনেকে হুদায়বিয়ার সন্ধিকে অনুরূপ কৌশলের উদাহরণ হিসেবে পেশ করে থাকেন। মূলত: গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে, হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তির সাথে এ ঘটনার সম্পর্ক নেই। হুদায়বিয়ার সন্ধির সাথে উক্ত ঘটনার যে সকল বৈসাদৃশ্য রয়েছে তা নিম্নে আলোচনা করা হলো–

১. হুদায়বিয়ার সন্ধিতে কুফর ও ইসলামের অবস্থান ছিল সম্পূর্ণ দুটি বিপরীত মেরুতে। অপরদিকে ইসলামী দল কর্তৃক মন্ত্রীত্ব গ্রহণের ফলে কুফর ও তাঁদের ইসলামী রাজনীতি হয়ে যায় একাকার।

ক. হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তির প্রতিটি ধারা ছিল ইসলামের জন্য কল্যাণের এবং প্রকাশ্য বিজয়। অপরদিকে ইসলামী দল কর্তৃক গৃহীত অনুরূপ সিদ্ধান্ত হবে ইসলামী আন্দোলনের জন্য মারাত্মক হুমকি স্বরুপ। যে সকল কারণে উক্ত সিদ্ধান্ত ইসলামী আন্দোলনের জন্য ক্ষতিকর তা ইতিমধ্যে আলোচিত হয়েছে। এখানে হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তির ধারাসমূহ এবং উক্ত ধারাসমূহের কল্যাণ আলোচনা করা হলো–

খ. হুদায়বিয়া সন্ধি চুক্তির প্রথম শর্ত ছিল 'এ বছর মুসলমানরা ওমরা পালন না করে ফিরে যাবে এবং পরবর্তী বছর ওমরা পালনের জন্য তিনদিন মক্কায় কেবলমাত্র একটি করে কোষবদ্ধ তরবারীসহ অবস্থান করতে পারবে।'
এ শর্তটির কারণে এ বছর মুসলমানরা ফিরে গেলেও পরবর্তী বছর বাধাহীনভাবে ওমরা পালন করার স্বীকৃতি লাভ করে, ফলে বিনা রক্তপাতে কাবাঘরে মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইসলাম প্রচারের পথ সুগম হয়।

গ. হুদায়বিয়া সন্ধি চুক্তির দ্বিতীয় শর্ত ছিল 'যে কোনো গোত্র যে কোনো মতাদর্শে বিনা বাধায় প্রবেশ করতে পারবে, কোনো পক্ষের কোনো আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।'
এ শর্তটির কারণে ইসলাম প্রচারের বাধা বিদূরিত হয়। ফলে দ্রুত ইসলামের প্রসার লাভ করে।

ঘ. তৃতীয় শর্তটি ছিল এরকম 'উভয় পক্ষ চুক্তি উত্তর দশ বছর যুদ্ধ বন্ধ রাখবে। উভয় পক্ষ একে অপরের উপর আক্রমন করা হতে বিরত থাকবে।'
উল্লেখিত শর্তটি ছিল ইসলামের জন্য সমধিক কল্যাণময়। কারণ ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য শান্ত পরিবেশ সর্বাধিক কাম্য। কেননা, যুদ্ধ বিদ্রোহের মধ্যে ইসলাম প্রচার প্রসারিত হতে পারে না। ইসলাম প্রচার যখন হয় বাধাগ্রস্ত, তখন যুদ্ধের মাধ্যমে ঐ বাধাকে করা হয় অপসারিত। সুতরাং, এই শর্তের ফলে ইসলাম প্রচারের একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

ঙ. চতুর্থ শর্তটি ছিল 'কুরাইশদের কেউ মুসলমানদের সাথে যোগ দিলে তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে কিন্তু মুসলমানদের কেউ ধর্মত্যাগী হয়ে কুরাইশদের মধ্যে ফিরে এলে তাকে ফেরৎ দেয়া হবে না।'

এই শর্তের প্রথম অংশে বলা হয়েছিল, কুরাইশদের কেউ মুসলমানদের সাথে যোগ দিলে তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। উল্লেখ্য, এর মধ্যে নারীরা অন্তর্ভুক্ত ছিল

না। ফলে কোনো নারী হিজরত করে আসলে তাকে ফিরিয়ে দেয়া হয়নি। অপরদিকে পুরুষদেরকে ফিরিয়ে দেয়ার মধ্যে অকল্যাণ ছিল না। কেননা, তারা মদিনা রাষ্ট্রের বাইরে যে কোনো স্থানে হিজরত করার বিষয়ে স্বাধীন ছিল। ফলে তাঁরা মদীনায় না এসে মক্কায় অবস্থান ও অন্যান্য স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করার কারণে ইসলামের দাওয়াত সেই সকল স্থানেও সম্প্রসারিত হয় এবং এতে করে কাফেরদের জন্য হীতে বিপরীত হয় এবং পরবর্তীতে তারা এ ধারা প্রত্যাহার করে।

দ্বিতীয় অংশে বলা হয়েছিল, মুসলমানদের কেউ ধর্মত্যাগী হয়ে কুরাইশদের মধ্যে ফিরে গেলে তাকে ফেরৎ দেয়া হবে না। এ শর্তটিতেও ইসলামের জন্য অকল্যাণের কিছু ছিল না। কেননা, কোনো ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সা. এর প্রতি ঈমান আনলে কখনো ইসলাম ত্যাগ করে ফিরে যেতে পারে না। যে ফিরে যাবে, সে অবশ্যই মুনাফিক। মুসলমানদের মধ্যে মুসলমান পরিচয়ে মুনাফিকের উপস্থিতি ইসলামের জন্য অকল্যাণ বৈ কিছু নয় সুতরাং, তাদের প্রত্যাবর্তন দ্বারা ইসলামের ক্ষতির পরিবর্তে কল্যাণ সাধিত হয়।

সুতরাং, কোনো বিবেচনায় হুদায়বিয়ার সন্ধি ইসলামের জন্য অকল্যাণকর বিবেচিত হয়নি। এটি ছিল সর্বাধিক কল্যাণকর, বাস্তবধর্মী ও বিজ্ঞচিত সিদ্ধান্ত। যে সকল মহান সাহাবা এতে দ্বিমত প্রকাশ করেছিলেন, উক্ত দ্বিমত ছিল তাঁদের বুঝার ভুলের কারণে, যে ভুলের জন্য তাঁরা পরবর্তীতে অনুতাপ করেছেন।

সুতরাং, এ ক্ষেত্রে ঐ চুক্তির রেফারেন্স টানা সঙ্গত নয়।

মন্ত্রীত্ব গ্রহণের পক্ষে যে দ্বিতীয় যুক্তিটি দেয়া হয়, তা হলো মদীনা সনদ। বলা হয়ে থাকে রাসূল সা. ইহুদীদেরকে সাথে নিয়ে মদীনা রাষ্ট্র গঠন করেছিলেন। সুতরাং, সে অনুসারে অনৈসলামিক দলের সাথে সরকার গঠনে কোনো আপত্তির কারণ নেই।

মদীনা সনদের ধারাসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এই মন্ত্রীত্ব নেয়ার সাথে উক্ত মদীনা সনদের কোনো সংশ্রব নেই। বরং রয়েছে ব্যাপক বৈসাদৃশ্য, যার কারণে এ কাজের পক্ষে মদীনা সনদের উদাহরণ উপস্থাপন করা সঙ্গত নয়। আমরা মদীনা সনদের ধারাসমূহ বিশ্লেষণ করলে সহজে বিষয়টি বুঝতে সক্ষম হব। নিম্নে প্রথমে মদীনা সনদের ধারাসমূহ উল্লেখ করা হলো। অতঃপর বিশেষ বিশেষ ধারার বিশ্লেষণ এবং এর সাথে আলোচ্য কার্যক্রমের সাদৃশ্য- বৈসাদৃশ্য আলোচনা করা হবে।

মদীনা সনদের ধারাসমূহ :

১. মদীনার ইয়াহুদী, পৌত্তলিক ও মুসলমানরা সকলে মিলিত হয়ে এক উম্মত হিসেবে বিবেচিত হবে।

২. এ জাতিসমূহের সকলেই ধর্মের বিষয়ে স্বাধীন থাকবে। একে অপরের ধর্মে হস্তক্ষেপ করবে না। ইয়াহুদী ও মুসলমানদের প্রত্যেকে নিজ নিজ ব্যয়ের ভার নিজেরা বহন করবে।

৩. এই চুক্তিভুক্ত কোনো সম্প্রদায় শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে সকলে সম্মিলিতভাবে তা প্রতিহত করবে।

৪. চুক্তিভুক্ত সকলে পরস্পরের কল্যাণ কামনা করবে। তবে এ কল্যাণ কামনা ও সহযোগিতা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে- অন্যায়ভাবে নয়।

৫. কেউ অপরাধ করলে এটা তার ব্যক্তিগত অপরাধ বলে গণ্য হবে, কোনো ব্যক্তি তার মিত্রের কারণে অপরাধী বিবেচিত হবে না।

৬. মজলুমকে রক্ষা করতে হবে।

৭. যুদ্ধ চলাকালীন ব্যয়ভার মুসলমানদের সাথে ইয়াহুদীরাও বহন করবে।

৮. চুক্তি উত্তর মদীনায় রক্তপাত নিষিদ্ধ বলে গণ্য হবে।

৯. মুহাম্মদ সা. এই সাধারণ তন্ত্রের প্রধান হবেন। এই চুক্তির অন্তর্ভুক্তদের মধ্যে কোনো নতুন সমস্যা দেখা দিলে বা ঝগড়া-বিবাদ হলে, আল্লাহ্‌র আইন অনুযায়ী রাসূলে কারীম সা. তার মীমাংসা করবেন।

১০. কোনো সম্প্রদায় কুরায়েশদের সাথে কোনো প্রকার গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হবে না এবং তাদের কোনো ব্যক্তিকে আশ্রয় দেবে না।

১১. যারা এই চুক্তি ভঙ্গ করবে, তাদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ।

একটু সুক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকালে দেখা যাবে, এ চুক্তির অধিকাংশ ধারা নীতি উক্ত বিষয়ের পরিপন্থী। বিশেষ করে ৯ম অনুচ্ছেদে উল্লেখিত মূল ধারার সাথে এ বিষয়টি সাংঘর্ষিক। এই ধারায় বলা হয়েছে মুহাম্মদ সা. হবেন উক্ত জোটের মূল নায়ক বা নেতা, অপরদিকে এক্ষেত্রে মূল নায়ক হয়ে থাকেন বাতিল দলের প্রধান। সুতরাং, মূলগত দিক থেকে উভয় ঘটনা সম্পূর্ণ বিপরীত মুখী।

দ্বিতীয়ত: উক্ত ধারা অনুসারে সকল সমস্যার সমাধানকারী হলেন রাসূল আকরাম সা. অর্থাৎ ইসলামী পক্ষ হলো নেতা ও অন্যান্যরা অনুসারী। অপরদিকে এ ক্ষেত্রে সমস্যার সমাধানকারী হয়ে থাকে বাতিল দলের প্রধান। সুতরাং, কুফরী শক্তি হলো অনুসৃত আর ইসলামী দল হলো অনুসারী।

তৃতীয়ত: সকল সমস্যার সমাধানের মূল ভিত্তি হলো আল্লাহ্‌র আইন। অপরদিকে কোয়ালিশন সরকারের সকল সমস্যা সমাধানের মূল ভিত্তি হলো মানুষের আইন।

সুতরাং, মদীনা সনদের উল্লেখিত ধারার মৌলিক নীতির সাথে এ বিষয়টি সাংঘর্ষিক। আর তাই মদীনা সনদ এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে না। মদীনা সনদ তখন উদাহরণ হিসাবে পেশ করা যেতো, যদি ইসলামী দল কোয়ালিশনে যোগ দিয়ে অনৈসলামিক আইনে দেশ পরিচালনায় অংশ নেয়ার পরিবর্তে, শরীকদের সাথে এমন একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হতো, যে চুক্তি বলে ইসলামী দল স্বাধীনভাবে নিজস্ব স্বকীয়তা বজায় রেখে আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করার সুযোগ পায় এবং স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে কোনো বাধার সম্মুখীন হলে শরীক দল সহযোগিতা করতে বাধ্য থাকে।

হিকমত : এ ধরনের সিদ্ধান্ত হিকমতের মধ্যেও পড়ে না। যে সকল বিষয় শরীয়া সমর্থন করে না এবং রাসূল সা. এর জীবন ও আদর্শের সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, সে সকল কাজকে দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য হিকমত হিসেবে করা হয়েছে বলে বর্ণনা করার কোনো অবকাশ নেই। এতে কর্মী ও মধ্যমানের নেতাদেরকে স্বাভাবিক রাখা যায় বটে কিন্তু প্রকৃত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে অদূর ভবিষ্যতে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

উল্লেখিত মন্ত্রীত্ব গ্রহণ ও তাগুত সরকারের সাথে একাকার হয়ে যাওয়া যেহেতু রাসূল সা. এর জীবন ও আদর্শের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, এ কাজকে দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে একটি হিকমত হিসাবে উল্লেখ করা যায় না।

কালামে হাকীমে হিকমত বলতে কী বুঝানো হয়েছে, তা আমরা প্রথমে বুঝবো। অত:পর এ বিষয়ে আমাদের কর্মপন্থা স্থির করবো। উল্লেখিত আয়াতটির বিষয়ে নিচে বিখ্যাত দুটি তাফসীর গ্রন্থের ব্যাখ্যা হুবহু তুলে ধরা হলো:
বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ তাফহীমূল কুরআনে সূরা আন্ নাহ্‌ল এর ১২৫তম আয়াতের অনুবাদ করা হয়েছে–

'হে নবী! প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা এবং সদুপদেশ সহকারে তোমার রবের পথের দিকে দাওয়াত দাও।'

এবং এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে–

'অর্থাৎ, দাওয়াত দেবার সময় দুটি জিনিসের প্রতি নজর রাখতে হবে। এক. প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা এবং দুই. সদুপদেশ। জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার মানে হচ্ছে, নির্বোধদের মত চোখ বন্ধ করে দাওয়াত প্রচার করবে না, বরং বুদ্ধি খাটিয়ে যাকে দাওয়াত দেয়া হচ্ছে, তার মন-মানস, যোগ্যতা ও আস্থার প্রতি নজর রেখে এবং এ সঙ্গে পরিবেশ পরিস্থিতি বুঝে কথা বলতে হবে। একই লাঠি দিয়ে সবাইকে তাড়িয়ে নেয়া যাবে না। যে কোনো ব্যক্তি বা দলের মুখোমুখি হলে প্রথমে তার রোগ নির্ণয় করতে হবে। তারপর এমন যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে তার রোগ নিরসনের চেষ্টা

করতে হবে, যা তার মন-মস্তিষ্কের গভীরে প্রবেশ করে তার রোগের শিকড় উপড়ে ফেলতে পারে।

সদুপদেশের দু'টি অর্থ হয়। এক. যাকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে, তাকে শুধুমাত্র যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে তৃপ্ত করে দিয়ে ক্ষান্ত হলে চলবে না, বরং তার আবেগ-অনুভূতির প্রতিও আবেদন জানাতে হবে। দুষ্কৃতি ও ভ্রষ্টতাকে শুধুমাত্র বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে বাতিল করলে হবে না। বরং মানুষের প্রকৃতিতে এসবের বিরুদ্ধে যে জন্মগত ঘৃণা রয়েছে তাকেও উদ্দীপ্ত করতে হবে এবং সেগুলোর অশুভ পরিণতির ভয় দেখাতে হবে। ইসলামের দীক্ষা গ্রহণ ও সৎকাজে আত্মনিয়োগ শুধু যে ন্যায়সঙ্গত ও মহৎ গুণ, তা যৌক্তিকভাবে প্রমাণ করলে চলবে না। বরং সেগুলোর প্রতি আকর্ষণও সৃষ্টি করতে হবে। দুই. উপদেশ এমনভাবে দিতে হবে যাতে আন্তরিকতা ও মঙ্গলাকাঙ্খা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। যাকে উপদেশ দান করা হচ্ছে সে যেন একথা মনে না করে যে, উপদেশদাতা তাকে তাচ্ছিল্য করছে এবং নিজের শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতির স্বাদ নিচ্ছে। বরং সে অনুভব করবে উপদেশ দাতার মনে তার সংশোধনের প্রবল আকাঙ্খা রয়েছে এবং আসলে সে তার ভালো চায়।'

উল্লেখিত আয়াত সম্পর্কে বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ মা'রেফুল কুরআনে যে ব্যাখ্যা রয়েছে, তা নিম্নরূপ–

আলোচ্য ১২৫তম আয়াতে দাওয়াত ও প্রচারের পূর্ণাঙ্গ কর্মপন্থা, মূলনীতি ও শিষ্টাচারের পূর্ণ বিবরণ অল্প কথায় বিধৃত হয়েছে।

হিকমত (حِكْمَةِ) শব্দটি কুরআনে অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ স্থলে কোনো কোনো তাফসীরবিদ হিকমতের অর্থ কুরআন, কেউ কুরআন ও সুন্নাহ এবং কেউ কেউ অকাট্য যুক্তি প্রমাণ স্থির করেছেন। রুহুল মা'আনী, বাহ্‌রে মুহীতের বরাত দিয়ে হিকমতের তাফসীর করেছেন। এমন বিশুদ্ধ বাক্যকে হিকমত বলা হয়, যা মানুষের মনে আসন করে নেয়। এ তাফসীরের মধ্যে সব উক্তি সন্নিবেশিত হয়ে যায়। রুহুল বায়ানের গ্রন্থকারও প্রায় এই অর্থটিই এরূপ ভাষায় বর্ণনা করেছেন : হিকমত বলে সে অর্ন্ত:দৃষ্টিকে বোঝানো হয়েছে, যার সাহায্যে মানুষ অবস্থার তাগিদ জেনে নিয়ে তদনুযায়ী কথা বলে। এমন সময় ও সুযোগ খুঁজে নেয় যে, প্রতিপক্ষের উপর বোঝা হয় না। নম্রতার স্থলে নম্রতা এবং কঠোরতার স্থলে কঠোরতা অবলম্বন করে। যেখানে মনে করে যে, স্পষ্টভাবে বললে প্রতিপক্ষ লজ্জিত হবে, সেখানে ইঙ্গিতে কথা বলে কিংবা এমন ভঙ্গি অবলম্বন করে, যদ্দরুন প্রতিপক্ষ লজ্জার সম্মুখীন হয় না এবং তার মনে একগুয়েমিভাবও সৃষ্টি হয় না।

সুতরাং, আমরা উপরোক্ত আলোচনা হতে যা বুঝতে পারি তা হলো, হিকমত বলতে এমন একটি পদ্ধতিকে বুঝানো হয়েছে, যে পদ্ধতির মাধ্যমে দাওয়াত

দিলে, যাকে দাওয়াত দেয়া হচ্ছে, তার মনে সর্বাধিক প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু হিকমত বলতে এমন কোনো পন্থা অবলম্বন করাকে বুঝায় না, যে পন্থায় শরীয়তের কোনো মৌলিক বিষয় সম্পর্কে ছাড় দেয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় বা শরীয়তের সীমার বাইরে অবস্থান করে কোনো কিছু করতে হয়।

অতএব এ আয়াত এমন কোনো কাজকে জায়েজ করার জন্য উপস্থাপন করা মোটেও উচিত হতে পারে না, যে সকল কাজ করার জন্য রাসূল সা. নিষেধ করেছেন, যা রাসূল সা. নিজে করা হতে বিরত থেকেছেন। আর তাই আমি মনে করি ইসলামী দল কর্তৃক তাগুত সরকারের মন্ত্রীত্ব গ্রহণের বিষয়টি এ আয়াত দ্বারা জায়েজ প্রমাণিত হয় না। ইসলামী দল সংশয়পূর্ণ কর্ম-পদ্ধতির অনুসরণের পরিবর্তে তাক্ওয়ার নীতি অবলম্বন করলে মানুষের কাছে নিজের কাজের যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়ার প্রয়োজন হবে না।

এই একটি বিষয়ে যে নাতি দীর্ঘ আলোচনা করা হলো, তার উদ্দেশ্য হলো প্রতিটি ইসলামী দলের পরিশুদ্ধতা অবলোকন করার সুযোগ লাভ করা, যাতে করে কোনো ইসলামী দলের বিরোধিতা করার প্রকৃত সুযোগ কেউ না পায়।

কোন ইসলামী দল যদি এমন সব কাজ করতে থাকে, যা তাক্ওয়ার নীতির পরিপন্থী, তবে মানুষের জন্য এ দল হতে বিরত থাকার যথেষ্ট সুযোগ থাকবে। মাওলানা মওদূদী (রাহ.) এর জীবনে এর একটি উদাহরণ পাওয়া যায়। তদানিন্তন পাকিস্তানে মুসলিম লীগ যখন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার প্রত্যয় ব্যক্ত করে কাজ করছিল, তখন মাওলানা মওদূদী (রাহ') এ দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে বিরত থেকে নতুন দল করার প্রচেষ্টা চালান এ যুক্তিতে যে, এ দলের নেতৃবৃন্দের মধ্যে যথার্থ ইসলামী ভাবধারার অভাব রয়েছে এবং দলের কতিপয় কার্যকলাপ ইসলামী আদর্শ ও নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে হয় না, যা দলের ঘোষণানুসারে ভবিষ্যতে ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের বিষয়ে সন্দেহের সৃষ্টি করে। মাওলানা মওদূদী (রাহ.) বলেছিলেন :

'আল্লাহ্র দ্বীনকে বিজয়ী করার আন্দোলনের জন্য প্রয়োজন এমন নেতৃত্ব, যারা সেসব নীতিমালা থেকে এক ইঞ্চিও বিচ্যুত হতে প্রস্তুত নয়, যেগুলো প্রতিষ্ঠার জন্যে ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছে। এই আদর্শিক দৃঢ়তার ফলে সকল মুসলমানকে যদি না খেয়েও মরতে হয়, এমনকি তাঁদেরকে যদি হত্যাও করা হয়, তবু তাঁদের নেতৃবৃন্দ বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি বরদাশত করতে প্রস্তুত হবে না।'

-ইসলামী হুকুমাত কিস্তরাহ কায়েম হুতী হ্যায়।

সুতরাং, ইসলামী দলসমূহকে এমন সব কাজ হতে বিরত থাকতে হবে, যা এমন সন্দেহ সৃষ্টি করবে যে, উক্ত ইসলামী দল কর্তৃক ভবিষ্যতে প্রকৃত ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে না।

এ বিষয়ে আলোচনার পর একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, এ আলোচনার ফলাফলকে আমি চূড়ান্ত বলে মনে করছি না। কুরআন ও সুন্নাহ অধ্যয়নে আমার যে বিশ্বাস হয়েছে তার আলোকে আমি এ বিষয়ে আমার আন্ডারষ্ট্যান্ডিং উল্লেখ করলাম। আপনাদের চিন্তা যদি আমার মতামতের সাথে মিলে যায়, তবে নিজ নিজ ইসলামী দলকে এহেন কাজ হতে বিরত রাখার জন্য চেষ্টা করুন। আর যদি আমার মতের বিপক্ষে কোনো শক্তিশালী সঠিক ফয়সালা পাওয়া যায় অনুগ্রহ পূর্বক আমাকে অবহিত করুন, আমি আমার মতামত প্রত্যাহার করবো ইনশাআল্লাহ্। আল্লাহ্ই উত্তম জ্ঞাত।

ইসলামী আন্দোলনকরী প্রতিটি কর্মীকে মনে রাখতে হবে, নিজ নিজ দলকে শরীয়া পরিপন্থি কাজ হতে বিরত রাখার চেষ্টা করতে হবে। কোনোভাবে যদি শরীয়া পরিপন্থী কাজ হতে বিরত রাখা না যায়, তবে অন্য দলের অন্বেষণ করা উচিত। যদি না পাওয়া যায়, তবে পৃথকভাবে আল্লাহ্র দ্বীন কায়েমের জন্য চেষ্টা-সাধনা করতে হবে। ন্যায়ের পথে যদি একজনও ডাকে, তবে একজনও একটি দল হতে পারে। আর বৃহৎ দলের মধ্যেও যদি অন্যায়ের অনুপ্রবেশ ঘটে, তবে সে দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ারও কোনো বাধ্যবাধকতা থাকে না।

তবে সব সিদ্ধান্তই নিতে হবে খুব বুঝে শুনে। সর্ব প্রথম বুঝে নিতে হবে আপনি যে মতটি পোষণ করছেন, কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে তা কতটুকু সঠিক।

কোয়ালিশন সরকারের অংশগ্রহণকারী সংগঠন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত মূল্যায়ন হলো, দলটি সত্যিকার অর্থে একটি নিয়মতান্ত্রিক দ্বীনি সংগঠন। এর নেতৃত্বে যারা আছেন, তাঁরা ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে থেকে খালেছভাবে দ্বীন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কল্যাণ মনে করে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে আমি মনে করি। আমি এও মনে করি, মানুষের সংগঠন ভুলের উর্ধ্বে নয়। তবে সত্যিকার দ্বীনি সংগঠন ভুল সংশোধনে থাকে সর্বদাই পূর্ণ প্রস্তুত। এ সংগঠনটিও তার ব্যতিক্রম নয়। শত ভালো ও সঠিক কাজের কারণে এ দলটি যথার্থ। আমি বিশ্বাস করি কোয়ালিশন সরকারে অংশ নেয়ার বিষয়টি ভুল বলে অনুভূত হলে, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী এ নীতি হতে অচিরেই সরে আসবেন ইনশাআল্লাহ। আর উপরোক্ত আলোচনা সঠিক হলে, অর্থাৎ মন্ত্রীত্ব গ্রহণের সিদ্ধান্তটি ভুল হিসেবে গণ্য হলেও এর জন্য জামায়াতে ইসলামী দল হিসেবে

পরিত্যজ্য নয়। কেননা, মানুষের তৈরি সংগঠন ভুলের উর্ধ্বে থাকবে, তা সম্ভব নয়। দু'একটি ভুল চিহ্নিত করে সমগ্র ইসলামী দলের বিরুদ্ধে লেগে যাওয়াও একটি ভ্রান্তি। এক্ষেত্রে রাসূল সা. এর সময়ের একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। আবু বকর ছিদ্দিক রা. এবং ওমর ফারুক রা. এর সাথে তাক্ওয়া, ইসলামী জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দিক থেকে তুলনা যোগ্য কোনো মুসলমান বর্তমান যুগে থাকা সম্ভব নয়। বদর যুদ্ধে বন্দীদের বিষয়ে রাসূল সা. উভয়ের কাছে মতামত চাইলে উভয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত মতামত উপস্থাপন করেন। সীরাত গ্রন্থে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সা. মদীনায় পৌঁছার পর সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে অবশিষ্ট যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে পরামর্শ করলেন। আবু বকর সিদ্দিক রা. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, ওরাতো চাচাতো ভাই এবং আমাদের আত্মীয়স্বজন। আমার মতে আপনি ওদের কাছ থেকে ফিদিয়া অর্থাৎ, মুক্তিপণ নিয়ে ওদের ছেড়ে দিন। এতে করে যা কিছু নেয়া হবে, সেসব কাফেরদের বিরুদ্ধে আমাদের শক্তি হিসাবে কাজে আসবে। এমনও হতে পারে যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁদের হেদায়াত দেবেন এবং তারা আমাদের পাশে এসে দাঁড়াবে।

রাসূলুল্লাহ সা. ওমর ইবনে খাত্তাব রা. এর মতামত জানতে চাইলেন। তিনি বললেন, আমি আবু বকর রা. এর মতের ভিন্ন মত পোষণ করি। আমি মনে করি যে, আপনি আমার আত্মীয় অমুককে আমার হাতে তুলে দিন, আমি তার শিরচ্ছেদ করবো। একইভাবে আকীল ইবনে আবু তালেবকে আলী রা. এর হাতে তুলে দিন, আলী তার শিরচ্ছেদ করবেন। একইভাবে হামযার ভাই অমুককে হামযার হাতে তুলে দিন, হামযা তার শিরচ্ছেদ করবেন। এতে আল্লাহ তায়ালা বুঝতে পারবেন যে, কাফেরদের জন্যে আমাদের মনে সমবেদনা নেই। এ সকল যুদ্ধবন্দি হচ্ছে কাফেরদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ।

ওমর (রা.) বলেন, রাসূল সা. উভয়ের কথা শোনার পর আবু বকর রা. এর পরামর্শ গ্রহণ করেন, আমার পরামর্শ গ্রহণ করেননি। ফলে কয়েদীদের কাছ থেকে ফিদিয়া গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। পরদিন খুব সকালে আমি আল্লাহর রসূলের কাছে গিয়ে দেখি, তিনি এবং হযরত আবু বকর উভয়ে কাঁদছেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আপনারা কেন কাঁদছেন, আমাকে বলুন। যদি কান্নার কারণ ঘটে থাকে, তবে আমিও কাঁদবো। যদি কারণ না ঘটে, তবে আপনাদের কান্নার কারণে আমিও কাঁদবো। রাসূল সা. বললেন, ফিদিয়া দেয়ার শর্ত গ্রহণ করার কারণে তোমার সঙ্গীদের ওপর যে জিনিস পেশ করা হয়েছে, সেই কারণে কাঁদছি। একথা বলে রাসূলুল্লাহ সা. নিকটবর্তী একটি গাছের প্রতি ইশারা করে বললেন, আমার কাছে ওদের আযাব এই গাছের চেয়ে নিকটতর করে পেশ করা

হয়েছে। আল্লাহ্ তায়ালা এই আয়াত (সূরা আনফাল, আয়াত ৭৬-৬৮) নাযিল করেছেন;

নবীর পক্ষে উচিত নয় বন্দীদিগকে নিজের কাছে রাখা, যতক্ষণ না দেশময় প্রচুর রক্তপাত ঘটাবে। তোমরা পার্থিব সম্পদ কামনা করো, অথচ আল্লাহ চান আখেরাত। আর আল্লাহ হচ্ছেন পরাক্রমশালী হেকমতওয়ালা।

যদি একটি বিষয় না হতো, যা পূর্ব থেকেই আল্লাহ লিখে রেখেছেন, তাহলে তোমরা যা গ্রহণ করছ সেজন্য বিরাট আযাব এসে পৌঁছাত।

–আর রাহীকুল মাখতুম

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীর ইবনে কাসীরে এসেছে; আলী রা. বলেন,জিব্রীল আ. এসে বলেন: 'হে রাসূল সা.! আপনার সাহাবীদেরকে ইখতিয়ার দিন যে, তাঁরা দুটোর মধ্যে যে কোনো একটি গ্রহণ করতে পারেন। হয় তাঁরা মুক্তিপণ নিয়ে বন্দিদেরকে ছেড়ে দেবেন, না হয় তাদেরকে হত্যা করে ফেলবেন। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে, মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়া হলে, আগামী বছর বন্দীদের সমান সংখ্যক মুসলমান শহীদ হয়ে যাবেন।" সাহাবীগণ বলেন যে, তাঁরা প্রথমটিই গ্রহণ করলেন এবং বন্দীদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেবেন।

এই বদরী বন্দিদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন: 'হে সাহাবীর দল! যদি চাও, তবে মুক্তিপণ আদায় করে তাদেরকে ছেড়ে দাও। অথবা ইচ্ছা করলে হত্যা করে দাও। কিন্তু মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দিলে, তাদের সমান সংখ্যক তোমাদের লোক শহীদ হয়ে যাবে।'

উল্লেখ্য, পরবর্তীতে ওহুদ যুদ্ধে আল্লাহ্ সত্তর জন সাহাবীকে শহীদ হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

উপরোক্ত ঘটনা হতে আমাদের জন্য শিক্ষনীয় হলো, রাসূল সা. এর দুই জন শ্রেষ্ঠ সাহাবী একই বিষয়ে বিপরীত মত প্রকাশ করেছিলেন। আবু বকর রা. এর মতামতটি রাসূলুল্লাহ সা. গ্রহণ করেছিলেন। অপরদিকে ওমর রা. এর মতের পক্ষে আল্লাহ্র পক্ষ হতে ওহী এসেছিল। উভয় মতের বিষয়ে কোনো নেতিবাচক ধারণা পোষক করার কোনো অধিকার কোনো মানুষের নেই।

পুনরায় প্রসঙ্গে ফিরে আসি, মন্ত্রীত্ব নেয়ার বিষয়ে জামায়াতে ইসলামীও হয়তো দ্বিধান্বিত ছিল, যার কারণে খতিব ওবায়েদুল হক র. এর সমন্বয়ে গঠিত দেশের শীর্ষ আলেমদের নিকট হতে সম্মতি বা মতামত গ্রহণ করে মন্ত্রীত্ব নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে বলে জমায়াতের তৎকালীন আমীর উনার 'ক্ষমতার রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ও ইসলামী আন্দোলন' শীর্ষক বইতে উল্লেখ করেছেন। যেহেতু দেশের

শীর্ষ স্থানীয় আলেমগণ এ বিষয়ে সম্মতি দিয়েছেন, আমি এ সিদ্ধান্তকে নিশ্চিত ভুল হিসেবে দাবি করতে প্রস্তুত নই। আবার যেহেতু কুরআন ও সুন্নাহ্ ও সিরাত হতে আমি এই সিদ্ধান্তের প্রতিকূলে দলিল পাচ্ছি, সেহেতু এ বিষয়ে ভবিষ্যতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সতর্কতার জন্য বিষটির উল্লেখ করাকেও সঙ্গত মনে করছি। সবকিছু বিবেচনা করে ইসলামী দলসমূহ ভবিষ্যতে এ বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেবেন এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

গণতন্ত্র, গণনির্বাচন, গণবিক্ষোভের মাধ্যমে ইসলামী বিপ্লব

বর্তমানে যারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার কথা বলছেন তাদের কেউ বলছেন, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার কথা, আবার কেউ বলছেন গণতন্ত্র ইসলামে হারাম, সুতরাং তাকে চূড়ান্তভাবে অস্বীকার করে গণবিক্ষোভের মাধ্যমে ইসলামী বিপ্লব সাধন করতে হবে। গণতন্ত্র ইসলামে হারাম একথা সত্য, তবে আমার মনে হয়, যারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কথা বলেন তারা সম্ভবত: গণতন্ত্র বলতে গণনির্বাচনকে বুঝিয়ে থাকেন। আর বর্তমান কালের মতো গণভোট ইসলামী যুগে সম্পন্ন না হলেও গণনির্বাচন একটি ইসলাম সমর্থিত পদ্ধতি। কিন্তু গণবিক্ষোভ এবং পর্যায়ক্রমে সশস্ত্র বিপ্লবের যে ধারণা উপস্থাপন করা হচ্ছে, তার কোনো সমর্থন ইসলামে নেই। এ বিষয়সমূহ বুঝার জন্য আমাদেরকে জানতে হবে গণতন্ত্র কি, বর্তমানের উত্থাপিত গণবিক্ষোভ তথা সশস্ত্র বিপ্লবের ধারণা এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠায় রাসূল সা. কর্তৃক প্রদর্শিত পদ্ধতি, অতঃপর বর্তমানকালের গণনির্বাচন ও ইসলামের খলিফা নিয়োগের পদ্ধতি।

গণতন্ত্র

গণতন্ত্রের শাব্দিক বিশ্লেষণ হলো : 'গণ' অর্থ জনসাধারণ আর 'তন্ত্র' অর্থ হলো মতবাদ, মতাদর্শ, একটি নিয়ম-নীতি, কর্মনীতি বা কর্মপদ্ধতি। সুতরাং, গণতন্ত্র শব্দের শাব্দিক অর্থ দাঁড়ায়, জনসাধারণের মতাদর্শ বা জনসাধারণের মতবাদ। এই অর্থে এই মতবাদের মূল বক্তব্য দাঁড়ায়, দেশের জনসাধারণ যা কিছুকে ভালো মনে করবে, তা-ই গ্রহণযোগ্য আর যা কিছুকে ভালো মনে করবে না, তা গ্রহণযোগ্য নয়।

গণতন্ত্র বা ডেমোক্রেসী শব্দটি এসেছে গ্রীক শব্দ ডেমোক্রেসিয়া থেকে, যার অর্থ জনগণের শাসন। এখানে ডেমোস অর্থ জনগণ, আর ক্রাটোস অর্থ ক্ষমতা। এখানে গণতন্ত্র হলো কোনো রাষ্ট্রের এমন একটি শাসনব্যবস্থা, যেখানে প্রত্যেক নাগরিকের নীতিনির্ধারণ বা সরকারি প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে সমান ভোট বা অধিকার আছে। গণতন্ত্রে আইন প্রস্তাবনা, প্রণয়ন ও তৈরির ক্ষেত্রে সকল নাগরীকের সরাসরি বা নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে অংশগ্রহণের সমান সুযোগ রয়েছে।

আব্রাহাম লিঙ্কন এর মতে গণতন্ত্র হলো–

Of the people, by the people, for the people.

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জন সাধারণ নিজেদের মতে যে আইনকে নিজেদের জন্য ভালো মনে করবে, তা গ্রহণ বা তৈরি করে নেবে, আর যে আইনকে ভালো মনে করবে না, তা গ্রহণ করবে না। অর্থাৎ, গণতন্ত্র বলতে এমন একটি ব্যবস্থাকে বুঝায়, যেখানে মানুষ মানুষের জীবন-বিধান রচনা করে। অপরদিকে আল্লাহ্ ইসলামকে মানুষের একমাত্র জীবন-বিধান হিসেবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যারা ইসলামকে জীবন-বিধান হিসেবে গ্রহণ করে নেবে, তাঁরাই হলো মুসলমান। আর যে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো জীবন-বিধান গ্রহণ করে নেবে, সে মুসলমান নয়। যেহেতু গণতন্ত্রও একটি জীবন-বিধান, সেহেতু যারা গণতন্ত্রকে সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করে নেবে, তারা ইসলাম এর সীমা হতে বের হয়ে যায়। সুতরাং, ইসলামে গণতন্ত্রের স্বীকৃতি মোটেও নেই।

গণবিক্ষোভ বা সশস্ত্র বিপ্লব : ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য এ পদ্ধতির অনুসরণ খুব সম্ভব ইসলামসম্মত নয়। এ পদ্ধতির প্রবক্তাগণ কোথা হতে এ সূত্র আবিস্কার করলেন তাও আমার জানা নেই। এ সূত্রে বলা হয়ে থাকে, দেশের জনসাধারণ ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার দাবিতে রাজপথে নেমে আসবে। ক্রমান্বয়ে তাঁদের সাথে দেশের সকল জনসাধারণ এই দাবিতে একত্রিত হবে। এক সময় তারা প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাকে চূড়ান্তভাবে অস্বীকার করবে। সরকারকে করো দেয়া বন্ধ করবে। বিভিন্নভাবে অসহযোগিতা করবে। যখন জনসাধারণের বিরাট অংশ রাস্তায় নেমে আসবে, তখন সরকারের ভিত কেঁপে উঠবে এবং হয়তো সরকার তাঁদের উপর দমন নীতি চালাতে পারে। সে অবস্থায় তারা সরকারের দমন নীতিকে প্রতিহত করার জন্য প্রয়োজনে অস্ত্র হাতে তুলে নেবে। জনসাধারণের বিক্ষোভের মুখে সরকারের পতন ঘটবে। তখন দেশের শাসনভার বিক্ষোভকারীদের হাতে এসে যাবে, তখন তারা দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করবে।

বিক্ষোভপন্থী লোকদের এ ধারণা যেমন ইসলামসম্মত নয়, তেমনি বাস্তবধর্মীও নয়। তারা হয়তো এ ধারণার বশবর্তী হয়ে এ পদ্ধতির কথা বলেন যে, এ দেশের প্রায় নব্বই ভাগ মানুষই মুসলমান। আর তাঁদের প্রাণের দাবি হলো ইসলাম প্রতিষ্ঠা। অথচ এ পরিসংখ্যানগত মুসলমানদের অধিকাংশই যে ইসলামের মৌলিক নীতি সম্পর্কে জ্ঞাত নয়, সে ধারণাও তাদের নেই। তাদের জানা উচিত রাসূল সা. কতিপয় মানুষ ঈমান গ্রহণ করেছি বললে তাদেরকে নিয়ে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামে নেমে পড়েননি। যখন মানুষ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে তখন তাদেরকে কুরআনের আলোকে প্রশিক্ষণ দিয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ী ও যোগ্য মুসলমান হিসেবে তৈরি করে নিয়েছেন। এভাবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রকৃত মুসলমানের সংখ্যা যখন গরিষ্ঠতা লাভ করে, তখনই তিনি

রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করেন। সুতরাং, মুসলমানদের ভাসা ভাসা জ্ঞান সম্বলিত আবেগ কাজে লাগিয়ে তাদেরকে দিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় এবং কোনোভাবে একটি অভ্যুত্থান করা সম্ভব হলেও দীর্ঘ মেয়াদে তা ধরে রাখা সম্ভব নয়।

গণ নির্বাচন

যারা বর্তমানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কথা বলেন, তারা গণনির্বাচনকে গণতন্ত্র মনে করে মূলত: গণনির্বাচনের মাধ্যমে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার কথা বলে থাকেন। গণতন্ত্র ইসলামে অনুমোদিত না হলেও গণনির্বাচন ইসলামে হারাম নয়। গণনির্বাচন হলো গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিনিধি নিয়োগের একটি প্রক্রিয়া মাত্র। এ প্রক্রিয়াটি ইসলামেও স্বীকৃত। গণনির্বাচন গণতন্ত্রের অনুসৃত একটি পদ্ধতি বলে এটি হারাম নয়। যেমন- মিথ্যা কথা বলা ইসলাম ধর্মে হারাম আবার হিন্দু ধর্মেও পাপ। এখানে হিন্দু ধর্মে মিথ্যা বলা নিষেধ বলে ইসলাম ধর্মে এটি হালাল হয়ে যায় না। আবার মাছ খাওয়া হিন্দু ধর্মে বৈধ আবার ইসলাম ধর্মেও হালাল। হিন্দু ধর্মে বৈধ বলে এটি ইসলাম ধর্মে হারাম হয়ে যায় না। একইভাবে শাসক নিয়োগে গণনির্বাচন গণতন্ত্রের একটি পদ্ধতি বলে এটি ইসলামে হারাম নয়। বর্তমান কালের ন্যায় গণভোট বা গণনির্বাচন ইসলামী যুগে না থাকলেও এর সমর্থনসূচক পদ্ধতিতেই খলিফা নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং ইসলামও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অধিকাংশ জনসাধারণ মুসলমান হওয়ার পরে। যখন আরবের অধিকাংশ মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছিল, তখনই ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তবে তখন গনভোটের কোনো প্রয়োজন ছিল না। কারণ, লোক সংখ্যা এতই কম ছিল যে, মুসলমান ও অমুসলমান দুই পক্ষের কোন পক্ষে কে অবস্থান করছে, তা সকলেই জ্ঞাত ছিল।

বর্তমানেও ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্য এর পক্ষে প্রথমে সংখ্যা গড়িষ্ঠ জনমত তৈরি করতে হবে। মনে রাখতে হবে, বর্তমানে পরিসংখ্যানগত হিসেবে বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে প্রায় ৯০% মুসলমান হলেও ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব বুঝে এবং এর পক্ষে সমর্থন দেবে, এরূপ লোকের সংখ্যা ৯০% নয়। যখন দেশের অধিকাংশ মানুষ ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার পক্ষে আসবে, তখনই হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হবে। আর তাই দেশের লোকসংখ্যার কতো অংশ ইসলামী হুকুমত চায় তা পরিমাপ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বর্তমানকালে এ দেশের লোক সংখ্যা প্রায় ১৭-১৮ কোটি। এ অবস্থায় মানুষের মেন্ডেট যাচাই করার জন্য গণভোটের

উপর নির্ভর করা যেতে পারে। গণভোট পদ্ধতিটি গণতন্ত্রের আবিস্কার হলেও গণভোট বলতে গণতন্ত্র বুঝায় না। গণতন্ত্র একটি জীবন-ব্যবস্থা, যা পরিপূর্ণভাবে ইসলাম বিরোধী। অপরদিকে গণনির্বাচন এমন একটি পদ্ধতি, যার দ্বারা অধিকাংশ মেন্ডেট কোনদিকে তা যাচাই করা যায়। রাসূল আকরাম সা. এর ওফাতের পর যে চারজন খলিফা দায়িত্ব পালন করেছেন, তাঁদের সবাই অধিকাংশ মুসলমানের মেন্ডেট দ্বারাই নির্বাচিত হয়েছিলেন। তখন বর্তমান সময়ের মতো গণনির্বাচন না হলেও তাঁদের হাতে মুসলমানদের বায়াত গ্রহণ তাঁদের পক্ষে সকল মুসলমানের মেন্ডেট প্রয়োগ বুঝায়। তখন লোকসংখ্যার স্বল্পতার কারণে ব্যক্তিগতভাবে বায়াত গ্রহণের মাধ্যমে সমর্থন জানানো সম্ভব ছিল। কিন্তু বর্তমানে লোক সংখ্যার আধিক্যের কারণে তখনকার মতো বায়াত গ্রহণের মাধ্যমে সমর্থন যাচাই করা অসম্ভব না হলেও বেশ কঠিন। সুতরাং, গণনির্বাচনের মাধ্যমে জনসমর্থন যাচাই কোনো দোষনীয় বিষয় নয়। বরং এর মাধ্যমে জনসমর্থন যাচাই করে রক্তপাতহীনভাবে গণতন্ত্র নামের ধর্মহীন জীবন-ব্যবস্থা নিরসন করে যদি ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যায়, তা-ই যথার্থ বলে মনে করি। সুতরাং, যে সকল ইসলামী দল ইসলামী হুকুমতের পক্ষে জনমত তৈরি করে গণনির্বাচনের মাধ্যমে সংখ্যা গরিষ্ঠতা প্রমাণ করে খিলাফত প্রতিষ্ঠা করতে চায় তাঁদের কর্মপন্থাকে ভ্রান্ত বলার কোনো অবকাশ নেই। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্রসহ সকল ধরনের তন্ত্র বা মতবাদ বিলোপ করে একমাত্র ইসলাম প্রতিষ্ঠাই যেহেতু এ সকল ইসলামী দলসমূহের মূল লক্ষ্য, সেহেতু 'গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে' কথাটি প্রয়োগের পরিবর্তে, গণনির্বাচনের বা গণরায়ের মাধ্যমে বা জনমতের ভিত্তিতে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চাই বলা যেতে পারে।

জঙ্গিবাদ ও ইসলাম

জঙ্গিবাদ এর আন্তর্জাতিক স্বীকৃত কোনো সংজ্ঞা নেই। তবে ১১ সেপ্টেম্বরে আমেরিকার টুইন টাওয়ারে হামলা, লন্ডনে আন্ডারগ্রাউন্ড বম্বিং, ২০০২ এর বালি বম্বিং, পাকিস্তান ও ভারতের হামলার মধ্যদিয়ে বিশ্বের সর্বত্র এবং বাংলাদেশে জেএমবি কর্তৃক বম্বিং ও মানুষ হত্যার মধ্যদিয়ে বাংলাদেশের এ বিষয়টি একবিংশ শতাব্দির প্রথম দশকে একটি বিশেষ আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। বিশেষ করে স্বার্থান্বেষী মহল এ অপরাধের জন্য ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি আঙ্গুল নির্দেশ করার প্রয়াস পেয়ে থাকে। এমতাবস্থায় আমাদের এ বিষয় জানা থাকা বিশেষ প্রয়োজন যে, জঙ্গিবাদ কী? জঙ্গিবাদের বিষয়ে ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং তার সম্ভাব্য মূল কারণ বা তার সম্ভাব্য পেছনের শক্তি কারা?

ঘটনাপ্রবাহ অবলোকনে মনে হয় মূলত: জঙ্গিবাদ হলো ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে কোনো লক্ষ্যার্জনের প্রক্রিয়া, যার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে হত্যা ও ধ্বংস। একবিংশ শতাব্দির প্রথম দুই দশকে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কতিপয় বিপথগামী মানুষ ইসলাম ধর্মের লেবাস পড়ে এ প্রক্রিয়ায় জিহাদ ও ইসলাম প্রতিষ্ঠার কথা বলেছে। সত্যিকারার্থে এরা একটি বিপথগামী গোষ্ঠী। এরা কোনোভাবে ইসলামের পক্ষ শক্তি নয়। বরং ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে ব্যবহৃত নির্বোধ হাতিয়ার বা ইসলামের শত্রু। এরা বিপথগামী এ কারণে যে, ইসলামে জঙ্গিবাদ চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ, আর এটি ষড়যন্ত্র এ কারণে যে, এর মাধ্যমে ইসলামের সব থেকে বেশি ক্ষতি সাধন করা হয়েছে।

জঙ্গিবাদীরা নির্বিচারে মানুষ হত্যাকে বৈধ মনে করে, অথচ ইসলামে এ ধরনের হত্যাকারীদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের ঘোষণা। যেমন–

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ۛ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَ مَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَاۤ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ

আমি বনী-ইসরাইলের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, যে কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ছাড়া কাউকে হত্যা করে, সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করে এবং যে কারো জীবন রক্ষা করে, সে যেন সবার জীবন রক্ষা করে।
–সূরা আল-মায়েদাহ: ৩২

وَ مَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيْهَا وَ غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهٗ وَ اَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا ۹۳

'যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে মুসলমানকে হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম, তাতেই সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্য ভীষণশাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।' –সূরা আন-নিসা: ৯৩

وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقّ

সে প্রাণকে হত্যা করো না, যাকে আল্লাহ্ হারাম করেছেন; কিন্তু ন্যায়ভাবে।

–সূরা বনী ইসরাইল: ৩৩

রাসূল সা. দ্বীনের প্রচারে যখন আত্মনিয়োগ করেন, তখন তিনিসহ তাঁর সাহাবাগণ রা. বিভিন্নভাবে জুলুম-নিপীড়ন অত্যাচার-নির্যাতনের শিকার হন। রাসূল সা. এর প্রতি হাসি-ঠাট্টা, বিদ্রুপ-উপহাস এবং যাদুকর ও মিথ্যাবাদী হওয়ার অপবাদ আরোপ করা হয়। এমনকি জুলুম-নির্যাতন জোরদার করার লক্ষ্যে আবু লাহাবকে প্রধান করে কমিটি গঠন করা হয়। তারা রাসূলের সা. দরজায়, চলার পথে কাঁটা বিছাতো, গালাগাল করতো। রাসূল সা. যখন নামাজ আদায় করতেন, তারা রাসূলের সা. গায়ে বকরির নাড়িভুড়ি ছুড়ে মারতো। একদা রাসূল সা. কাবার পাশে নামাজ আদায় করছিলেন, তিনি যখন সিজদায় গিয়েছিলেন, তখন আবূজেহেলের নির্দেশে ওকবা ইবনে আবু মুঈত উটের নাড়িভুড়ি রাসূল সা. এর উভয় কাঁদের দু'দিকে ঝুলিয়ে দিয়েছিল।

ইসলাম গ্রহণের পর বেলাল রা. কে উচ্ছৃঙ্খল বালকদের দ্বারা গলায় দড়ি বেঁধে ঘুরানো হতো, নির্মম প্রহার করা হতো এবং উত্তপ্ত বালির উপর শুইয়ে রাখতো।

খাব্বাব রা. কে মাটির উপর টানা হতো, মাথার চুল ধরে ঘাড় মটকে দেয়া হয়েছিল এবং কয়েকবার জ্বলন্ত কয়লার উপর তাঁকে শুইয়ে দিয়ে বুকে পাথর চাপা দিয়ে রাখা হয়েছিল।

এভাবে পৌত্তলিকরা এক বীভৎস উপায়ে ইসলাম গ্রহণকারীদেরকে কষ্ট দিতো। তথাপিও রাসূল সা. অন্যায়ভাবে পৌত্তলিকদের প্রতি একটি ঢিল ছুড়ারও নির্দেশ দেননি।

পৌত্তলিকদের চরম জুলুম-নিপীড়ন অত্যাচার-নির্যাতনের শিকার হয়ে মুসলমানরা বিভিন্ন স্থানে হিযরত করতে শুরু করে এবং শেষতক কাফেররা রাসূল সা. কে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হয় এবং আল্লাহর নির্দেশে নবী সা. মদিনায় হিযরত করেন। তথাপিও তাদের ষড়যন্ত্র থেমে যায়নি। বরং তাদের প্রতিহিংসার আগুন আরও প্রবল বেগে জ্বলে উঠে, তারা চতুরমুখী ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলমানদের জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে। এমতাবস্থায় মদীনা রাষ্ট্রের সংরক্ষণ,

শান্তি ও স্থিতিশীলতা এবং ইসলামী দাওয়াতি কাজের স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখার স্বার্থে তাদের বিরুদ্ধে কতিপয় অভিযান চালানো হয়ে পরে অপরিহার্য। পৌত্তলিকদের সীমাহীন বাড়াবাড়ি, ষড়যন্ত্র আর চরম উদ্যতার ফলে কাফেরদের ইন্ধনে মদীনার অদূরে বদর, ওহুদ ও খন্দকের যুদ্ধ সংগঠিত হয়, যেখানে আল্লাহ মুসলমানদেরকে বিজয় দান করেছিলেন। যুদ্ধাবস্থায়ও রাসূল সা. ন্যায় ও আদর্শের অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

বদর যুদ্ধে যুদ্ধবন্দিদের মধ্যে ছিল ইসলামের বিরুদ্ধের এক সুদক্ষ বক্তা সোহায়েল ইবনে আমর। ওমর রা. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সা. সোহায়েল ইবনে আমরের সামনের দু'টি দাঁত ভেঙ্গে ফেলার ব্যবস্থা করুন, এতে তার কথা মুখে জড়িয়ে যাবে। এতে সে সুবক্তা হিসেবে আপনার বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়ে সুবিধা করতে পারবে না। রাসূল সা. উক্ত প্রস্তাব এ কারণে প্রত্যাখ্যান করেন যে, মানুষের অঙ্গহানী করা ইসলামী পরিভাষায় মোছলা করার শামিল। কেয়ামতের কঠিন দিনে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে।

মক্কা বিজয়ের পর রাসূল সা. বললেন, হে কোরায়েশরা তোমাদের ধারণা আমি তোমাদের সাথে কেমন ব্যবহার করবো? সবাই বললো ভালো ব্যবহার করবেন, এটাই আমাদের ধারণা। আপনি দয়ালু। এরপর তিনি বললেন, তাহলে আমি তোমাদেরকে সে কথাই বলছি, যে কথা ইউসুফ আ. তাঁর ভাইদের বলেছিলেন, লা তাছরিবা আলাইকুমুল ইয়াওমা। আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। সবাই মুক্ত।

অতএব এটাই প্রমাণিত হয় বর্তমানে জঙ্গিবাদ বলতে যা হচ্ছে, তা ইসলামে পরিপূর্ণ ভাবে পরিত্যজ্য এবং ইসলামী আদর্শের সম্পূর্ণ পরিপন্থি।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, যারা জঙ্গিবাদের সাথে জড়িত, তারা মুসলমান এবং তারা এর মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কথা বলছে, যদি এটা ইসলাম অনুমোদিত নাই হবে, তবে কেন তারা এ কাজ করছে?

এ প্রশ্নের সুনির্দিষ্ট উত্তর আমাদের কাছে নেই। কারণ যারা এ সব করেছে তারা জনবিচ্ছিন্ন বিপথগামী গোষ্ঠী হওয়ায় তাদের মুটিভ জানা সম্ভব নয়। তবে বর্তমান বিশ্বের ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা হতে একটা যৌক্তিক কারণ বিশ্লেষণ করা যায়।

বিংশ শতাব্দিতে ইসলামী পূনর্জাগরণের একটি আলোকচ্ছটা সকলের চোখে প্রতিভাত হয়েছে। এটা ইসলামের চির শত্রু, যারা ফিলিস্তিনী মুসলমানদেরকে নিজস্ব আবাসভূমি হতে বিতাড়িত করে বসতি স্থাপন করেছে, তাদের গাত্রদাহের

বড় কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। তাদের অনুভূতিতে এসেছে এখন যদি ইসলামের অগ্রযাত্রাকে প্রতিহত করা না যায়, তবে ইসলামের বিশ্বব্যাপি বিজয় অভিশ্যম্ভাবি, যার নিশ্চিত পরিণতি তাদের কর্তৃক দখলকৃত মুসলিম ভূমির পুনরুদ্ধারসহ তাদের বিশ্ব নিয়ন্ত্রণের চির অবসান। আর এ কারণে তারা দেশে দেশে ইসলামী আন্দোলন ও ইসলামী পুনর্জাগরণের অগ্রযাত্রাকে স্তিমিত করে দেয়ার লক্ষ্যে জঙ্গিবাদের আবিস্কার, উত্থান ও প্রসারের কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। এরা এ জঙ্গিবাদের মাধ্যমে দু'ভাবে ইসলামের অগ্রযাত্রাকে স্তিমিত করার চেষ্টা করছে। প্রথমত: জঙ্গি কার্যক্রমে কতিপয় দাড়ি টুপি পরিহিত ইসলামের লেবাসধারী লোককে নিয়োজিত করে ইসলামকে জঙ্গিবাদের সমর্থক এবং মুসলমানদেরকে জঙ্গি হিসেবে উপস্থাপন করে সাধারণ মানুষের মধ্যে ইসলাম ও মুসলমান সম্পর্কে ভীতি সৃষ্টি করা, একই সাথে নিয়মতান্ত্রিক ইসলামী আন্দোলনকে জঙ্গিবাদের সাথে একাকার করে অবৈধ জঙ্গিবাদের সাথে সুকৌশলে ইসলামী আন্দোলনকেও নিষিদ্ধ করা। দ্বিতীয়ত: জঙ্গিবাদ প্রতিহত করার কথা বলে জঙ্গি ধরার নামে দেশে দেশে নিয়মতান্ত্রিক ইসলামী আন্দোলনের নেতাদেরকে ধরে নির্যাতন ও জুলুম-নিপীড়নের মাধ্যমে ইসলামী বিপ্লব প্রতিহত করা এবং সাধারণের মধ্যে নির্যাতন ভীতি সৃষ্টি করে ইসলামী আন্দোলনে অংশ নেয়া হতে বিরত রেখে গণমত গঠনে বাধার সৃষ্টি করা।

মনে রাখতে হবে, জঙ্গিবাদের মূল সুবিধাভোগী হচ্ছে ইসলামের শত্রুরা। কেননা এর মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনের ক্ষতি হচ্ছে বেশি। সুতরাং, যদি কেউ ইসলামের পক্ষ শক্তি মনে করে এ ধরনের গর্হিত কাজে অংশ নিয়ে থাকে, তার মনে রাখতে হবে সে রয়েছে এক বিরাট বিভ্রান্তিতে। তার উচিত এ অন্ধকার জগত তথা ইসলামের শত্রুদের ষড়যন্ত্রের জাল থেকে অনতিবিলম্বে বেরিয়ে আসা। প্রত্যাবর্তন করা সত্যিকার ইসলামের দিকে।

বর্তমানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও বিশেষ স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠি জঙ্গিবাদকে নিজেদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। খুব বেশি দিন আগের কথা নয়, আমাদের দেশে কখনো কখনো দেখা গেছে, কেউ কেউ প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য পথে-প্রান্তরে ছিনতাইকারী সাজিয়ে নাজেহাল করেছে। এ ধরনের ঘটনা প্রায়ই শোনা যেতো, প্রতিহিংসাবশত কেউ কেউ প্রতিপক্ষকে রাস্তায় জড়িয়ে ধরে ছিনতাই বলে চিৎকার করেছে, আর রাস্তার জনতা না জেনে ভালো মানুষটিকে ভুল করে গণধোলাই দিয়েছে। বর্তমানে একইভাবে

রাজনৈতিক স্বার্থে প্রতিপক্ষকে জঙ্গি সাজিয়ে আমাদের দেশের একটি বিশেষ দল সরকারি ক্ষমতা ব্যবহার করে রাজনৈতিক ফায়দা লুটেছে এবং বহুসংখ্যক ভালো মানুষকে জঙ্গি হিসেবে চিত্রিত করে তাঁদের চরিত্র হনন এবং ইসলামী আন্দোলনের পথ রোধ করার প্রয়াস চালিয়েছিল।

বিকল্প ভাবনা

বাংলাদেশে যারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করছেন, তাঁদের বড় অংশটি কাজ করছেন বর্তমানে প্রচলিত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মধ্যে থেকে। অর্থাৎ, তাঁরা বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতির আওতায় থেকে দাওয়াতে দ্বীনের মাধ্যমে জনসমর্থন তৈরি করে নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে দেশে ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চাচ্ছেন। দেশে আন্দোলনরত অধিকাংশ ইসলামী দল এ পদ্ধতির অনুসারী। আরও একটি ক্ষুদ্র অংশ রয়েছে, যারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতির গণনির্বাচনকেও পরিপূর্ণ হারাম মনে করেন এবং এ পদ্ধতি মেনে নিয়ে আন্দোলন করাকেও সমীচীন মনে করেন না। তারা প্রচলিত পদ্ধতি পূর্ণ অস্বীকার করে, জনমত তৈরি করে পূর্নাঙ্গ বিপ্লব এর মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চান। বাংলাদেশে এ মতের অন্যতম প্রবক্তা বা মতপোষণকারী ছিলেন এক সময়ের জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের নেতা এবং পরবর্তিতে আইডিএল এর প্রধান মাওলানা আব্দুর রহীম র.। তিনি তাঁর 'গণতন্ত্র নয় পূর্নাঙ্গ বিপ্লব চাই' নামক একটি পুস্তিকায় এর ধারণা প্রদান করেন। বর্তমানেও হিযবুত তাহরীর সহ কোনো কোনো দল এ ধরনের মতের অনুসারী। তাঁরা মনে করেন, গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বা গণনির্বাচনের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তাঁরা প্রয়োজনে সশস্ত্র বিপ্লবের দিকে ইঙ্গিত করেন।

আমরা ইতিপূর্বে বলেছি, ইসলাম প্রতিষ্ঠা চাইলে কেবল রাসূল সা. প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করতে হবে। সীরাত পাঠে দেখা যায়, রাসূল সা. সশস্ত্র বিপ্লব বা গণতান্ত্রিক আন্দোলন, এ দুটি পদ্ধতির কোনো একটিও অনুসরণ করেননি। এর কারণ সম্ভবত: ইসলামে কোনো জোড় জবরদস্তি নাই, যার কারণে যতক্ষণ মানুষ ইসলামী শাসন মেনে না নেবে, ততক্ষণ এ ব্যবস্থা তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয় না। আর হয়তো তাই রাসূল সা. মানুষের সামনে ইসলাম ও কুরআন উপস্থাপন করেছেন, যাতে মানুষ ইসলামের সত্যতা, সৌন্দর্য এবং মুক্তির একমাত্র পথ হওয়ার বিষয়টি অনুভব করে, তা গ্রহণ করে নেয়। মানুষ যখন অদম্য আগ্রহে ইসলাম গ্রহণ করে নিলো, তখনই ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

গণতান্ত্রিক পদ্ধতির গণনির্বাচন প্রয়োগ বা অনুসরণও তিনি করেননি। এর কারণ হতে পারে, তখন আধুনিক কালের মতো সুগঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নামে কোনো ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিলো না। সরকার পরিবর্তনের জন্য গণভোটের কোনো ব্যবস্থাও বিদ্যমান ছিল না। সে সময়ে কোন পক্ষে কতো মানুষ

অবস্থান করছিলো, তা গণভোট ছাড়াই যাচাই করা সম্ভব ছিল এবং অধিকাংশ মানুষ মুসলমান হওয়ার পরই মুসলমানগণ নিজেদের সার্বিক বিষয়ে ইসলামী বিধানকে অনুসরণ করতে বদ্ধপরিকর হন। তবে ইসলাম প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি হিসেবে বর্তমান বিশ্বের প্রায় সকল মুসলিম দেশে গণভোটকে একটি নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং অনুসরণ করছে। এ পদ্ধতির প্রয়োগের বিষয়ে বর্তমান মুসলিম বিশ্বের ইসলামী স্কলারগণ কোনো জোরালো আপত্তি উত্থাপন করেননি।

আমি ব্যক্তিগতভাবে এ দুটি পদ্ধতির যথার্থতা বা জায়েজ-না জায়েজ হওয়ার বিষয়ে কথা বলছি না। এ যাবত চড়মপন্থা ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতির অনুসরণ করে বিশ্বব্যাপি ইসলামী আন্দোলনের যে ফলাফল এসেছে, তার আলোকে আমার ধারণা, ইসলামী আন্দোলনের জন্য বিকল্প ভাবনা প্রয়োজন। এর কারণ হলো:

১. হিযবুত তাহরীর বা সমমনা দলের মতানুসারে চরমপন্থা অনুসরণের সিদ্ধান্তের প্রচার করা হলে, প্রতিষ্ঠিত শক্তির আক্রমনে অঙ্কুরেই নি:শেষ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কোনো ব্যক্তি এ পথে এগুতে চাইলে, তাকে জঙ্গিবাদী বা সন্ত্রাসী খেতাব দিয়ে কথিত বিচার মঞ্চায়ন করে হত্যা করা হতে পারে। এক্ষেত্রে হয়তো তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগও পাবেন না। এমনকি বিচার মঞ্চায়নের পরিবর্তে ক্রসফায়ারের মতো অন্য কোনো পদ্ধতির প্রয়োগও করা হতে পারে। তাছাড়া গোপন তৎপরতার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট পর্যায় পার করা গেলেও প্রতিষ্ঠিত শক্তির সামনে খালি হাতে দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব, আর প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থায় টিকে থাকার মতো অস্ত্রসম্ভার গড়ে তোলাও বর্তমান শাসনব্যবস্থায় বেআইনী। অতএব তাঁদের গণবিক্ষোভের মাধ্যমে বিপ্লব করে ইসলাম প্রতিষ্ঠার যে ধারণা প্রকাশ করছেন, তা ইসলামী দৃষ্টিকোণ হতে জায়েজ ধরে নিলেও তা বাস্তবতার কারণে সফলতার মুখ দেখতে সক্ষম হবে বলে মনে হয় না। এক্ষেত্রে কেউ ইরানী ইসলামী বিপ্লবকে মডেল হিসেবে গ্রহণ করতে চাইলে মনে রাখতে হবে, মাত্র ছয় মাসের ব্যবধানে ইরানী বিপ্লব সাধিত হয়নি। সে বিপ্লবের কাজ মূলত শুরু হয়েছিল তারও প্রায় দুই যুগ আগে। কেবল বিপ্লবের ডাক এসেছে আর এমনি ইরানের ৮০/৯০ লক্ষ মানুষ রাস্তায় নেমে এসে মিছিল/বিক্ষোভ করেছে, আর রেজা শাহ পাহলভী ক্ষমতা ছেড়ে পালিয়েছে এবং ইসলামী বিপ্লব হয়ে গেছে, বিষয়টি আসলে এমন সহজ ছিল না। ১৯৬৩ থেকে ১৯৭৮ পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ের প্রস্তুতি ও কাজের ফলাফল ছিল ১৯৭৯ এর ইরানী ইসলামী বিপ্লব।

সার্বিক বিষয় পর্যালোচনায় আমার মনে হয় বর্তমানে বাংলাদেশের মতো একটি গণতান্ত্রিক দেশে উক্ত মডেল কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা অতিনগণ্য।

২. গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলামী আন্দোলনের ক্ষেত্রে মনে করা হয়, ইসলামের পক্ষে গণমত তৈরি করে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচনে বিজয় লাভ করে দেশের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করা যাবে। কারণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সংখ্যা গরিষ্ঠরা ক্ষমতা লাভ করে এবং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে দেশের প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন করে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব।

বাস্তবতা যদি এই সহজ সমীকরণ অনুসরণ করতো, তাহলে হয়তো সত্যিই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলাম প্রতিষ্ঠা সম্ভব হতো। কিন্তু তাঁদের জন্য হতাশাপূর্ণ কথা হলো, আসলে বাস্তবতা এই সহজ সমীকরণ অনুসরণ করে না। গণতন্ত্রের এ নিয়মগুলো গণতন্ত্রের বিপক্ষে কখনো কার্যকর হয় না। অর্থাৎ, আপনি যখন গণতন্ত্রের স্থানে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে যাবেন, তখন গণতন্ত্রের এ নিয়ম 'দেশের অধিকাংশ মানুষ চেয়েছে বলেই আপনি ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন" প্রযোজ্য হবে না। তখন ইসলাম বিপক্ষ শক্তির চাওয়াগুলো ভিন্ন যুক্তি খুঁজে পাবে এবং আপনাকে তাঁদের বর্তমান গণতান্ত্রিক ফর্মূলার বাইরে গিয়ে পরাস্ত করতে উদগ্রীব হবে। এর কারণ হলো:

- দেশের নীতি ও সিদ্ধান্ত নির্ধারণে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ করা হলেও সে সকল নীতি ও সিদ্ধান্ত প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করেন দেশের প্রশাসন, আইন প্রয়োগকারী, সামরিক ও বেসামরিক সংস্থা তথা রাষ্ট্রের কর্মকর্তা বা কর্মচারীগণ। আমলাগণ মূলত দেশের মূল কাঠামো। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাজনৈতিক দলের ক্ষমতা বদল হলেও দেশের প্রশাসনিক কাঠামোর কোনো মৌলিক পরিবর্তন হয় না। ফলে আপনি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়ে আসলেও আপনার দেশের প্রশাসনব্যবস্থা থেকে যাবে, প্রায় পূর্বের মতোই।
- কোন নির্বাচনে মোট ভোটের ৭০-৮০% এর বেশি ভোট কাষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। সুতরাং, আপনি মোট ভোটের ৩৬-৪১% ভোট পেলেই ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য নির্বাচিত হবেন। তখনও আপনার বিপক্ষে রয়েছে দেশের ৫৯-৬৪% ভোট।
- বিশ্বের শক্তিধর দেশগুলোর কোনোটিই ইসলামের পক্ষে নয়। আপনার দেশের অর্থনীতি এবং আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার উপর সে সকল দেশের একটি অদৃশ্য অথচ ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। আপনাকে টিকে থাকার জন্য তাদের সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির বিষয়টি হিসেব করা হয়।

এমতাবস্থায় আপনি যদি নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতা গ্রহণে সক্ষম হনও, আপনার পক্ষে দেশে ইসলামী শাসনব্যবস্থা কয়েম হওয়ার সম্ভাবনা শতভাগ নিশ্চিত নয়। কেননা,

- ইসলামী শাসনব্যবস্থা কায়েম হলে, যারা বর্তমানে দেশের বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত তারা সে সকল পদের জন্য অযোগ্য হয়ে পড়বেন। তারা বর্তমান ব্যবস্থায় যথেষ্ঠ যোগ্য বিবেচিত হলেও ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য তাদের অনেকে হয়ে পরবেন একেবারে অযোগ্য। তাঁদেরকে নিজেদের পরিবর্তনের জন্য সুযোগ দেয়া হলেও নিজেদেরকে পরিবর্তন করা তাঁদের জন্য সহজসাধ্য হবে না বা পরিবর্তিত হতে তাঁদের অনেকে আগ্রহী হবেন না। ফলে তাঁদের অধিকংশ ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হওয়ার পরিবর্তে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবেন এবং মানসিকভাবে তার সমগ্র সত্ত্বা আপনার প্রতিপক্ষে দাঁড়িয়ে থাকবে সুযোগের অপেক্ষায়।
- দেশের উক্ত ৫৫-৬৫% জনসাধারণ, যারা আপনাকে ভোট দেয়নি, আপনার বিপক্ষে অবস্থান করার সম্ভাবনা বেশি। কারণ যারা পুঁজিবাদী ও সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থার সুবাদে সম্পদের পাহাড় গড়ে নিয়েছে, যারা অনৈসলামিক সমাজব্যবস্থার নির্লজ্জতায় গা ভাসিয়ে দিয়েছে, যারা অবৈধ পন্থায় বিত্ত-বৈভব এর মালিক হয়েছে, যারা আইনের দুর্বলতার কারণে জনসাধারণের অর্থ চুরি করে সমাজের নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে, যারা মানুষকে গোলামীর শিকলে বেধে নিজেরা প্রভু হয়ে বসেছে, তাদের কাছে ইসলামী শাসনব্যবস্থা সুখকর হতে পারে না। ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করলে তাদের এ সকল অবৈধ ও জনক্ষতিকর কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে যাবে এবং তাদের রং-জৌলুস ঘোলাটে হয়ে যাবে। ফলে তারা আপনার বিপক্ষে মরনোম্মুখ হয়ে অবস্থান নেবে।
- আপনি যখন দেশের বিদ্যমান মৌলিক কাঠামোতে পরিবর্তন এনে ইসলামী সংবিধান প্রণয়নের কাজে হাত দেবেন, দেশে সকল ধর্মহীন আইন রহিত করে ইসলামী আইন কার্যকর করার ঘোষণা দেবেন, তখন উক্ত জনগণের পক্ষ হতে এর বিরোধিতা করা হতে পারে এবং বলা হতে পারে, আপনাকে দেশের মৌলিক কাঠামোতে হাত দেয়ার জন্য নির্বাচিত করা হয়নি। এমতাবস্থায় যদি আপনি এ যুক্তিতে ধীর গতি গ্রহণ করেন যে, এ সকল জনসাধারণ ও প্রশাসনের কর্মকর্তাদেরকে মানসিকভাবে পরিবর্তন করে ইসলামী আইন বাস্তবায়ন করবেন, আর সে পর্যন্ত প্রচলিত পদ্ধতি বহাল রাখবেন, তবে তার জন্য আপনার আরও এক যুগ অপেক্ষা করার প্রয়োজন হতে পারে, আর এক যুগ পর্যন্ত ইসলামী বিধান বাস্তবায়ন না করে প্রচলিত

পদ্ধতির প্রয়োগ করলে, যাদের সমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় এসেছিলেন, ওয়াদা খেলাফের প্রেক্ষাপটে তাদের সমর্থন হারাবেন। ফলে ইসলামী বিধান বাস্তাবায়নের আকাঙ্খা হবে সুদূরপরাহত।

আর যদি ইসলামী আইন বাস্তবায়নের ওয়াদার বিষয়টি মাথায় রেখে, বিরোধী জনসাধারণের বিষয়টি উপেক্ষা করে ইসলামী হুকুমত কায়েমের উদ্যেগ গ্রহণ করেন, বিরোধী জনসাধারণের বিক্ষোভের মুখে পরতে পারেন, আর ঐ অপেক্ষারত আমলাগণ আপনার বিপক্ষে তাদের হস্ত প্রসারিত করতে পারে। তার সাথে যুক্ত হবে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র, তাদের পক্ষ হতে যারা কোনোভাবে আপনার দেশ তথা বিশ্বের কোথাও ইসলামী শাসন বরদাসত করতে প্রস্তুত নয়। গণতন্ত্রের সকল ফর্মূলা ভুলে গিয়ে, নেহায়েত অন্যায়ভাবে, আপনার বিপক্ষে হাজারো মিথ্যাচার আর অপবাদ আরোপ করে, আপনাকে টেনে হিচড়ে নামিয়ে দিয়ে তারা পুনরায় ক্ষমতা দখল করার চেষ্টা করতে পারে এবং আপনার পুনরায় নির্বাচিত হওয়ার সকল পথ বন্ধ করে দেয়ার চেষ্টা করতে পারে।

এখানে একটি বিষয় আমার মতামতের মধ্যে ত্রুটি হিসেবে কারো কারো চোখে পড়তে পারে তা হলো, এ মতামতে আল্লাহর সাহায্যের বিষয়টি বলা হয়নি। এটা নিশ্চিত সত্য, এ কাজে আল্লাহ্ প্রত্যক্ষ সহযোগিতা দিয়ে থাকেন এবং আল্লাহ্র সাহায্য ছাড়া কখনো এ পথে সফলতা আসতে পারে না। এটাও আমার মনে হয় ঠিক, আল্লাহ্র সাহায্য আসার একটা ভিত্তি, প্রেক্ষাপট, অবস্থা ও পর্যায় আছে। কোনো জনপদের অধিকাংশ মানুষ খোদাদ্রোহী থাকা অবস্থায় কোথাও ইসলাম প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় না। এ পথের প্রতিটি কর্মী চলার বাঁকে বাঁকে আল্লাহ্র সাহায্য অনুভব করবেন, কিন্তু চূড়ান্ত বিজয় আসবে কেবল একটি পর্যায় উন্নীত হয়ে একটি অবস্থায় উপনীত হওয়ার পর।

উল্লিখিত অবস্থায় আমার মনে হয়, যারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তাদের অনুসৃত পদ্ধতিটির যথার্থতা, কার্যকারিতা ও সম্ভাব্যতা সম্পর্কে বিচার বিশ্লেষণ করা দরকার এবং রাসূল সা. দেখানো পদ্ধতির সাথে মিল রয়েছে, আরও এমন কী কী বিকল্প আছে, তা নিয়ে ভাবা প্রয়োজন।

বর্তমানে ইসলামী আন্দোলনরত ইসলামিক স্কলারদের ভাবার জন্য আমার একটি মতামত দিতে চাই। এ মতামত দেয়ার আগে আমি আমার মতামত সম্পর্কে উল্লেখ করতে চাই, এটি আমার প্রণীত কোনো সূত্র বা ফর্মূলা নয়।

এটি শুধু ইসলামিক স্কলারদের ভাবার জন্য আমার পক্ষ হতে একটি মতামত। এ মতামতটির শুদ্ধতা বা প্রচলিত আন্দোলনের পদ্ধতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা উন্নততর হওয়ার দাবিও আমি করছি না। তবে এ আবেদন করছি, বিজ্ঞ আলেমগণ যেন একটু বিবেচনা করেন, এ বিষয়টি নিয়ে বিশ্লেষণ ও গবেষণা করেন। আমার মনে হয়:

১. সমগ্র দেশের রাজনীতিতে বা জাতীয় রাজনীতিতে প্রথমে অংশ নেয়ার পরিবর্তে ছোট ছোট গ্রাম এবং পর্যায়ক্রমে একটি ইউনিয়নের সকল গ্রাম, অত:পর কোনো একটি থানার সকল গ্রাম কর্মক্ষেত্র হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। বিচ্ছিন্ন অথচ পরিকল্পিতভাবে দেশের গ্রাম্য এলাকাগুলোকে বাছাই করে নিয়ে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। দেশের রাজনীতিবিদরা নির্বাচনকাল ছাড়া বাকি সময় গ্রাম অপেক্ষা শহরের বিষয়ে বেশি মনোযোগী হয়ে থাকে। তাছাড়া তারা নিকট ভবিষ্যতে তাদের জন্য যে সকল দল চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয়, তাদের বিষয়ে বেশি মনোযোগী হয়। অন্যদের বিষয়ে খুব-বেশি সময় ও মেধা ব্যয় করতে চায় না। এমতাবস্থায় আপনি যদি নির্বাচনে যাওয়ার কোনো পরিকল্পনা প্রকাশ না করেন এবং নির্বাচনে তাদের জন্য প্রতিবন্ধক না হন, তবে আপনার কাজের বিষয়ে তাদের পক্ষ হতে খুব বেশি মনোযোগী হওয়া ও আপনাকে নি:শেষ করার জন্য ব্যাপক শক্তি প্রয়োগ করার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বাছাইকৃত গ্রামগুলোতে নিম্নোক্ত কর্মসূচী বাস্তবায়নের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

- প্রথমত গ্রামের মানুষগুলোর মধ্যে দৃঢ় ঈমান সৃষ্টির জন্য কাজ করতে হবে। প্রথমে তাঁদের মধ্যে পরকাল সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা সৃষ্টি করতে হবে। জান্নাত-জাহান্নাম সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা ও বিশ্বাস সৃষ্টি হলে, মানুষ জাহান্নাম হতে বাঁচার তাকিদ অনুভব করবে। যাদের মধ্যে আখেরাতের ধারণা ও বিশ্বাস দৃঢ় হবে, তাদেরকে পরবর্তিতে জাহান্নাম হতে বাচার সঠিক পথ দেখাতে হবে। আর সঠিক পথটি হলো ইসলাম, তথা কুরআন ও সুন্নাহ্ তথা শরীয়ার অনুসরণ। যে সকল মানুষ ইসলাম অনুসরণের বিষয়টির উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন, তাদের মধ্যে এবার ইসলামের সঠিক ধারণা সৃষ্টি করতে হবে। এপর্যায়ে এসে তাঁদেরকে দেশের প্রচলিত রাজনীতির ভয়াবহতা তথা এ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ যে মানুষকে আল্লাহ্দ্রোহীতে পরিণত করে এবং কালেমা পাঠের অর্থই যে হলো তগুতের সকল আনুগত্য, আইন কানুন, নিয়ম-নীতি ত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহ্ ও তার

রাসূলের আনুগত্য ও অনুসরণের শপথ গ্রহণ করা, এ সম্পর্কে পরিপূর্ণ বিশ্বাস তৈরি করতে হবে। অধিকন্তু দ্বীন প্রতিষ্ঠায় সময়, অর্থ-সম্পদ, শ্রম এবং প্রয়োজনে জীবন ব্যয় করার প্রয়োজনীয়তা ও মর্যাদা সম্পর্কে সঠিক ধারণা তৈরি করতে হবে। প্রতিটি গ্রামের অন্তত: ৭০%-৯০% মুসলমানকে এ মতের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। এর পূর্ব পর্যন্ত কেবল মাত্র মতামত গঠন চলতে থাকবে। এ মতের পক্ষে যারা আসবেন, তারা ঘোষণা ছাড়াই জাতীয় নির্বাচনে ভোট দেয়া হতে বিরত থাকবেন। একের পর এক বা একসাথে বহুসংখ্যক নিকটতম গ্রামে এ অবস্থা তৈরি করতে হবে এবং এ মতের সবাইকে নিয়ে একটি কমিউনিটি গড়ে তুলতে হবে।

- ইসলামের আলোকে সৎ কাজের আদেশ, উৎসাহ দান, সহযোগিতা করণ, সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজের উদ্যোগ গ্রহণ, অংশগ্রহণ এবং সমাজের জন্য ক্ষতিকারক কাজ নিরুৎসাহিত ও প্রতিরোধ করার কাজ অব্যাহত রাখতে হবে। দরিদ্র ও অসহায় মানুষের প্রয়োজনে আত্মনিয়োগ করতে হবে, প্রয়োজনে তাঁদের পাশে দাঁড়াতে হবে। তাঁদের প্রতি কেউ অন্যায় আচরণ করলে তার প্রতিরোধ ও প্রতিকারে ভূমিকা রাখতে হবে। এ কাজে কোনো রকম দলীয় বা গোষ্ঠিগত পরিচয় কাজে লাগানো অপেক্ষা গ্রামের অধিকাংশ মানুষকে জড়িত করে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার উপর অধিক গুরুত্বারোপ করা হবে। এতে করে এ সকল মানুষের গ্রহণযোগ্যতা, বিশ্বস্ততা এবং নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে, সামাজিক বন্ধন সৃষ্টি ও মজবুত হবে এবং সমাজে অন্যায়কারীরা শক্ত ভিত রচনার সুযোগ পাবে না।
- গ্রামগুলোতে মানুষের নূন্যতম মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করতে হবে। অর্থাৎ, গ্রামগুলোকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করণ, প্রয়োজনীয় বস্ত্র উৎপাদনের ব্যবস্থাকরণ এবং সাধারণ আবাসন ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করণ এর জন্য কাজ করে স্বনির্ভর গ্রাম তৈরি করতে হবে। শিক্ষা প্রসারে যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে হবে। বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা করণ এবং বয়স্কদেরকে পড়ার জন্য উৎসাহিত করে গ্রাম হতে অশিক্ষার অন্ধকার দূর করতে হবে। পূর্ব হতে শিক্ষিত এবং নবশিক্ষিত লোকদেরকে কুরআন-হাদীস এবং রাসূল সা. এর জীবনী অধ্যয়নে উৎসাহিত করতে হবে। মাঝে মধ্যে শিক্ষিত ও নিরক্ষর মানুষগুলোকে নিয়ে কুরআন-হাদীস এবং রাসূল সা. এর জীবনী অধ্যয়নের বৈঠক করতে হবে। বিশেষ করে মসজিদভিত্তিক ইসলাম চর্চা এবং মসজিদে অধিকসংখ্যক মানুষকে উপস্থিত করার জন্য কাজ করতে হবে। শিক্ষা-প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানুষের মাধ্যে কালেমার মর্মার্থ অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ

করে নেয়ার অর্থ সম্পর্কে এতোটাই জাগ্রত করতে হবে যে, মানুষগুলো একমাত্র আল্লাহ্‌র বিধান ছাড়া সকল বিধানকে কুফর হিসেবে বুঝতে সক্ষম হবেন ও একমাত্র ইসলাম ছাড়া সকল বিধি-বিধান, নিয়ম-নীতি মেনে নিতে অস্বীকার করতে প্রস্তুত হয়ে যাবেন এবং এর জন্য যে কোনো ধরনের ত্যাগ স্বীকারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকবেন।

- মনে রাখতে হবে, এ পদ্ধতিতে কাজ করলেই যে একেবারে নিরাপদে উদ্যেশ্য সাধান করা যাবে, এমন নয়। আপনি যখন প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত নিয়ম কানুনের বিপক্ষে কথা বলবেন, শয়তান কখনো আপনাকে নিরাপদ পথ ছেড়ে দেবে না। এ ক্ষুদ্র গ্রামগুলোতেও আপনি তাদের দেখা পাবেন। তারা আপনার এ কাজে প্রতিরোধ-প্রকিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। আপনাকে বুদ্ধিমত্তা ও কৌশল প্রয়োগ করে তার মোকাবেলা করতে হবে। পূর্ণশক্তি অর্জনের আগে কোনোরূপ সংঘাত-সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়া যাবে না। দাওয়াতে দ্বীনের কাজের পাশাপাশি ইজ্জত-সম্মান, জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধানে যথাসম্ভব প্রতিকূল পরিস্থিতি এড়িয়ে চলতে হবে। প্রয়োজনে এক গ্রাম হতে অন্য গ্রামে বা এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় সাময়িক হিযরত করার প্রয়োজন হতে পারে।
- যখন নিকটতম বহুসংখ্যক গ্রামের ৮০-৯০% মুসলমান উক্ত মানে তৈরি করা যাবে তখন তাঁদেরকে নিয়ে একটি পৃথক কমিউনিটি গড়ে তুলতে হবে এবং উক্ত কমিউনিটির পক্ষ হতে প্রকাশ্যে একমাত্র আল্লাহর বিধান পরিপালন ও এছাড়া সবকিছু আস্বীকার করার ঘোষণা দেয়া হবে। যেহেতু গণতান্ত্রিক সূত্র অনুসারেও অধিকাংশ মানুষ যা কিছুকে আইন বিধান মনে করে, তা'ই আইন হিসেবে গণ্য হয় এবং তারা সে বিধান অনুসারে চালিত হয়, সেহেতু গণতন্ত্রের সূত্র অনুসারে উক্ত কমিউনিটির মানুষ নিজেরা নিজেদের জন্য একমাত্র আল্লাহ্‌র বিধানকে গ্রহণ করার অধিকার রাখে। তারা নিজেরা প্রায় স্বনির্ভরশীল হয়ে প্রচলিত ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন সংস্থার সেবা গ্রহণ হতে বিরত থেকেও এগুলোকে অকার্যকর করে দিতে পারে। পর্যায়ক্রমে নিজেদের জন্য ইসলামী বিধান মোতাবেক বিকল্প প্রশাসনিক কাঠামো গঠন করতে পারে। যেহেতু এটি তাঁদের অধিকার, সেহেতু কেউ তাঁদের এ কার্যক্রমে বাধা আরোপ করলে উক্ত বাধাদান অন্যায় হিসেবে সাব্যস্ত হবে এবং উক্ত অন্যায় বাধা অপসারণে যে কোনো ভূমিকা রাখা তাঁদের জন্য সঙ্গত হবে। এ অবস্থায় তারা উক্ত বাধা দূরিকরণে পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুসারে যে কোনো প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে। তবে আমার মনে হয় যখন একটি বৃহৎ এলাকার মানুষ একত্রিত হয়ে ইসলামী বিধানকে নিজেদেরে জন্য নির্ধারণের ঘোষণা দেবে,

তখন বড় ধরনের প্রতিরোধের মুখোমুখী নাও হতে পারে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, প্রচলিত ব্যবস্থার শাসক গোষ্ঠিকে শুরু হতেই ইসলামের চিরশত্রু বিবেচনা না করে তাঁদের নিকটও প্রতিনিয়ত ইসলামের প্রকৃত দাবি এবং কল্যাণ তুলে ধরতে হবে। একজন মুসলমান কখনো কারো অকল্যাণকামী হবে না। সুতরাং, প্রতিষ্ঠিত শাসক গোষ্ঠির কল্যাণকামী হয়ে তাঁদেরকে ইসলামের পক্ষে কাজ করার আহ্বান জানাতে হবে। যদি তারা এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে দেশে দ্বীন প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসে, তবে তাঁদের শাসন মেনে নিতে কোনো বাধা নেই। তবে পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, পরিস্থিতি অনুসারে তখন ইসলামের বিধান অনুসারে সিদ্ধান্ত নিয়ে রাসূল সা. এর দেখানো পথে এগিয়ে যেতে হবে।

- কাজ করার ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, আমাদের দায়িত্ব হলো আল্লাহ্‌র জমিনে আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা। এজন্য আমাদের পক্ষ হতে মানুষকে সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত করতে তাঁদেরকে দাওয়াত দেয়া, দাওয়াতের কাজ পরিচালনার মতো শান্ত পরিবেশ অব্যাহত রাখার জন্য এবং দাওয়াতের বাধা দূর করার লক্ষ্যে সুকৌশলে কাজ সমাপন করতে হবে। এ পথে সর্বোচ্চ ত্যাগ ও ধৈর্যের সাথে কাজ করতে হবে। দ্বীন প্রতিষ্ঠার আকাঙ্খা থাকবে প্রচণ্ড, তবে এর জন্য কোনো জোর জবরদস্তি-কুট কৌশল এবং অতিউৎসাহি হয়ে আল্লাহ্‌র বিধান পরিপন্থি কোনো কাজে জড়িত হওয়া যাবে না। যদিও বিচার দিবসে আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ও জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ্‌র বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হওয়ারসমূহ সম্ভাবনা রয়েছে, দ্বীন প্রতিষ্ঠার সফলতার মাত্রা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। অতএব পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে কাজ করে ফলাফলের বিষয়টা আল্লাহ্‌র ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়ে তার উপর ভরসা করা উচিত বলে মনে করি। সুতরাং, দ্বীন প্রতিষ্ঠায় দ্বীন বহি:র্ভূত কোনো কাজ করা আদৌ সমীচীন নয়।

বিকল্পের বিকল্প

বাস্তবতার নিরিখে উপরোক্ত প্রস্তাব বাস্তবায়ন যদি যথার্থ বিবেচিত না হয়, তবে বিদ্যমান ইসলামী দলসমূহের ঐক্যমত সৃষ্টি করে বর্তমান প্রক্রিয়ায় ইসলামী বিপ্লব বাস্তবায়নের জন্যও চেষ্টা করা যেতে পারে। আমরা অনেকবার উল্লেখ করেছি এবং বিষয়টি সকলের নিকট স্পষ্ট যে, ইসলামী বিপ্লবের সফলতা চাইলে ইসলামী শক্তিসমূহের মধ্যে ঐক্য জরুরি। ইসলামী দল ও পক্ষসমূহের মধ্যে মতভেদ-অনৈক্য ইসলামী আন্দোলনকে দুর্বল করে দিচ্ছে। দলসমূহের মধ্যে নিজেদের বিষয়ে সঠিক হওয়ার অতিমাত্রায় আত্মবিশ্বাস, ছাড় দেয়ার বিষয়ে অনিহা এবং অন্যের নেতৃত্বের বিষয়ে অনাস্থাসহ বিভিন্ন কারণে তাঁরা কাছাকাছি আসতে পারছে না। এমতাবস্থায় ইসলামী ভাবধারার সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য বিজ্ঞজনদেরকে তাঁদের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করার জন্য একটি ঐক্য আন্দোলনের সূচনা করা জরুরি। এক্ষেত্রে সর্বজন গ্রহণযোগ্য, অথচ কোনো দলের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত নয়, এমন বিজ্ঞ মুসলিম পন্ডিতদেরকে নিয়ে একটি সমন্বয় কমিটি গঠন করা যেতে পারে, যাদের কাজ হবে এ সকল ইসলামী দলসমূহকে একই ছাতার নিচে নিয়ে আসা। এ লক্ষ্যে একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় কাজ করতে হবে। প্রথমে দলসমূহের মূল নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করে প্রত্যেক দলের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, কর্মপদ্ধতি ও কর্ম-পরিকল্পনা, ইসলামের মৌলিক আদর্শের সাথে সাদৃশ্য ও বৈশাদৃশ্য, নিজেদের বিষয়ে তাদের নিজস্ব মূল্যায়ন এবং অন্যান্য ইসলামী দল সম্পর্কে তাদের ধারণা ও মূল্যায়ন সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা নিয়ে, তা নোট করে নিতে হবে। প্রয়োজনে তথ্য সংগ্রহের আওতা আরো বাড়ানো যেতে পারে। তথ্য সংগ্রহের পর এ সকল বিষয়ে নিবিড় পর্যবেক্ষণ করতে হবে। পর্যবেক্ষণ হতে প্রাপ্ত ফলাফলের উপর ভিত্তি করে এ সকল দলসমূহের মধ্যকার সমস্যাসমূহ অনুধাবন করে তাঁদের মধ্যকার দূরত্ব কমিয়ে আনার জন্য আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে হব। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে এটি আখেরাতমূখী কাজ। এর বিনিময় সম্পূর্ণটা আখেরাতে পাওয়া যাবে। দুনিয়াতে এর ব্যক্তিগত কোনো সুবিধা পাওয়া যাবে না, এ সিদ্ধান্ত নিয়ে আমাদেরকে কাজ করতে হবে। দুনিয়ার সকল ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ করে যদি বিজ্ঞজনদের একটি অংশ এ কাজে এগিয়ে আসেন ভালো ফলাফল আশা করা যায়।

ইসলামী আন্দোলনের ক্ষেত্রে বর্তমানে অনুসৃত পন্থা পদ্ধতির বাইরে এখানে যে পদ্ধতি বা কৌশলের কথা বলা হলো, তা আমার চূড়ান্ত মতামত নয়। আমি মনে করি ইসলামী আন্দোলনের কৌশল সম্পর্কে নতুন করে চিন্তা-গবেষণা করা

প্রয়োজন। তবে যে কৌশল নির্ধারণ বা গ্রহণ করা হোক, তা যেন হয় রাসূল সা. এর দেখানো রোড মেপ বা নমুনার অনুরূপ। আমি আবারও স্মরণ করতে চাই, রাসূল সা. দেখানো পথের বাইরে যত শক্তিশালী কৌশল প্রণয়নের দাবি করা হোক না কেন, তা কখনো সফল হতে পারবে না। যুগের অযুহাতে নতুন পদ্ধতির প্রয়োজন নেই বলে আল্লাহ্ মুহাম্মদ সা. কে শেষ নবী করেছেন। যদি নতুন পন্থা পদ্ধতির প্রয়োজন থাকতো তাহলে হয়তো নবীর আগমন অব্যাহত থাকতো। আমি এ কথাই বুঝাতে চেয়েছি, আল্লাহ্ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সম্মক অবগত। তিনি পৃথিবীর সকল যুগ ও পরিস্থিতির জন্য নবী সা. এর কাজকে যথেষ্ট ও পরিপূর্ণ করেছেন। সুতরাং, চৌদ্দশত বছর আগে যে দ্বীন ছিল আধুনিক তা আজও আধুনিক। রাসূল সা. দেখানো দ্বীন প্রতিষ্ঠার পদ্ধতিও আধুনিক। সুতরাং, নতুন পন্থা-পদ্ধতি আবিস্কারের পরিবর্তে রাসূল সা. দেখানো পথে আন্দোলনের কর্মসূচী তৈরি করা আজ বেশি জরুরি। আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।

শেষ কথা

এ সুদীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে জানতে পারলাম, মুসলমান কাকে বলে। মুসলমান হিসেবে আমরা যে সকল মৌলিক ইবাদত যেমন- সালাত, সিয়াম, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি পরিপালন করি, তার মর্মার্থ এবং বাস্তব দাবিও আলোচনা করা হয়েছে। সব কিছুর পরে আমরা যে সত্যটি বুঝতে পারলাম, ইসলাম একটি পূর্নাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা। যে কেউ মুসলমান হতে চায়, সে এ পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থাকে গ্রহণ করেই মুসলমান হবে। অর্থাৎ জীবনের প্রতিটি বিষয়ের সমাধানের জন্য সে ইসলামের মুখাপেক্ষী থাকবে। যখন কোনো ব্যক্তি ইসলামকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো উৎস হতে জীবনের কোনো বিষয়ের সামাধান খুঁজতে যায়, তখন সে ইসলামের গণ্ডি হতে বেরিয়ে গেল। সুতরাং, মুসলমান থাকার জন্য আমাদের বিচরণ ইসলামের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

এ দীর্ঘ আলোচনায় আমরা এ-ও জেনে নিলাম যে, যদি কোনো দল আল্লাহর বিধান ব্যতীত অন্য কোনো আইন দ্বারা দেশ পরিচালনা করতে চায়, তবে তারা আল্লাহর আইন অপেক্ষা সে আইনকেই উত্তম মনে করে এবং তারা সে আইনের অনুসারী, তারা প্রকারান্তরে ইসলামী আইনের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। তাদের বিচরণ ইসলামের গণ্ডির বাইরে। স্বাভাবিক কারণে ইসলামের গণ্ডির বাইরে অবস্থান করে কেউ নিজেকে মুসলমান দাবি করতে পারে না।

এখানে একটি প্রশ্নের অবতারণা হতে পারে যে, এ পুস্তকের মূল বক্তব্যে এসেছে, যারা সেক্যুলার রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে, অর্থাৎ প্রচলিত ধারার রাজনীতি করে তারা তাগুত এবং প্রকারন্তরে খোদার অবাধ্যতায় লিপ্ত। অথচ এ দেশের অধিকাংশ মুসলমানই ইসলাম ভিন্ন প্রচলিত রাজনীতির সাথে জড়িত। তবে কি তারা অমুসলিম?

আমরা পূর্বেই বলেছি এদেশের ৯০% এর অধিক মানুষ মুসলমান এবং ইসলামের জন্য তাঁদের দরদ, আবেগ অনুভূতি অত্যধিক গভীর। এ পুস্তিকা রচনার উদ্দেশ্য এ নয় যে, তাঁদেরকে অমুসলিম বলা বা তাগুত বানিয়ে ইসলামের বিপক্ষ শক্তির সাথে দাঁড় করিয়ে দেয়া। বরং একটি বাস্তব তথ্য প্রদান করে, তাঁদেরকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করাই মূল লক্ষ্য। আর তাই তাদের গৃহীত কার্যক্রমের ভয়াবহতা সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করা জরুরি। নিজের একজন ভাই যদি না বুঝে পানি মনে করে এসিড পান করতে নেয়, তাকে তার ভয়াবহতা জানানো এক আবশ্যকীয় কর্তব্য, এর পরিবর্তে তাঁর এ কাজকে সঠিক বলে স্বীকৃতি দিয়ে বুদ্ধির প্রশংসা করে তাকে তা করতে উৎসাহিত করা শত্রুতা বৈ কিছু নয়। মনে রাখতে

হবে, বিষয়টি এমন নয় যে, তাদের সকলে জেনে বুঝে খোদাদ্রোহিতায় লিপ্ত রয়েছে। যারা এ সকল প্রচলিত রাজনীতির সাথে জড়িত, তাদের সিংহভাগের ইসলাম এবং ইসলামী দৃষ্টিকোণ হতে প্রচলিত রাজনীতির মর্যাদা কি, সে সম্পর্কে তেমন কোনো ধারণা নেই। বিষয়টা ঠিক চোরাবালিতে পরে মৃত্যুবরণকারীর সাথে তুলনা যোগ্য। যে চোরাবালিতে পড়ে, সে জানে না যে সেখানে পা রাখলে সে তলিয়ে গিয়ে নির্মম মৃত্যুর শিকার হবে। বরং সে নিরাপদ এবং সংক্ষেপে গন্তব্যে পৌছার জন্যই চোরাবালিতে পা রেখে চিরতরে বলি হয়ে যায়। ঠিক তেমনিভাবে এ সকল রাজনীতিবিদগণও মনে করেন প্রচলিত রাজনীতির মাধ্যমে সম্মান অর্জন, নেতৃত্ব গ্রহণ জীবন ধারণের একটি উপকরণ, আর তাই একে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার একটি নিরাপদ উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করে নেয়। কিন্তু এ পথে চলার কারণে তার গন্তব্য কোথায় হবে এবং আল্লাহর কাছে তার পরিচয় কী দাঁড়াবে সে সম্পর্কে তার কোনো চেতনাই থাকে না। এর মূল কারণ হলো কুরআন তথা ইসলাম সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞানের অপ্রতুলতা। আর ইসলামী জ্ঞান না থাকার মূল কারণ হলো আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা, সামাজিক অবস্থা, অবিভাবকদের অসচেতনতা এবং আলেম সমাজের দায়িত্বহীনতা (অলেম সমাজ বলতে কেবল মাদ্রাসার শিক্ষকগণ নয়, বরং ইসলামী গভীর জ্ঞান সমৃদ্ধ সকল মুসলমান অন্তর্ভুক্ত)। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এরকম যে, এর সর্বোচ্চ ডিগ্রী অর্জনের মাধ্যমেও ইসলামের পূর্ণাঙ্গ চিত্রটি পাওয়া যায় না। সামাজিক ব্যবস্থা এরকম যে, ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করে এর দ্বারা সমাজের উচ্চ স্তরে আসীন হওয়া বা ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নিশ্চয়তা পাওয়া যায় না। আবার অবিভাবকগণও তাঁদের ছেলে মেয়েদের সামাজিক প্রতিষ্ঠাকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে, ফলে তারা ইসলামী শিক্ষা বাদ দিয়ে কেবল প্রচলিত শিক্ষার বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। তাছাড়া ধর্মীয় শিক্ষা বলতে সালাত সিয়াম সংক্রান্ত যৎসামান্য মাসলা মাসায়েল শিক্ষাকে বুঝে থাকে। আবার আলেম সমাজও বিভিন্ন কারণে ইসলামের প্রকৃত পরিচয়টুকু মানুষের দ্বারে দ্বারে নিজ উদ্যোগে পৌছে দেয়ার বিষয়ে তৎপর নয়। এ সকল কারণে বাংলাদেশের মুসলমানরা ইসলামের প্রকৃত দাবির বিষয়ে পূর্ণ অবগত ও সচেতন নয়। আর তাই এ সকল রাজনীতিতে অংশগ্রহণ যে আল্লাহ্‌র সাথে বিদ্রোহের সামিল সে সম্পর্কে তাঁদের ধারণা না থাকার কারণে তারা সেক্যুলার রাজনীতি করছে। তারা জেনে বুঝে আল্লাহ্‌দ্রোহীতায় লিপ্ত হচ্ছে না।

সুতরাং, চোরা বালিতে আটকে যাওয়ার আগে যেমন- অভিজ্ঞ সহযাত্রীর কর্তব্য তার সাথীটিকে সচেতন করে ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা করা, তেমনি যারা ইসলাম

বুঝেন তাঁদের কর্তব্যও হলো যারা ইসলাম সম্পর্কে ভালো জানে না, তাদেরকে জানিয়ে বুঝিয়ে খোদাদ্রোহিতা হতে বিরত রেখে চূড়ান্ত ধ্বংস হতে রক্ষা করার প্রচেষ্টা চালানো। তার পর কেউ অবহিত হয়েও কায়েমী স্বার্থে নিজের অবস্থানে দৃঢ় থাকলে অসহায়ের মতো তার পরিণতি দেখা ছাড়া আর কিছু করণীয় নেই। আর তাই যারা জানেন তাঁরা সবাইকে জানিয়ে দিন;

'আমরা যারা মুসলমান থাকতে চাই, তাঁরা অবশ্যই এমন দলের রাজনীতি হতে বিরত থাকতে হবে, যে দল আল্লাহর আইনের পরিবর্তে মানুষের তৈরি করা আইন দ্বারা দেশ শাসন করে বা ক্ষমতায় গেলে দেশ শাসন করবে। আর আমরা যদি পূর্ণাঙ্গ মুমিন হতে চাই এবং জান্নাত আশা করি, তবে দ্বীন কায়েমের প্রচেষ্টা চালাতে হবে।'

আল্লাহ আমাদেরকে পূর্ণ হিদায়াত দান করুন এবং মৃত্যু অবধি হিদায়াতের উপর অবিচল রাখুন। আমীন।

আরয

আমাদের লিখনীতে যে ভুলগুলো রয়েছে, তার সংশোধনের জন্য আপনার পর্যবেক্ষণ জানানোর আবেদন রাখার পাশাপাশি দোয়া চাচ্ছি, মেহেরবান আল্লাহ্ যেন আমাদের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ ক্ষমা করেন এবং সে সকল মানুষের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আমাদেরকে হেফাযত করেন, যারা নসিহত করেন অথচ আমলটি নিজে করেন না।

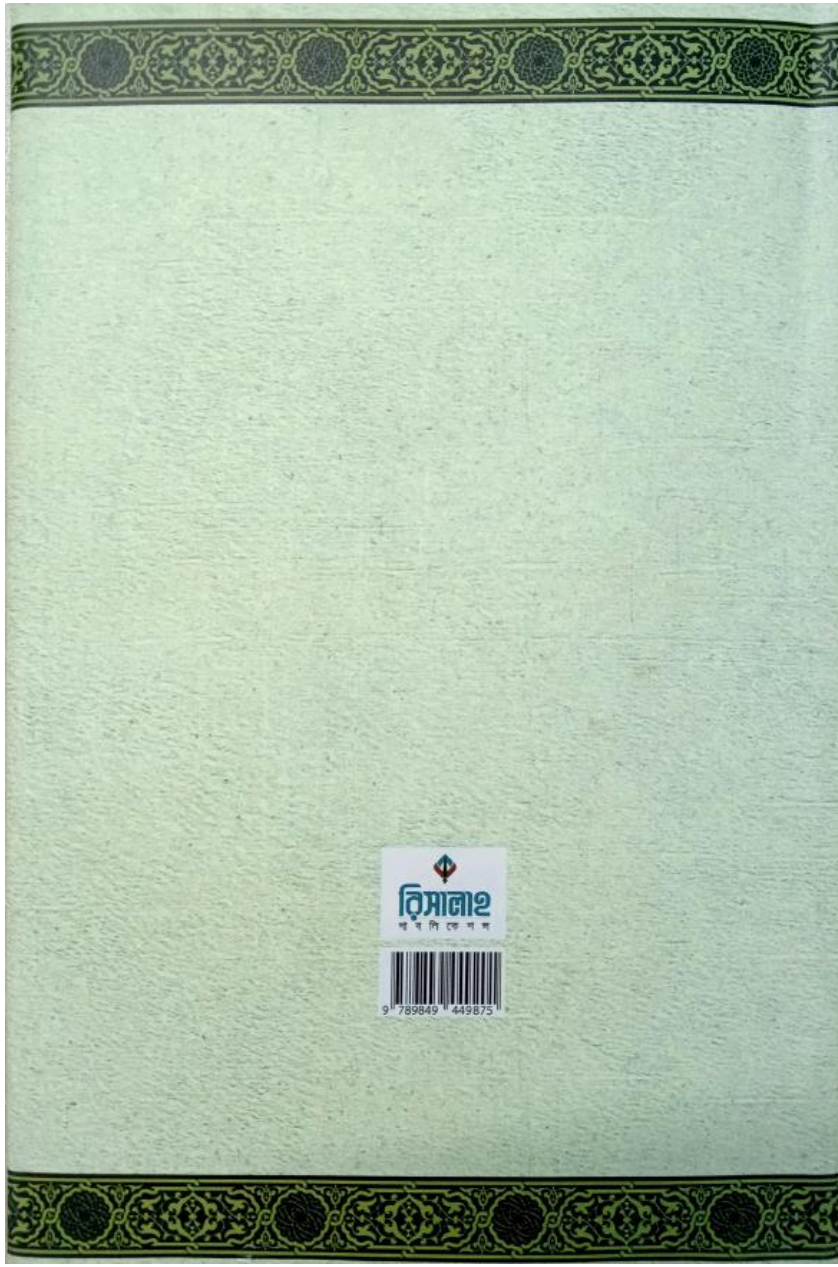
রিসালাহ
প ব লি কে শ ন
9 789849 449875